উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর অবশ্যপাঠ্য,
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর নূতন সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত।

সমাজবিদ্যা

প্রথম খণ্ড

সমাজ-জীবন | ইতিহাস : প্রাচীন যুগের ভারত

বিনয় ঘোষ

এম. এ. (প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস) ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আধুনিক ইতিহাস'-বিভাগের 'রকফেলার রিসার্চ ফেলো' ও প্রথম বিদ্যাসাগর-লেকচারার ; 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' 'কলকাতা কালচার' প্রভৃতি বিখ্যাত সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থের লেখক। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য-সম্মান 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার' প্রাপ্ত।

জি. ই. এজেন্সি

১২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-[illegible]

প্রকাশক : শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার
মজুমদার ব্রাদার্স
২।১ বি, ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৫৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ১৯৫৮

প্রচ্ছদ ও নকশা-চিত্র রূপায়ণ : পূর্ণেন্দু পত্রী

চার টাকা আট আনা

মুদ্রক : শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

স্নেহের

ধীমানকুমার ঘোষ

নিনা ঘোষ

নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ 'সমাজবিদ্যা'র (Social Studies) পাঠ্যবিষয়কে তিন ভাগে (Section) ভাগ করিয়াছেন। প্রথম ভাগ 'সমাজ-জীবন,' দ্বিতীয় ভাগ 'ভারতীয় ইতিহাসের ধারা' এবং তৃতীয় ভাগ 'রাষ্ট্র ও নাগরিক'। দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ 'ইতিহাস' নবম (.Class IX) ও দশম (Class X) উভয় শ্রেণীর পাঠ্য। প্রথম ভাগ 'সমাজ-জীবন' নবম শ্রেণীর এবং তৃতীয় ভাগ 'রাষ্ট্র ও নাগরিক' দশম শ্রেণীর পাঠ্য। এই বিষয়-বিভাগ অনুযায়ী আমরা বইখানি দুইটি খণ্ডে (Part) ভাগ করিয়াছি। প্রথম খণ্ডে 'সমাজ-জীবন' সম্পূর্ণ এবং ভারতীয় ইতিহাসের 'প্রাচীন বা হিন্দু যুগ' পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহা নবম শ্রেণীর পাঠ্য। মধ্য-যুগ (মুসলমান-যুগ) ও আধুনিক যুগের (ব্রিটিশ যুগ ও স্বাধীন-ভারত) ইতিহাসের সহিত তৃতীয় ভাগের 'রাষ্ট্র ও নাগরিক' বিষয় (দ্বিতীয় খণ্ড) দশম শ্রেণীর পাঠ্য। প্রয়োজন-বোধে শিক্ষকরা অবশ্য পাঠের অদল-বদল করিতে পরিবেন।

বইয়ের দুইটি খণ্ডই পাঠ্য হিসাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডের 'প্রথম ভাগে'র 'বিষয়-প্রসঙ্গে', ভূমিকা 'সমাজবিদ্যার স্বরূপ' এবং প্রথম অধ্যায় 'পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজ' ছাত্রদের গোড়াতে পড়াইবার প্রয়োজন নাই। প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সহিত তৃতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায়ের (গোষ্ঠীজীবন) প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। সুতরাং দশম শ্রেণীতে তৃতীয় ভাগ পড়াইবার সময় এই দুইটি অধ্যায় একত্রে মিলাইয়া পড়াইলে ভাল হইবে।

'নূতন সিলেবাস' পাওয়া এবং পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া শেষ করিয়া তাহা ছাপাইয়া প্রকাশ করা, ইহার মধ্যে যে সময় পাওয়া গিয়াছে তাহা এত অল্প যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বইখানিকে নিখুঁত করা সম্ভব হইল না। সমাজবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা দিবার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপায় হইতেছে চার্ট (Chart), ম্যাপ (Map), নকশা (Diagram) এবং চিত্র (Illustration) ব্যবহার করা। অভিজ্ঞ সমাজবিদ্‌রা এইগুলিকে 'effective tools of Social

Studies' বলেন। যথাসাধ্য আমরা এই দিক দিয়া বইখানিকে পাঠোপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভবিষ্যতে ভাবিয়া-চিন্তিয়া আরও চার্ট-ম্যাপ-ডায়েগ্রাম সংযোজন করিবার ইচ্ছা রহিল। শিক্ষকরা যদি এই বিষয়টির জন্য নিজেরা নির্দেশ দিয়া শিল্পীদের দ্বারা বড বড কার্ডবোর্ডে এক-সেট চার্ট-ম্যাপ ইত্যাদি স্কুলের জন্য আঁকাইয়া রাখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কাজের সুবিধা হইবে। মধ্যে মধ্যে কাছাকাছি স্থানে, গ্রামে, শিল্পাঞ্চলে, কলকারখানায় ও গ্রাম্য মেলায়, শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের সঙ্গে লইয়া যান, তাহা হইলে ছাত্রদের এই বিষয়ে আগ্রহ বাড়িবে। সমাজবিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্রদের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ বাড়ানো খুবই প্রয়োজন।

এই বইয়ের 'দ্বিতীয় খণ্ডে'র শেষে সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী (bibliography) থাকিবে। সরকারী ও বে-সরকারী বহু প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে ও কলকারখানার জনসংযোগ বিভাগ, কর্মী-সংঘ প্রভৃতির নিকট হইতে এই বই লিখিবার সময় নানারকমের সাহায্য পাইয়াছি। সকলের নিকট সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

১০ মার্চ, ১৯৫৮

বিনয় ঘোষ

দ্বিতীয় মুদ্রণ

দ্বিতীয় মুদ্রণে কোন পরিবর্তন করা হইল না। কেবল বইয়ের ভিতরের দুই-একটি ভুল সংশোধন করা হইল এবং শেষের 'সংযোজন' অংশের বিষয়গুলি ভিতরে যথাস্থানে সন্নিবেশ করা হইল। সেইজন্য পৃষ্ঠাসংখ্যার সামান্য অদল-বদল হইল মাত্র। সমস্ত 'পরিসংখ্যান' সংযোজন-বিভাগে দেওয়া হইয়াছে।

মে, ১৯৫৮

বিনয় ঘোষ

বিষয়-প্রসঙ্গে

সমাজবিদ্যা বা Social Studies নূতন পাঠ্য বিষয়। সুতরাং পাঠ্য বিষয় প্রসঙ্গে কিছু বলা উচিত। এই নূতন বিষয় শিক্ষার প্রয়োজন কি ? কেন ইহাকে তরুণ শিক্ষার্থীদের অবশ্যপাঠ্য বিষয় বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে ? কি কারণে ইহার এত গুরুত্ব ?

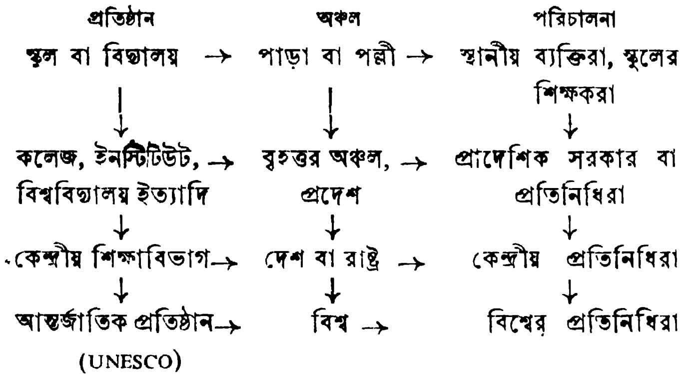
আমরা আজ যে-যুগে ও যে-সমাজে বাস করিতেছি, সবক্ষেত্রে তাহার এত দ্রুত অদল-বদল হইতেছে যে অনেক সময় তাহার সহিত তাল রাখা অথবা তাহার তাৎপর্য বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র-সমাজের গড়নের ক্ষেত্রে, ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, নিত্যনূতন সমস্যা দেখা দিতেছে। ব্যক্তি হিসাবে, নাগরিক হিসাবে, আজ প্রত্যেক মানুষেরই উচিত এইসব সমস্যা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা। তাহার জন্য নূতন শিক্ষার প্রয়োজন। প্রাচীন যুগে, মধ্য যুগে, এমনকি আধুনিক যুগে একশত কি পঞ্চাশ বৎসর আগেও যে-সব বিষয় আমরা পাঠ করিতাম, যে-দৃষ্টিতে তাহাদের বিচার করিতাম, আজ তাহা করিলে চলিবে না। একই বিষয় হইলেও তাহাকে নূতন দৃষ্টিতে বিচার করিতে হইবে। ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কোন বিষয় পুরানো পদ্ধতিতে পড়িলে আমাদের বর্তমানের প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না। তাহার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিয়া যাইবে। মানুষ ও সমাজের জীবনের সহিত যোগ রাখিয়া এবং যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়া, প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের আজ পাঠ করিতে হইবে। আগেকার দিনে 'অ্যাকাডেমিক' বিষয় বলিয়া যাহার উচ্চ মর্যাদা ছিল, আজ তাহার সেই কারণে সে-মর্যাদা না থাকিতেও পারে। তাহার

আপেক্ষিক গুরুত্বও কমিতে পারে। যুগে যুগে শিক্ষণীয় বিষয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব বদলাইয়া যায়। প্রাচীন বৈদিক বা হিন্দু-যুগে, অথবা মুসলমান-যুগে যে-বিষয়ের যে-গুরুত্ব ছিল, আজ তাহা আমরা পাঠ করিলেও তাহার সেই গুরুত্ব নাই। কেন নাই? বিষয় ভাল-মন্দ বলিয়া নহে, আজিকার জীবনে ও সমাজে তাহার আবশ্যকতা অনেক বদলাইয়া গিয়াছে বলিয়া। সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, টেক্‌নোলজি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্ব আজ অনেক বেশী, কারণ জীবনের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বেশী। এইজন্য আজ শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী বদল করা প্রয়োজন। সমাজবিদ্যা সাধারণভাবে বিভিন্ন বিষয় যুগোপযোগী আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করিবার মতো শিক্ষা দেয়। সেইজন্যই আজ সমাজবিদ্যা সব দেশের তরুণদের অবশ্যপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।*

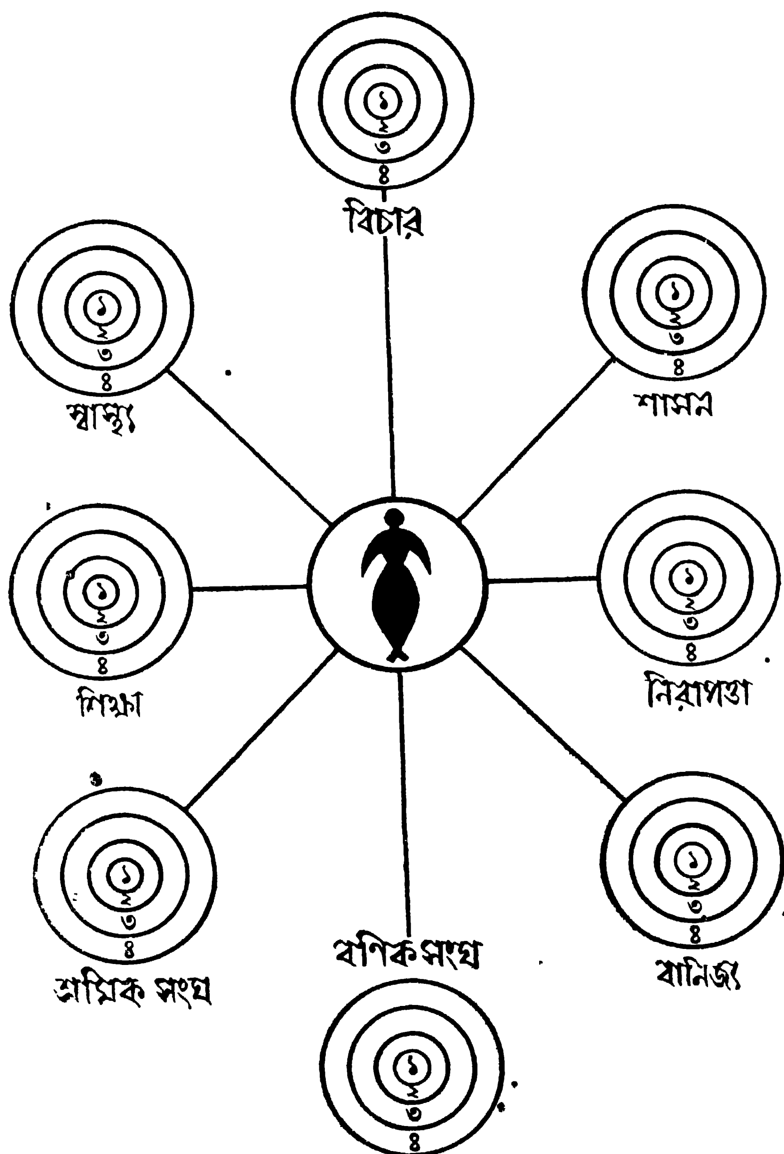
আজ আমরা গণতান্ত্রিক যুগে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও সমাজে বাস করিতেছি। ব্যক্তি (Individual) ও নাগরিক (Citizen) হিসাবে আজ আমাদের দায়িত্ব অনেক বাড়িয়াছে। প্রাচীন কালে নিজের পল্লীর মধ্যে চোখ বুজিয়া বাস করিলেও ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না। এখন তাহা চেষ্টা করিলেও করিবার উপায় নাই। পল্লীর বাহিরে নগরে শহরে, বৃহত্তর সমাজে ও দেশে, এমন কি বৃহত্তম পৃথিবীতে এমন

* সমাজবিদ্যা বিষয়ে যাঁহারা চর্চা করেন, তাঁহারা শিক্ষার এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জোর দিয়াছেন। Brimble ও May তাঁহাদের পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন: "We believe that this can be done through social studies which are a new angle of approach to the accepted subjects of the curriculum." (*Social Studies and World Citizenship* : Introduction)

ঘটনা যখন-তখন ঘটিতে পারে ও ঘটিয়া থাকে, যাহা সুদূর বিচ্ছিন্ন পল্লীতেও আমাদের জীবনযাত্রায় আঘাত করিতে পারে। পাশের নকশা-চিত্র হইতে বুঝা যাইবে, সামান্য ব্যক্তি হিসাবেও আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কি-ভাবে ক্ষুদ্রতম গণ্ডী ও গোষ্ঠী হইতে বৃহত্তম বিশ্বের সহিত আমরা যুক্ত রহিয়াছি। শিক্ষার কথাই ধরা যাক। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার যোগসূত্র এইভাবে দেখানো যাইতে পারে :



পারিবারিক (Family) শিক্ষার পর যখন আমরা স্কুলে যাই, তখন স্কুলের 'ম্যানেজিং কমিটি' ও শিক্ষকরা আমাদের শিক্ষার তদারক করেন। বড় কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন যাই, তখন পাড়া হইতে প্রায় প্রদেশের গণ্ডীর মধ্যে আমরা আসিয়া পড়ি। তাহার উপরে প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাবিভাগ আছে, এবং তাহার উপরে আছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর। ইহাদের বিচার-বিবেচনার উপর আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্ভর করিতেছে। তাহার উপর রাষ্ট্রসঙ্ঘের (U. N. O.) শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভাগ আছে। সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের



১, ২, ৩, ৪ সংখ্যক ক্রমবর্ধমান বৃত্ত, ছোট হইতে বড় প্রতিষ্ঠানের প্রতীক
ব্যক্তির জীবন এইভাবে তাহার সহিত সংযুক্ত (৷৷০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌রা সকলে মিলিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে এমন এক নীতি গ্রহণ করিতে পারেন, যাহাতে আমাদের রাষ্ট্রের, প্রদেশের, এবং পাড়ার স্কুলের পর্যন্ত শিক্ষার ধারা বদলাইতে পারে। এইভাবে অর্থনীতি-ব্যবসাবাণিজ্য, রাষ্ট্র-পরিচালনা, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে আমরা স্থানীয় পাড়া হইতে (local community) বাহিরের সমাজ, প্রদেশ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের সহিত যুক্ত রহিয়াছি। সমাজবিদ্যা এই যোগাযোগের সূত্রগুলি ধরাইয়া দিয়া আমাদের জ্ঞানবিদ্যাকে সার্থক করে, ব্যক্তি ও নাগরিক হিসাবে আমাদের দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তোলে এবং দেশে-বিদেশে, ঘরে-বাহিরে মানুষের সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ধারা ঠিকভাবে বুঝিবার জন্য আগ্রহশীল করিয়া তোলে। এইজন্যই সমাজবিদ্যা আজ সকল শিক্ষার মূল শিক্ষা হইয়া উঠিয়াছে।*

---

* Hilton & Tootill : *Living in Communities*, Book I

সূচীপত্র | প্রথম খণ্ড

প্রথম ভাগ | সমাজ-জীবন

চিত্র, চার্ট, ম্যাপ ও ডায়েগ্রাম

সমাজবিদ্যা

প্রথম খণ্ড



ভূমিকা

সমাজবিদ্যার স্বরূপ

সমাজ বলিতে **মানবসমাজ** বুঝায়। মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারা, পৃথিবীর নানা দেশে ও নানা অঞ্চলে, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণে, তাহার বৈচিত্র্য ও জটিলতা, নানা রকমের বিধিবিধান, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, নিষেধ নির্দেশ, রীতিনীতি ইত্যাদি অনুসন্ধান ও অনুশীলন করা যে-বিদ্যার অন্যতম লক্ষ্য, তাহাকে **সমাজবিদ্যা** বা **সমাজবিজ্ঞান** (Sociology) বলে।

পদার্থবিজ্ঞান (Physics), রসায়ন (Chemistry) অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (Natural Sciences) সহিত ইহার খানিকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু হুবহু মিল নাই। কারণ পরীক্ষাগারে (Laboratory) প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপাদান লইয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার সঠিক ফলাফল যেমন নির্ধারণ করা যায়, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমন করা যায় না। সমাজবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার সমাজ এবং উপাদান মানুষ। মানুষ ও সমাজ দুইই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। সমাজবিজ্ঞানীরা তাই প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতো 'ইহা হইলে, উহা হইবেই', এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না। হাইড্রোজেন গ্যাসের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন হইলে 'জল' সৃষ্টি হইবেই যেমন প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়, মানুষে মানুষে দেখা হইলে

বা একত্রে বসবাস করিলে তাহারা 'এইভাবে' ব্যবহার করিবে বা করিবে না, এমন কথা 'প্রমাণ করিয়া দিব' বলা যায় না। তাহা হইলে সমাজবিদ্যাকেও একরকমের 'বিজ্ঞান' বলা হয় কেন ?

সমাজবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক বিদ্যা

সমাজের মধ্যে যখন অন্যান্য আরও অনেক মানুষের সহিত গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া মানুষ বসবাস করে, তখন কতকগুলি মানবিক ও সামাজিক রীতিনীতি তাহাকে মানিয়া চলিতে হয়। অরণ্যে বা আশ্রমে যিনি সর্বত্যাগী সাধুর জীবন যাপন করেন, তিনি হয়ত তাহা না মানিতে পারেন, কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষের না মানিয়া উপায় নাই। এই সব রীতিনীতি ধীরস্থির ভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে, কোন্ অবস্থায় মানুষ কি কবিবে বা করিতে পারে, তাহা নির্দেশ করা যায় এবং সেই নির্দেশ সত্য হইবার সম্ভাবনা থাকে। বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হইতেছে, কার্য-কারণ সম্বন্ধ কি, অর্থাৎ কি কারণে কি ঘটনা ঘটে, তাহা নির্ধারণ করা। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোষ্ঠীগত, সামাজিক, জাতিগত ও আন্তর্জাতিক জীবনধারা, কাজকর্ম, চালচলন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মনোযোগ দিয়া অনুধাবন করিলে, তাহার প্রত্যেক কাজের কারণ খুঁজিয়া বাহির করা যায়। সমাজবিদ্যা প্রধানতঃ তাহাই করে বলিয়া তাহাকেও এক প্রকারের বিজ্ঞান বলা হয়।

সমাজবিদ্যার সূত্র

সমাজবিদ্যার সাধারণ সূত্রগুলিকে (Sociological Laws) একেবারে অকাট্য না বলিয়া, কতকটা গতি (Trend) নির্দেশক বলা উচিত। অর্থবিদ্যা (Economics), রাষ্ট্রবিদ্যা (Politics),

মনোবিদ্যা (Psychology), নৃবিদ্যা (Anthropology) প্রভৃতি সমাজবিদ্যার অনুরূপ অন্যান্য বিদ্যার অনুশীলনের ফলেও এই ধরনের সামাজিক গতিসূচক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সব বিদ্যা পরস্পর-সংশ্লিষ্ট, কারণ প্রত্যেকের বিষয়বস্তু মানুষ ও সমাজ। মানবসমাজের এক-একটি দিক লইয়া বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও অনুশীলন করাই এক-একটি বিদ্যার লক্ষ্য। যিনি তাহা করেন, তিনি ক্রমে সেই বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া বিশেষজ্ঞ হন।' তাঁহাদের আমরা মনোবিদ্ বলি, অর্থবিদ্ বলি, রাষ্ট্রবিদ্ বলি। সমাজ-বিদ্‌কে কিন্তু সকলকে লইয়া কাজকর্ম করিতে হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ্যার সাহায্য কিছু কিছু লইতে হয়। সেইজন্য এইসব সংশ্লিষ্ট বিদ্যার প্রত্যেকটী সম্বন্ধে তাঁহার অন্ততঃ প্রাথমিক জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। ইতিহাসবোধও তাঁহার সজাগ থাকা আবশ্যক। সমাজ-বদ্ধ মানুষের জীবনধারার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও ঐক্য কোথায়, তাহা বুঝিতে হইলে ইহা ছাড়া গতি নাই।

সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু

এইসব জ্ঞানবিদ্যার সাহায্যে এবং নিরপেক্ষভাবে মানুষের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া, সমাজবিদ্‌রা সমাজের গতিবিধি নির্দেশ করিতে পারেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই পদ্ধতিতে অনুশীলন ও অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা মানুষ ও তাহার সমাজ সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাই সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। যেমন, বর্তমান পৃথিবীতে নানাদেশে এখনও যেসব 'বন্য' 'অসভ্য' মানবগোষ্ঠী বাস করে, তাহাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিয়া সমাজবিদ্‌রা জানিতে পারিয়াছেন: সুদূর অতীতে, সভ্যতার ঊষাকালে, যাযাবর মানুষ ধীরে ধীরে কি

কারণে সমাজবদ্ধ হইবার প্রয়োজনবোধ করিয়াছে এবং তাহার পর কি উপায়ে, কিসের প্রেরণায় ও তাগিদে, আরও উন্নত সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। কেমন করিয়া মানুষ পরিবার জনপদ গ্রাম নগর ও মহানগর গড়িয়া তুলিয়াছে এবং কেন গড়িয়াছে? স্থান-কালভেদে তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে কেন, এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেও সমগ্র বিশ্বের মানবসমাজের মূল ঐক্য রহিয়াছে কোথায়? সমাজ যত বড়, উন্নত ও জটিল হইয়াছে, মানুষের জীবনযাত্রা যত সমৃদ্ধ হইয়াছে, তত মানুষের পক্ষে সামাজিক জীবন শৃঙ্খলার সহিত নিয়ন্ত্রণ করা এক মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সমস্যা যত জটিলই হোক না কেন, মানুষ নিজের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি নিয়োগ করিয়া তাহা সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এইভাবে মানুষ নানারকমের সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Institution), সংগঠন (Organisation), সভা-সমিতি প্রভৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত ও পৌর-প্রতিষ্ঠান (Municipality) হইতে রাষ্ট্র (State) পর্যন্ত সবই গড়িয়া উঠিয়াছে মানুষের চেষ্টা ও চিন্তার ফলে।

এইসব বিষয় সমাজবিদ্যার পাঠ্য বলিয়া তাহা অনুশীলন করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য। তাহা না হইলে আধুনিক যুগের মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না এবং অন্য কোন শিক্ষাও সার্থক হয় না। ডাক্তারিবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যা, সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন, যাহাই আমরা শিক্ষা করি না কেন, সমাজবিদ্যার বুনিয়াদী জ্ঞান ভিন্ন কোন শিক্ষাই আমাদের পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। মানুষের প্রতি, সামাজিক গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতি, পরিবার রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব কতখানি রহিয়াছে তাহা সমাজবিদ্যার অনুশীলন করিলে জানা যায়। স্থানকাল ভেদে মানুষের

মধ্যে জাতিগত ও দেশগত আচার, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বিভেদ থাকিলেও, সব দেশের সকল জাতির মানুষের মধ্যে যে মূলগত ঐক্য আছে, তাহাও আমরা সমাজবিদ্যার অনুশীলনের ফলে জানিতে পারি। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে, বাহিরের বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে সমাজবিদ্যা এই ঐক্যের সন্ধান করিতে শিক্ষা দেয়।

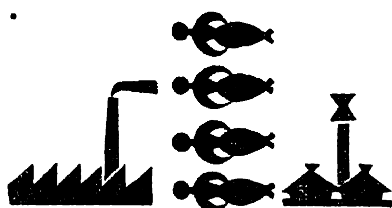
পাঠনির্দেশ

এই বই সমাজবিদ্যার বই। ইহার প্রধান বিষয়বস্তু মানুষ ও সমাজ। বইয়ের **প্রথম বিভাগে** তাই সমাজের ক্ষুদ্রতম গণ্ডী হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। মানুষ সমাজবদ্ধ হয় কেন? বিভিন্ন স্থানে, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থাভেদে, নানা প্রকারের সমাজ কি ভাবে গড়িয়া উঠে? তাহাদের বৈশিষ্ট্য কি, এবং পার্থক্য কোথায়? এইসব বিষয় প্রথম বিভাগে আলোচনা করা হইয়াছে। **দ্বিতীয় বিভাগের** বিষয়বস্তু ইতিহাস, এবং আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস। এ ইতিহাস রাজ-রাজড়ার সিংহাসন দখলের ও যুদ্ধবিগ্রহের সাল-তারিখ কণ্টকিত ইতিহাস নয়। সাল-তারিখের অন্তরালে যুগে যুগে মানুষের সমাজ ও সভ্যতা গঠনের যে কাহিনী চাপা থাকে, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস। ইতিহাসের আসল সত্য, রহস্য ও রোমাঞ্চ সেইখানে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে সিন্ধুসভ্যতার যুগ, বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ-জৈন যুগ, মৌর্য যুগ, শক হূনদের যুগ, গুপ্ত যুগ, পাঠান-মোগল যুগ, ব্রিটিশ যুগ ও স্বাধীন ভারতের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির কিভাবে ক্রমবিকাশ হইয়াছে, তাহাই এই ইতিহাসের আলোচ্য। সমাজবিদ্যার জ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ করিতে হইলে, নিজের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের

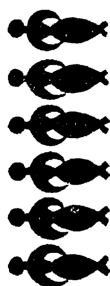
এই ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই ইতিহাসবোধ না থাকিলে সমাজবিদ্যার জ্ঞানও পরিপূর্ণ হয় না। বর্তমান যুগে সমাজ-সংঘ, রাষ্ট্র বা গবর্ণমেন্ট কিভাবে পরিচালিত হয়, **তৃতীয় বিভাগের** আলোচ্য বিষয় তাহাই। ক্ষুদ্র পরিবারে, সভা-সমিতি-সংঘে, কিভাবে আমরা বর্তমান যুগে আমাদের জীবনের প্রয়োজন মেটাই? রাষ্ট্র কি এবং রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক কি? কিভাবে নির্বাচন, ভোট প্রভৃতির সাহায্যে সেই সম্পর্ক স্থাপিত হয়? স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠান কিভাবে পরিচালিত হয়? রাষ্ট্রের কাজকর্মই বা কিভাবে চলে এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠন কি রকম? পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত আমরা কি উপায়ে সম্পর্ক স্থাপন করি এবং তাহার জন্য রাষ্ট্রসংঘের ন্যায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলি? এইসব বিষয়ের আলোচনা তৃতীয় বিভাগে করা হইয়াছে।

পাঠ্যবিষয়ের এই বিন্যাস খানিকটা বিষয়জ্ঞানের ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করা হইয়াছে। **প্রথম বিভাগ** সমাজবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞানের জন্য প্রথমে পাঠ্য। **তৃতীয় বিভাগ** বিশেষ জ্ঞানের জন্য সর্বশেষে পাঠ্য। **দ্বিতীয় বিভাগের** ইতিহাস সর্বদাই পাঠ করা উচিত। প্রথম বিভাগে সমাজবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞানলাভের সময় ভারতবর্ষের আদিযুগ ও প্রাচীন যুগের ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝিবার সুবিধা হইবে। **তৃতীয় বিভাগের** বিষয়বস্তুর সহিত ভারতের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ইতিহাস পাঠ করা সমীচীন। তাহা হইলে সমাজবিদ্যার জ্ঞানের সহিত ইতিহাসবোধের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সহজ হইবে এবং শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সেই সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে।

প্রথম ভাগ



সমাজ-জীবন





প্রথম অধ্যায়

পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজ

মানুষ ছাড়া আর কোন জীবের **সমাজ** নাই। যূথচারী বন্য জন্তু অনেক আছে। হাতি মহিষ প্রভৃতি জন্তু পালে পালে, দলে দলে, বনে বিচরণ করে। কিন্তু বনের মধ্যে তাহারা কোথাও দলবদ্ধ হইয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে, গোষ্ঠী বা সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে, এমন কথা কখন শোনা যায় নাই। তাহার প্রধান কারণ, মানুষ ছাড়া আর কোন জীবের চিন্তাশক্তি নাই, বুদ্ধি-বিবেচনা নাই, এবং সেই চিন্তা ও বুদ্ধি প্রকাশ করিবার মতো ভাষা নাই। মানুষের যদি চিন্তা করিবার শক্তি না থাকিত, বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি না থাকিত, এবং ভাবপ্রকাশের ভাষা না থাকিত, তাহা হইলে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি কিছুই মানুষ গড়িয়া তুলিতে পারিত না।

মানুষের জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার

চিন্তা করিবার শক্তি আছে বলিয়াই মানুষ জীবনযাত্রায় অনেক উন্নত প্রণালী এবং জীবনসংগ্রামের অনেক শক্তিশালী সব হাতিয়ার (Tools) উদ্ভাবন করিয়াছে। অন্যান্য জীবের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। বুদ্ধিহীন জীবের জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার সম্পূর্ণ দৈহিক (Corporeal tools), যেমন দাঁত নখ থাবা শুঁড় লেজ ইত্যাদি,

কিন্তু বুদ্ধিমান জীব মানুষের হাতিয়ার দেহ-বহির্ভূত (Non-Corporeal tools), যেমন মুষল বর্শা বল্লম-তীরধনুক কাস্তে-হাতুড়ি লাঙল, নানারকমের যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ইত্যাদি। উদ্ভাবনীশক্তির সাহায্যে দেহবদ্ধ সংগ্রাম হইতে এই মুক্তির ফলেই মানুষের পক্ষে সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তোলা এবং উন্নত চিন্তা করা সম্ভব হইয়াছে। মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি দুইই বদলাইয়াছে। মানুষ আর অন্য জীবের মতো প্রকৃতির দাস নাই।

অন্যান্য জীব জীবনধারণের জন্য সম্পূর্ণ প্রকৃতিনির্ভর, একেবারে প্রকৃতির দাস বলা চলে। বনজঙ্গল পাহাড়পর্বত বা জলাভূমি, যেরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে যে-জীবের পক্ষে থাকা সম্ভব, এবং সেখানকার বনের ফলমূল কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী ইত্যাদি যাহা ভক্ষণ করিয়া তাহারা জীবনধারণ করে, কোন কারণে যদি তাহার পরিবর্তন হয়, বনজ খাদ্য যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই সব জীবজন্তুর বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে, প্রকৃতির পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীর বহু অঞ্চল হইতে বহু জীবজন্তুর বিলোপ হইয়াছে ও হইতেছে। এককালে আমাদের দেশে উত্তরভারতে, দক্ষিণভারতে, মধ্যভাবতে ও পূর্বভারতে, বনেজঙ্গলে হাতি গণ্ডার বাঘ সিংহ ভাল্লুক বনমহিষ প্রভৃতি জীবজন্তুর বাস ছিল, এখন অনেক অঞ্চলে তাহারা লোপ পাইয়াছে, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের জন্য। বাংলাদেশের সুন্দরবন, ছোট-নাগপুর ও তরাইয়ের জঙ্গলে দুই-একশত বৎসর আগেও বুনো হাতি, বাঘ ভাল্লুক যথেষ্ট সংখ্যায় বাস করিত, কিন্তু এখন তাহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে, হয়ত আর কিছুদিন পরে একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই, বরং ঠিক বিপরীত হইয়াছে দেখা যায়। পৃথিবীর সকল দেশে ক্রমে মানুষের

সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে, মানুষের পরমায়ু বাড়িয়াছে, বসতিও বাড়িয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েক লক্ষ মানুষ, ঐতিহাসিক যুগে কয়েক কোটি হইতে, গত দুইতিন শতাব্দীর মধ্যে অতি দ্রুত হারে বাড়িয়া বর্তমানে প্রায় ২৭০ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। তাহার কারণ মানুষ প্রকৃতির মুখাপেক্ষী নহে। মানুষ নিজে খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে, ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া রৌদ্র ঝড় জল শীত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। বুদ্ধি খাটাইয়া, নূতন নূতন হাতিয়ার নির্মাণ করিয়া, প্রকৃতিব বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করিতে পারে। জঙ্গল হাসিল করিয়া, পাহাড়পর্বত কাটিয়া, নদনদীর প্রবাহ ঘুরাইয়া, মানুষ তাই নূতন নূতন বসতি, জনপদ, গ্রাম, নগর ও শহর গড়িতে পাবে। আর কোন্ জীব তাহা পারে না।

প্রকৃতি ও মানবসভ্যতা

প্রকৃতিকে মানুষ জয় করিয়াছে ও করিতেছে বটে, এবং সেই জয়ের ইতিহাসই মানবসভ্যতার ইতিহাস, কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃতির প্রভাব হইতে মানুষ একেবারে মুক্ত হইতে পারে নাই। হওয়া সম্ভবও নহে। বনজঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা যায়, নদনদীর গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু প্রকৃতির ভূ-সংস্থান, পাহাড়-পর্বত, সমতল-উপত্যকাভূমি, সমুদ্র-মরুভূমি, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার জলবায়ু প্রভৃতির বিন্যাস ও ক্রম পরিবর্তন কবা সম্ভব নহে। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের (Natural Environment) মধ্যে একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন দেশে পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যের জন্য সব দেশের সব মানুষের জীবন-সংগ্রামের রীতি এক-রকমের নহে। পার্বত্য অঞ্চলের একরকম, নদীবহুল অঞ্চলের

একরকম, সমতলভূমির একরকম, বর্ষাপ্রধান শীতপ্রধান গ্রীষ্মপ্রধান দেশের এক-একরকম। জলবায়ুভেদে নানাস্থানে নানারকমের গাছ-গাছড়া জন্মায়, খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, পশুপক্ষীও সর্বত্র এক নহে। এই পরিবেষ্টনভেদে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম-পদ্ধতির পার্থক্য ঘটা স্বাভাবিক। এই পার্থক্য বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজে ও সভ্যতায় প্রতিফলিত হয়। জলবায়ু ও খাদ্য ভেদে মানুষের গায়ের রং ও আকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্তন হয় এবং বহুকাল হইতে বিভিন্ন পরিবেষ্টনে বসবাস করিবার ফলে মানুষ কৃষ্ণকায় (Negroid), শ্বেতকায় (Caucasoid), পীতকায় (Mongoloid) প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের ঘরবাড়ী, পোশাকপরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, আচার-ব্যবহারেরও পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই পার্থক্য প্রাকৃতিক কারণে ঘটিয়াছে, কোন মানবিক গুণের তারতম্যের জন্য ঘটে নাই। পৃথিবীতে আজও যেসব জনগোষ্ঠী বা জাতি 'অসভ্য' বলিয়া পরিচিত, তাহাদের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সামাজিক অগ্রগতির সুযোগ তাহারা পায় নাই, বা তাহাদের দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাহারা উন্নতি করিতে পারে নাই। তাহাদের মানবিক গুণ বা ক্ষমতা নাই বা কম আছে বলিয়া যে তাহারা অনুন্নত রহিয়াছে, ইহা সত্য নহে। তাহারা শিক্ষা পায় নাই, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের সন্ধান পায় নাই বলিয়া অনুন্নত রহিয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক সুযোগসুবিধা পাইলে তাহারাও অল্পকালের মধ্যে যে-কোন সভ্য মানুষের মতো উন্নতি সাধন করিতে পারে।

প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন ভেদে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার পার্থক্য ঘটিলেও, সমাজবিদ্‌রা সেইজন্য সেই পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের ভিতরে,

সকল জাতির মানুষের মধ্যে, মূলগত মানবিক ও সামাজিক ঐক্যের সন্ধান দেন। 'অসভ্য' বা 'সভ্য', পর্বতবাসী বা তীরবাসী বা মরুবাসী, সকল জাতির মানুষের মধ্যে মানবিক ও সামাজিক গুণের ও প্রবৃত্তির সাদৃশ্য দেখা যায়। পিতামাতার স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, প্রবীণ ও অগ্রজদের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার, জীবিকার ও আত্মরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ সংগ্রামের চেষ্টা; পরিবারভুক্ত ও গোষ্ঠীবদ্ধ হইবার আগ্রহ, সকল জাতির মানুষের মধ্যে সমানভাবে আছে। স্থানভেদে তাহার কলাকৌশলের ও প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য ঘটে বলিয়া, মানুষে মানুষে তারতম্য ঘটিতে পারে না।

সামাজিক উত্তরাধিকার

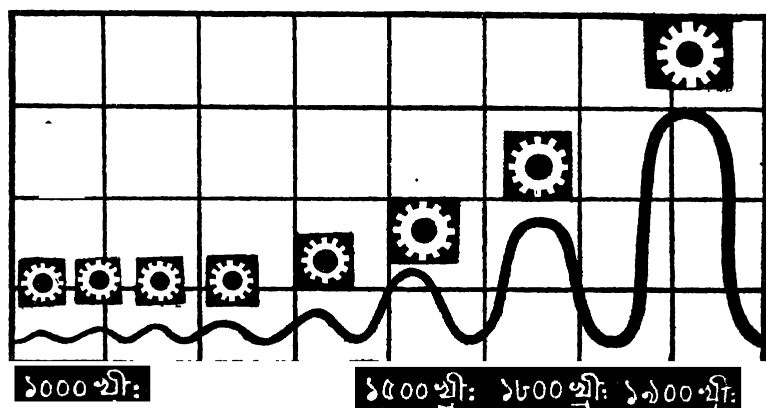
ভাবপ্রকাশের বাহন **ভাষা** (Language) যদি না থাকিত তাহা হইলে মানুষের সহিত মানুষের স্থায়ী সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ ঘটিত না। ভাবের আদানপ্রদান করিতে না পারিলে পরস্পরের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া কাজকর্ম করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব হইত না। ভাষা না থাকিলে মানুষের চিন্তা-ভাবনার যাহা কিছু সম্পদ তাহা লোপ পাইয়া যাইত এবং যুগানুক্রমে ও পুরুষানুক্রমে সকল মানুষের পক্ষে তাহার ফলভোগ করিবার সুযোগ হইত না। একযুগে বা একপুরুষে মানুষ যাহা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করে পরবর্তী যুগের মানুষ তাহাই উত্তরাধিকারসূত্রে পায় এবং তাহাই মানুষকে আরও উন্নততর উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা যোগায়। এই সামাজিক উত্তরাধিকার (Social Heritage) ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Cultural Tradition) প্রত্যেক যুগের মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং এই সম্পদ হইতে মানুষ বঞ্চিত

হইত, যদি ভাব-বিনিময়ের ও ভাব-সংরক্ষণের উপযোগী ভাষা তাহার না থাকিত।

যে কোন যুগে, যে কোন দেশে, মানুষ যাহা কিছু চিন্তা করিয়া উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহাই যুগ-পরম্পরায় ও বংশ-পরম্পরায় সর্বদেশের সকল মানুষের সম্পদ হইয়াছে। তাহা হইয়াছে বলিয়াই মানুষ যুগে যুগে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে, অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে, একযুগের এক ধাপ হইতে পরবর্তীযুগে দুই তিন ধাপ উপরে উঠিয়াছে। অতীতের বিভিন্ন কালের ছোটখাট আবিষ্কার মিলাইয়া অনেক বৃহত্তর আবিষ্কারের সন্ধানও পাইয়াছে মানুষ। এইভাবেই মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের (Cultural Growth) ধারা তরঙ্গায়িত ধারার মতো, পূর্বের তরঙ্গের তুলনায় পরবর্তী তরঙ্গের উচ্চতা অনেক বেশী।

দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। লক্ষাধিক বৎসর পূর্বে প্রস্তরযুগের মানুষ যখন চক্‌মকি পাথর ঘষিয়া ঠুকিয়া প্রথম আগুন জ্বালাইয়াছিল, তখন সেই আগুন তাহার কাছে রীতিমত যুগান্তকারী আবিষ্কার বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বাষ্প, বিদ্যুৎ ও আধুনিক পরমাণুর যুগ পর্যন্ত মানুষ বহু জিনিস, বহু শক্তি ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু এই আবিষ্কারের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্বের তুলনায় পরবর্তীকালে ক্রমেই মানুষের আবিষ্কারের হার (Rate of Inventions) বাড়িয়াছে। যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মানুষের আবিষ্কারের সংখ্যা প্রায় ১০০; ১৫০০ হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুইশত বৎসরের মধ্যে প্রায় ৬০০; ১৭০০ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ

পর্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে প্রায় ১৪০০; ১৮০০ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে প্রায় ২০০০। বিংশ শতাব্দীতে, গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মানুষের আবিষ্কারের সংখ্যা ও গতি আরও দ্রুত হারে বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার কারণ, পূর্বপুরুষের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার উত্তরপুরুষ লাভ করিয়াছে এবং সেই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া উন্নতির উচ্চতর ধাপগুলি আরও অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে।



যান্ত্রিক অগ্রগতির তরঙ্গ

বিভিন্ন কালের নানারকমের ছোটখাট আবিষ্কারের সংযোগে ও সমন্বয়ে উত্তরকালে কিভাবে একটি বৃহত্তর আবিষ্কারের পথ সুগম হয়, তাহার অন্যতম আধুনিক দৃষ্টান্ত অটোমোবাইল বা মোটরগাড়ী। উনিশ শতকের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একাধিক ছোটখাট আবিষ্কারের ফলে—যেমন বিভেদক গীয়ার (Differential gears), বায়ুময় টায়ার (Pneumatic tyre), সঙ্কোচন পদ্ধতি (Compression), বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ (Electric spark), গ্যাস ইঞ্জিন,

ক্লাচ্ ও গীয়ার ইত্যাদি—সবগুলির সমন্বয় করিয়া গত শতাব্দীর শেষ দশকে মোটরগাড়ী নির্মাণ করা সম্ভব হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩০০ মোটরগাড়ী তৈরী হয়, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০০, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫০০০, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮৭০০০, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮৯২৬১৮, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ২২০৫১৯৭, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪০৮৬৯৯৭। যান্ত্রিক আবিষ্কারের (Mechanical Invention) অগ্রগতি এই উপায়েই হইয়া থাকে। বিভিন্ন যুগে ও সময়ে আবিষ্কৃত নানাবিধ ছোটখাট যন্ত্রের ও হাতিয়ারের সমন্বয়ে উন্নততর যন্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব হয়। প্রত্যেক যুগের আবিষ্কার যদি পরবর্তী কালের মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে না পাইত, তাহা হইলে এই অগ্রগতি কখনই সম্ভব হইত না। এই উত্তরাধিকারই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, এবং যন্ত্রের ক্ষেত্রে যাহা সত্য, নীতি আদর্শ চিন্তা, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান, সর্বক্ষেত্রেই তাহা অনেকটা সত্য।

ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজ

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই সামাজিক উত্তরাধিকার, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নীতি, আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে মানুষ সবপ্রথম চেতনা ও জ্ঞান-লাভ করে কোথায়? কি উপায়ে করে? নির্বিকার নিশ্চিন্ত মানবশিশু কিভাবে ধীরে ধীরে সমাজ-সচেতন পূর্ণ মানুষ হইয়া ওঠে?

মানুষ জন্মগ্রহণ করে একটি পরিবারে। এই পরিবারই মানুষের জীবনের প্রথম সামাজিক পরিবেশ। পিতামাতা ও তাঁহাদের সন্তান-দের লইয়া একটি **পরিবার** (Family)। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও সেই পরিবারে থাকিতে পারে, কিন্তু মূল পরিবারের গড়ন হইল পিতামাতা ও তাঁহাদের সন্তানদের লইয়া। প্রত্যেক মানুষ এক-

একজন **ব্যক্তি** (Individual) এবং বহু ব্যক্তি লইয়া **সমাজ।** ব্যক্তির সহিত বৃহত্তর সমাজের প্রথম যোগসূত্র স্থাপন করে পরিবার। তাই পরিবার হইল সমাজের প্রাথমিক 'ইউনিট' বা স্তর। এই স্তর হইতে আমরা ধাপে ধাপে গোষ্ঠী, সভাসমিতি ক্লাব, স্কুল কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া বৃহত্তর সমাজের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করি।

পরিবারে বাস না করিলে কোন মানুষের পক্ষে বাল্যকালে ও কৈশোরে খাইয়া-দাইয়া, জামা-কাপড় পরিয়া, ঘরে থাকিয়া, বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব হইত না। মানুষের জীবনের চারভাগের একভাগ সময়, অর্থাৎ প্রায় প্রথম পনের বছর, কেবল খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকার তাগিদেই পরিবারে বাস করিতে হয়। পরিবারের প্রাথমিক আবশ্যকতাও সেইজন্য। রীতিনীতি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষাও আমরা পারিবারিক পরিবেশে লাভ করি। তারপর খেলার সঙ্গীদের সহিত মেলামেশা করি, স্কুলে যাই। পরিবারের বাহিরে এইভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর দিয়া সমাজ-জীবনের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। কিন্তু পরিবারের প্রভাব তখনও থাকে। পৃথিবীর বড় বড় বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ করিলে বুঝা যায়, পরিবারের প্রভাব মানুষের জীবনে কতখানি গভীর ও কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য হইতেই মানুষ বৃহত্তর সমাজের আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হয়। পরিবারই সমাজের প্রথম লালনাগার।

একাধিক ব্যক্তির সমষ্টিকে **গোষ্ঠী** (Group) বলে। পরিবারও একটি গোষ্ঠী, কিন্তু পিতামাতা-পুত্রকন্যাদের মতো **সামাজিক গোষ্ঠীর** (Social Groups) অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মীয়তার

সম্পর্ক নাই। পরিবারের পরেই সামাজিক জীবনে এই গোষ্ঠীর প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। পরিবারের বাহিরে সমাজের দিকে চাহিলে, সমগ্র সমাজটিকে অসংখ্য গোষ্ঠীর বিশাল একটি চাক বলিয়া মনে হয়। সব গোষ্ঠী এক রকমের নহে, তাহাদের স্তরভেদ আছে। আকারে ছোট বড় এবং গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের পারস্পারিক সম্পর্কের নিকটত্ব ও দূরত্ব ভেদে গোষ্ঠীর পার্থক্য ঘটে। ছোট ছোট গোষ্ঠীর ভিতরে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ, মুখোমুখি পরিচয় তাহার বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য তাহার বন্ধনও খুব দৃঢ়। যেমন খেলার সঙ্গীদের গোষ্ঠী, স্কুলের সহপাঠীদের গোষ্ঠী, পাড়ার ক্লাব সভা সমিতি ইত্যাদি। সমাজবিদ্‌রা এই ধরনের গোষ্ঠীকে **প্রাথমিক গোষ্ঠী** (Primary Groups) বলেন। পরিবার যদি সমাজের প্রথম স্তর ও সোপান হয়, তাহা হইলে এই প্রাথমিক গোষ্ঠীকে সমাজের দ্বিতীয় স্তর ও সোপান বলা যায়। মানুষের জীবনে পরিবারের পরেই এই প্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। ছোট ছোট এই সব স্থানীয় (Local Groups) ও প্রাথমিক গোষ্ঠীর নীতি ও আদর্শ মানুষের চরিত্র অনেকখানি রূপায়িত করে।

ইহা ছাড়াও সমাজে বড় বড় গোষ্ঠী অনেক আছে, যেমন ছাত্রদের বৃহৎ অ্যাসোসিয়েশন বা ফেডারেশন, বিভিন্ন আপিসের ও কল-কারখানার কর্মচারীদের ও মজুরদের 'ইউনিয়ন' বা সভা, শিক্ষকদের সভা, বিদ্বৎজনদের নানারকম সাংস্কৃতিক সভা, বড় বড় প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, রাজনৈতিক পার্টি ইত্যাদি। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক অবস্থা ও স্বার্থের ভিত্তিতে আরও একরকমের গোষ্ঠী সমাজে গড়িয়া উঠে, যাহাকে **সামাজিক শ্রেণী** (Social Class) বলা হয়। যেমন জমিদারশ্রেণী, ধনিকশ্রেণী ইত্যাদি। এইসব গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের

আন্দামানীদের দৈনন্দিন কাজকর্মে ও জীবনযাত্রায় এইসব 'ট্রাইব' বা উপজাতির বিশেষ কোন ভূমিকা নাই। সেখানে স্থানীয় এক-একটি গোষ্ঠীই (Local Group) সর্বেসর্বা বলা চলে। কয়েকটি গোষ্ঠী মিলিত হইয়া 'ট্রাইব' হয় বটে, কিন্তু সেই মিলন নিতান্তই বাহিরের মিলন, তাহার কোন দৃঢ়তা নাই। অন্যান্য আদিবাসীদের উপজাতি যেমন বিভিন্ন কুলে বা 'ক্ল্যানে' (Clan) বিভক্ত দেখা যায়, আন্দামানীদের সেরকম কোন বিভাগ নাই। ক্ল্যান বা কুলের বদলে আন্দামানী সমাজে গোষ্ঠী বা 'গ্রুপ' আছে। এই গোষ্ঠীই সমাজের সক্রিয় শক্তি। গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া আন্দামানীরা কাজকর্ম করে, খাদ্য-সংগ্রহ করে, শিকার করে। গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সর্ব ব্যাপারে অক্ষুণ্ণ থাকে। এক গোষ্ঠীর সহিত অন্য গোষ্ঠীর সদ্ভাব আছে, সহযোগিতার ইচ্ছাও আছে, আবার শত্রুতা বিরোধও আছে। এই গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য ও গোষ্ঠীকর্তৃত্ব আন্দামানী সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একই উপজাতির মধ্যে স্থান হিসাবে গোষ্ঠীভেদ আছে, যেমন উপকূলবাসীদের গোষ্ঠী (আন্দামানী ভাষায় আড়ইয়োতো বলে) এবং জঙ্গলবাসীদের গোষ্ঠী (এড়েম্‌তাগা)। কোন কোন উপজাতির মধ্যে একরকমের গোষ্ঠী আছে, আবার কোন উপজাতির মধ্যে দুই রকমের গোষ্ঠীও আছে। বিভিন্ন বয়সের ৪০-৫০ জন স্ত্রীপুরুষ, ছেলে-মেয়ে লইয়া এক-একটি গোষ্ঠী গঠিত।

প্রত্যেক গোষ্ঠী কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত। অর্থাৎ কয়েকটি আন্দামানী পরিবার মিলিয়া এক-একটি স্থানীয় গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। তাহারা একস্থানে বাস করে, কতকটা আমাদের সমাজে আমরা যেমন কয়েকটি পরিবার মিলিয়া একটি পাড়ায় বাস করি সেইরকম। স্বামী-স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্রকন্যাদের লইয়া পরিবার।

ইহাই আন্দামানী সমাজের গড়ন। এইভাবে তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পাবি ঃ

বড় দল=উ (উপজাতি)+উ+উ+উ+উ+

উপজাতি=গ (গোষ্ঠী)+গ+গ+গ+গ+গ+

উপকূল-গোষ্ঠী+জঙ্গল-গোষ্ঠী

গোষ্ঠী=প (পরিবার)+প+প+প+প+প+প+

পরিবার=স্বামী+স্ত্রী+ক(পুত্র)+খ(কন্যা)+ক+খ+ক+খ+

পূর্বে (প্রথম অধ্যায়) সমাজের যে 'খাড়াই গড়নে'র কথা বলা হইয়াছে, সেই দিক হইতে বিচার করিলে আন্দামানী সমাজের খাড়াই স্তরবিন্যাসের গভীরতা নাই দেখা যায়। অর্থাৎ সমাজে স্তরভেদ বা শ্রেণীভেদ নাই। সামাজিক সমতা অনেকখানি বজায় রহিয়াছে।

আন্দামানীদের বসতি-বিন্যাস

এই সমতার ভাব আন্দামানীদের বসতি-বিন্যাসের মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। একগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ একস্থানে বাস করে। বাস করিতেই হইবে এমন কোন বাধ্যতা নাই। যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন গোষ্ঠী ছাড়িয়া ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারে। বিবাহের পরে নবদম্পতী ইচ্ছা করিলে স্বামীর গোষ্ঠীতে, অথবা স্ত্রীর গোষ্ঠীতে বসবাস করিতে পারে। গোষ্ঠীর মধ্যে কোন যান্ত্রিক নিয়মের বন্ধন নাই বলিয়া কোন জড়তাও নাই।

প্রত্যেক গোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রও প্রায় সুনির্দিষ্ট থাকে। তীরবাসীদের গোষ্ঠীই হোক, আর জঙ্গলবাসীদের গোষ্ঠীই হোক, শিকার ও খাদ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রের সীমানা পরস্পরের জানা থাকে। বলিয়া কহিয়া, ব্যবস্থা করিয়া, একগোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর সীমানায়

শিকার করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ নিজের এলাকার মধ্যে তাহা করাই হইল রীতি। এই সীমানার মধ্যে, সমুদ্রের বা জঙ্গলের জীব-শিকারের জন্য **শিবির** বা **তাঁবু** (Camp) ফেলিবার স্থানও নির্দিষ্ট থাকে। তীরবাসীদের স্থানগুলি থাকে সমুদ্রতীরে নানাস্থানে, আর জঙ্গলবাসীদের থাকে জঙ্গলের ভিতরে পরিষ্কার কোন স্থানে। যখন যেখানে সুবিধা, ঋতু অনুযায়ী, তখন সেখানে তাঁবু ফেলিয়া শিকার ও খাদ্যসংগ্রহ করা হয়। অনেক স্থান যে দীর্ঘকাল ধরিয়া (শত শত বৎসরও হইতে পারে) নির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহা আশপাশের জীব-জন্তুর খোলা ও হাড়ের স্তূপ দেখিয়া বোঝা যায়।

সমুদ্রতীরবাসীদের মধ্যেই শিবির বা বাসস্থান পরিবর্তনের প্রবণতা বেশী দেখা যায়। প্রধানতঃ তিনটি কারণে তাহারা বসতি-কেন্দ্র ছাড়িয়া যায়—(১) গোষ্ঠীভুক্ত কাহারও মৃত্যু হইলে; (২) ঋতুর পবিবর্তনের জন্য অসুবিধা হইলে; (৩) বসতির চারিপাশে বেশী আবর্জনা ও ময়লা জমিলে। অরণ্যবাসীদের মধ্যে এই বসতিবদলের ঝোঁক অপেক্ষাকৃত অনেক কম। বৎসরের বেশীব ভাগ সময় তাহারা একস্থানেই বাস করে এবং এই স্থানটি এক-এক গোষ্ঠীর প্রধান বসতিকেন্দ্র হইয়া উঠে। সারা বর্ষাকাল তাহারা এই প্রধান বসতি-কেন্দ্রে বাস কবিয়া, গ্রীষ্ম ও শীতকালে অন্যান্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। খাদ্য ও শিকারের জন্য তাহা করিবার প্রয়োজনও হয় তখন।

আন্দামানীদের তাহা হইলে দুই রকমের বসতি দেখা যায় (১) প্রধান ও মোটামুটি স্থায়ী বসতি; (২) অস্থায়ী সাময়িক বসতি। সমুদ্রতীরবাসী ও অরণ্যবাসী উভয় গোষ্ঠীরই দুই প্রকারের বসতি আছে, তবে স্থায়ী বসতি অরণ্যবাসীদেরই বেশী।

স্থায়ী বসতিকেন্দ্রে স্বভাবতঃই এক-একটি গোষ্ঠীভুক্ত একাধিক

পরিবারে মিলিয়া একটি পাড়া বা গ্রাম গড়িয়া তোলে। কয়েকটি সুবিধা দেখিয়া স্থান পছন্দ করা হয়, তাহার মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা হয় পানীয় জলের সুবিধা আছে কি না, কোন ঝরনা ইত্যাদি নিকটে আছে কি না। স্থান এইদিক দিয়া পছন্দ হইলে জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হয় এবং তারপর সকলে মিলিয়া গাছের পাতা, কাঠ ইত্যাদি যোগাড় করিয়া গৃহ নির্মাণ করে। মধ্যের জমি খালি রাখিয়া চারিদিকে ডিম্বাকারে বা উপবৃত্তাকারে প্রত্যেক পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়। মধ্যের খালি জমিটি **নৃত্যাঙ্গিনা** এবং গৃহগুলি সব এই উন্মুক্ত আঙ্গিনামুখী। উপবৃত্তের প্রান্তে, একদিকে **যৌথ রান্নাঘর** এবং রান্নাঘরের পাশে **কুমারদের বাসগৃহ**। কুমার যুবকরা সাধারণতঃ সমগ্র গোষ্ঠির জন্য রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে বলিয়া তাহাদের গৃহটি রান্নাঘরের পাশেই থাকে। প্রত্যেক পরিবারের বয়স্ক কুমাররা এইভাবে একত্রে একটি স্বতন্ত্র গৃহে বাস করে, তাহাদের সহিত বিপত্নীক নিঃসন্তান পুরুষরাও থাকে। বয়স্কা কুমারী কন্যারাও এইভাবে স্বতন্ত্র গৃহে নিঃসন্তান বিধবাদের সহিত বাস করে। কখন কখন অবশ্য পিতামাতার সহিত পরিবার-গৃহেও তাহারা বাস করে।

অস্থায়ী বসতিগুলিতে অনেক সময় বড় একটি যৌথ গৃহ (Communal hut) নির্মাণ করা হয়। যৌথ গৃহের দেয়াল, চাল ও বারান্দাগুলি সংলগ্ন থাকে, গৃহের মধ্যে মধ্যে দেয়াল তুলিয়া স্বতন্ত্র ঘর করা হয় প্রত্যেক পরিবারের জন্য। আমাদের এখানে উড়িষ্যা প্রদেশে, পুরী ও গঞ্জাম জেলার অনেক গ্রামে এই ধরনের সংলগ্ন-গৃহের বসতি দেখা যায়। গৃহগুলি অবশ্য সরল লাইনবন্দী, বৃত্তাকার নহে। পথের দুইপাশে সংলগ্ন গৃহের সারি, প্রান্তে বা মধ্যে তুলসীমঞ্চ ও বিরাম-গৃহ। এই ধরনের গৃহবিন্যাসের সুবিধা এই যে গ্রামের সকল

পরিবারের লোক একত্রে বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিতে পারে, কোন সভা করিবার জন্য মঠে যাইবার দরকার হয় না। গ্রামের ও পল্লীর যৌথ জীবনযাত্রার বন্ধনও সহজে শিথিল হয় না। আন্দামানীদের বসতি ও গৃহ-বিন্যাস তাহাদের গোষ্ঠীগুলির যৌথ জীবনযাত্রার দৃঢ়বদ্ধতা প্রমাণ করে

আসবাব, পোশাক ও হাতিয়ার

যাহাদের জীবনযাত্রা এত সরল তাহাদের আসবাব ও পোশাক জমকালো হইতে পারে না। গৃহ ও তাহার আসবাব খুবই সাদাসিধা। গাছের লতাপাতা খুঁটি দিয়া তৈরী **একচালা** বা **দোচালা** ঘর, তাহার মধ্যে শুইবার জন্য বেতের উঁচু মাচা আছে। তাহার পাশে মৃত স্বজনদের মাথার খুলি বা চোয়াল, ঝুড়ি-ঝাঁপি ও কাঠের পাত্র হয়ত কিছু আছে। আন্দামানীদের কেহ মৃতের মাথার খুলি, কেহ চোয়াল বা অন্য কোন হাড় রাখিয়া দেয়। ঝুড়িও তাহারা সুন্দর বুনিতে পারে। ইহা ছাড়া তীরধনুকও আছে, বাঁকানো ধনুক, ইংরেজী S-এর মতো। বহুমুখ ও একমুখ, দুই রকমেরই তীর আছে। পোশাক-পরিচ্ছদের তেমন বালাই নাই। তন্তুর ও লতাপাতার ফোলানো ঘের কোমরে কেহ বাঁধিয়া রাখে, কেহ 'ট্যাসেল্স' বা পাতার ঝালর পরে, কেহ কিছুই পরে না। নগ্নদেহে থাকে। আর আছে সমুদ্রে ও খালে চলাচল করিবার জন্য নানারকমের কাঠের ভেলা ও শালতি। কয়েকটি কাঠের খণ্ড একত্রে ভেলার মতো বাঁধা, অথবা কাঠের খিল বা হুক দিয়া জোড়া দেওয়া। আমাদের দেশে পুরী হইতে মাদ্রাজ উপকূল পর্যন্ত সমুদ্রতীরের নুলিয়া জেলেরা একরকমের **ক্যাটামারান** (তামিল **কট্টুমারান**) সামুদ্রিক মাছ

ধরিবার জন্য ব্যবহার করে। তিনখণ্ড কাঠ দিয়া এগুলি তৈরী, লোহার হুক বা পেরেকের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। কাঠের খিল ও হুক দিয়া কাঠের খণ্ডগুলি জোড়া। বাংলাদেশে তালগাছের কাণ্ড চিরিয়া যে ডোঙ্গা তৈরী হয় তাহাও খুব প্রাচীন জলযানের নমুনা। আন্দামানীদের শাল্‌তি সাম্পান ও ভেলার সহিত আমাদের এইসব জেলিয়া নৌকার অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

আন্দামানীদের ব্যক্তিগত স্বত্ববোধ

এত সরল ও সহজ জীবন যাহারা যাপন করে তাহাদের কোন জমিজমা বা জিনিসপত্রের প্রতি ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ থাকিবার কথা নহে। আন্দামানীদের মধ্যে এই বোধ প্রবলভাবে না থাকিলেও, অল্পবিস্তর আছে। জমিজমার মালিক গোষ্ঠীর সকলে, কেহ একা নহে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর শিকারক্ষেত্রের সীমানা নির্দিষ্ট থাকে এবং সেখানে সেই গোষ্ঠীভুক্ত যে-কোন ব্যক্তি যখন ইচ্ছা শিকার করিতে পারে। কিন্তু তাহার মধ্যেও ব্যক্তিগত মালিকানার আভাস পাওয়া যায়। অরণ্যের মধ্যে একটি কোন বিশেষ গাছের মালিক একজন হইতে পারে, কারণ সে প্রথম গাছটি দেখিয়াছে ও বাছিয়া রাখিয়াছে, হয়ত তাহার শালতি তৈরী করিবার জন্য। গাছটির কথা সকলকে একবার বলিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলেই হইল। কেহ তাহার গাছ কাটিবে না। ফলমূলের গাছ হইলে কেহ তাহার ফল পাড়িবে না। শিকারের সময় অবশ্য যে প্রথম অরণ্যের মধ্যে শূয়োর দেখিবে বা দেখাইবে, শূয়োরটি তাহার হইবে না। শূয়োরটি যে ধনুকের তীর মারিয়া বিদ্ধ করিবে তাহারই হইবে। সমুদ্রের যে মাছ বা কচ্ছপ যে বর্শাবিদ্ধ করিবে, তাহা তাহারই হইবে। বনের মধুর চাক বা গাছের ফল যে

গাছে উঠিয়া পাড়িয়া আনিবে, তাহাও তাহারই হইবে। যে-হাতিয়ার যে গড়িবে, সে তাহার মালিক হইবে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই অধিকারের কোন পার্থক্য নাই।

এই ব্যক্তিগত স্বত্ববোধ আন্দামানীদের মধ্যে থাকিলেও তাহার জন্য তাহাদের সমাজে ও গোষ্ঠীতে কোন শ্রেণীভেদ নাই। শিকারলব্ধ খাদ্যদ্রব্য তাহারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া নেয়, সকলে মিলিয়া প্রত্যেকের গৃহ নির্মাণ করে। ব্যক্তিগত স্বত্ব সামান্য থাকিলেও, একজন ভোগ করিতেছে এবং গোষ্ঠীর ও বসতির অন্য কেহ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে, একথা আন্দামানীরা ভাবিতে পারে না। আন্দামানীরা নিজেরা খাদ্য বা অন্য কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ বিশেষ জাগে নাই। প্রকৃতির দান ও সম্পদ যাহা, তাহার প্রতি সকলের অধিকার সমান এবং তাহা জীবনধারণের জন্য সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া নেওয়া উচিত, এটুকু সাম্যবোধ তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবেই আছে বলিয়া মনে হয়।

আন্দামানীদের জীবনযাত্রা

আন্দামানীদের দৈনন্দিন জীবন শুরু হয় সূর্যোদয়ের পর হইতে। ক্যাম্পে সাড়া পড়িয়া যায়। আগের দিনের খাদ্য যাহা থাকে তাহা দিয়া রান্নার তোড়জোড় চলিতে থাকে। পুরুষরা শিকারে বাহির হইয়া যায়। দুইজন হইতে পাঁচজন পর্যন্ত লইয়া এক-একটি শিকারীর দল গঠন করা হয়। আজকাল কুকুর সঙ্গে লইয়াও ইহারা শিকার করিতে যায়। গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া বুনো শূয়োর ও খাটাসের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং সন্ধান পাইলে তীরবিদ্ধ করিয়া মারে।

প্রয়োজন হইলে তখনই তাহার চামড়া ছাড়াইয়া, নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া, আগুনে ঝলসাইয়া ভাগাভাগি করিয়া খাইয়া ফেলে। তাহা না হইলে ক্যাম্পে আনিয়া, যৌথ রান্নাঘরে ঝলসাইয়া, তাহার মাংস প্রত্যেক পরিবারকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাহা দিয়া প্রত্যেক পরিবারের গৃহে রাত্রির আহার তৈরী করা হয়। জঙ্গলের মধ্যে চলিতে চলিতে শিকারীর দল গাছের ফল মূল বীজ মধু প্রভৃতি যে খাদ্য যখন পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করে এবং ক্যাম্পে বহন করিয়া আনিয়া ভাগ করিয়া নেয়। উপকূলবাসীরাও এইভাবে দল বাঁধিয়া, শালতিতে ও ভেলায় চড়িয়া, সামুদ্রিক কচ্ছপ ও অন্যান্য জীব শিকার করে।

পুরুষরা যখন শিকারে যায়, মেয়েরা তখন ঘরের কাজকর্ম ও শিশুদের দেখাশুনা করে, জ্বালানী কাঠ কুড়াইয়া আনে, জল আনে। তাহার ফাঁকে ফাঁকে ঝোড়া বুনিতে থাকে, আবার জঙ্গলে চলিয়া গিয়া ফলমূলবীজ খাদ্যও সংগ্রহ করে। দ্বিপ্রহরে ক্যাম্পে কোন জোয়ান ও কর্মঠ পুরুষ বা নারী কেহ থাকে না, কয়েকজন বুড়োবুড়ী শিশুদের লইয়া পড়িয়া থাকে।

রাত্রির প্রধান আহার শেষ হইবার পর, নৃত্যের আঙ্গিনাতে বেশ কিছুক্ষণ নাচগান চলিতে থাকে। আন্দামানীদের নৃত্যের বৈচিত্র্য আছে। একখণ্ড কাঠ, একগোছা লতাপাতা বা গাছের ডাল মাটিতে ঠুকিয়া তাল দিতে দিতে নৃত্য করে, পুরুষেরা কেহ একজন গান গায়, মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে গাহিতে থাকে। হাঁটু ভাঙ্গিয়া উবু হইয়া বসিয়া কচ্ছপের ভঙ্গীতে কচ্ছপনৃত্য করা হয়। কোন কোন উপজাতির পুরুষ ও মেয়েরা মুখোমুখি দুই সারিতে দাঁড়াইয়া, সামনে ঝুঁকিয়া নৃত্য করিতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম ও বীরভূম অঞ্চলের সাঁওতালী নৃত্যের সহিত এই নৃত্যের সাদৃশ্য আছে।

নাচগান ছাড়াও আন্দামানীরা একত্রে বসিয়া গল্প করিতে ও শুনিতে ভালবাসে। কোন শিকারী তাহার অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করিতে থাকে, শ্রোতারা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তন্ময় হইয়া শোনে। বক্তার কাহিনীর আর শেষ হয় না যেন। কি উপায়ে, কত কৌশলে, কতরকম ফন্দি করিয়া সে কত শূয়োর শিকার করিয়াছে, তাহার বর্ণনা চলিতে থাকে। বর্ণনায় স্বভাবতঃই রঙ চড়াইয়া, অভিজ্ঞতাকে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়া উপভোগ্য করা হয়। গল্প জমিয়া উঠে এবং একটির পর একটি শূয়োরও মরিতে থাকে। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের কথকদের কথা মনে হয়। বহুকাল হইতে মানুষ মুখে মুখে এইভাবে গল্প বলিয়া আসিতেছে। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত কল্পনার রঙ মিশাইয়া কাহিনী রচনার কৌশল দীর্ঘকাল আগে মানুষ যে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা আন্দামানীদের এই শিকারের কথকতা হইতে বোঝা যায়।

আন্দামানীদের ধর্ম ও সংস্কৃতি

বাহিরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া যাহারা জীবন কাটায়, তাহার কোন রহস্য ভেদ করিবার শক্তি নাই যাহাদের, তাহারা ভয়ে ও বিস্ময়ে প্রকৃতিকেই পূজা করে। কেন ঝড়জল বিদ্যুৎ হয়, কেন গাছে ফলমূল হয়, কেন মানুষ জন্মায় ও মরিয়া যায়, মরিবার পরে মানুষ অন্য কোন অজানা স্থানে যায় কি না, এসব প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তর দিবার তাহাদের ক্ষমতা নাই। আধুনিক সমাজেরও অধিকাংশ মানুষের মনে যখন এইসব প্রশ্ন জাগে, তখন আন্দামানীদের মনে যে জাগিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আন্দামানীদের প্রধান দেবতা দুইটি— বিলিকা (পুলুগা) ও টেরিয়া (ডেরিয়া)। দুই দেবতাই

দুই ঋতুর প্রধান বায়ুর (Wind) দেবতা। **টেরিয়া** হইল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দেবতা, আর **বিলিকা** উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর দেবী। টেরিয়া বৃষ্টির দেবতা, বিলিকা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের দেবী। এই দেবদেবীকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে তাঁহারা যথেষ্ট ক্ষতি করিতে পারেন এবং সন্তুষ্ট হইলে প্রভূত উপকার করিতে পারেন, এ বিশ্বাস অন্যান্য আরও অনেক মানুষের মতো আন্দামানীদেরও আছে। চুরি জুয়াচুরি বা অন্য কোন সামাজিক অপরাধ করিলে, গোষ্ঠীর প্রবীণ ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া বিচার করেন ও দণ্ড দেন বটে, কিন্তু দেবতারাও উদাসীন থাকেন না, তাঁহারাও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করেন। আধুনিক সমাজের অধিকাংশ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সহিত আন্দামানীদের বিশেষ পার্থক্য নাই দেখা যায়। তাহার কারণ, যে ভয় হইতে, অনিশ্চয়তা হইতে, জীবনের অনেক অজানা রহস্য হইতে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছে মানুষ, তাহা সকল মানুষের মধ্যে আজও প্রায় সমানভাবে সক্রিয় রহিয়াছে। তাই আন্দামানীদের সহিত আমাদেরও অনেক দেবদেবীর কল্পনায় একটা মিল রহিয়াছে দেখা যায়। আন্দামানীদের ধ্যানধারণা, ধর্মবিশ্বাস, ভাষা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আমোদ-প্রমোদ নৃত্যগীত, শিকার-কথকতা, জাতি উপজাতি গোষ্ঠী পরিবার লইয়া সামাজিক গড়ন, নিত্য ব্যবহারের দ্রব্য ইত্যাদি সব মিলাইয়া একটি নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পরিবেশ ও সামাজিক স্তরের সহিত তাহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

তথ্য ও সিদ্ধান্ত

আন্দামানীদের সমাজের গড়ন, বসতি-বিন্যাস, জীবনযাত্রা, ধ্যানধারণা ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইল তাহা হইতে

সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্ত করিতে পারি। যেমন ঃ

ক। গোষ্ঠীবদ্ধ ও দলবদ্ধ হইবার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত বলা চলে। জীবনধারণের সংগ্রামের জন্য, খাদ্যসংগ্রহের জন্য, বসতিগৃহ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া আশ্রয় লইবার জন্য, মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়। আন্দামানীদের মধ্যেও তাই গোষ্ঠীবদ্ধতা আছে দেখা যায়।

খ। মানবসমাজের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হইল 'পরিবার'। পরিবারই সমাজের ভিত্তি রচনা করে। কয়েকটি পরিবার লইয়া গোষ্ঠী, কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া উপজাতি, এবং কয়েকটি উপজাতি লইয়া একটি বড় দল গড়িয়া উঠে, যেমন বড় আন্দামান ও ছোট আন্দামান।

গ। গোষ্ঠীবদ্ধ কয়েকটি পরিবার মিলিয়া বসতি গড়িয়া তোলে, প্রধানতঃ সকলে মিলিয়া মিশিয়া জীবনধারণের তাগিদে; প্রাকৃতিক পরিবেশ ভেদে, জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনে, বসতির স্থায়িত্ব নির্ধারিত হয়।

ঘ। যাহারা নিজেরা খাদ্য উৎপাদন করে না, প্রকৃতির খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তেমন ভেদবৈষম্য নাই, জটিলতা নাই। ব্যক্তিগত স্বত্ববোধ তাহাদের কম, সাম্যবোধ ও সহযোগিতাবোধ প্রবল।

আন্দামানীদের মতো আরও অনেক খাদ্যসংগ্রাহক, প্রকৃতিনির্ভর সুপ্রাচীন জাতি-উপজাতির জীবনধারা অনুসন্ধান করিয়া, সমাজবিদ্‌রা মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি জানিতে পারিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়



আলমোড়াবাসীদের জীবন

আন্দামানীদের খাদ্য-সংগ্রাহক বলা হইয়াছে, কারণ তাহারা নিজেরা কোন খাদ্য বা পণ্য উৎপাদন করে না। স্থলে জলে প্রকৃতির দেওয়া ফলমূল জীবজন্তু শিকার ও সংগ্রহ করিয়া জীবনধারণ করে। এই প্রকৃতি-নির্ভরতার জন্য তাহাদের সমাজের গড়ন ও জীবনযাত্রার ধরন কি রকম হইয়াছে, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। উত্তর-প্রদেশের আলমোড়া জেলার পর্বতবাসীদের সহিত আন্দামানীদের পার্থক্য আছে। আলমোড়ার পর্বতবাসীরা খাদ্য-উৎপাদক (Food-Producer), খাদ্য-সংগ্রাহক (Food-Gatherer) নহে। পর্বতবাসী বলিয়া প্রকৃতির উপর তাহাদেরও অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু তাহারা চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পশুপালন করিয়া জীবন-ধারণ করে। চাষবাস তো বটেই, পশুপালনও খাদ্য-উৎপাদন। খালি বা পতিত জমি চষিয়া ফসল ফলাইলে যেমন খাদ্য উৎপাদন করা হয়, তেমনই বনের পশুকে পোষ মানাইয়া, তাহাকে পালন করিয়া, তাহার বংশবৃদ্ধি করিয়া, যানবাহন ও বোঝা টানার কাজে লাগাইলে এবং তাহার দুধ মাংস ইত্যাদি খাদ্যের জন্য ব্যবহার করিলে, তাহাকেও খাদ্য উৎপাদন করা বলা যাইতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি দুয়েরই পার্থক্যের জন্য





তিব্বত
গাড়ওয়াল
ভোট অঞ্চল
আলমোড়া
অঞ্চল
নেপাল
নৈনিতাল
গোগাড়ীর পথ
ছাগল ও ঝিব্বু (পথ)
ঘোড়া (পথ)
মেঠোপথ
মোটর ও গোগাড়ী (পথ)

আন্দামানীদের সহিত আলমোড়াবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতির গড়নের পার্থক্য ঘটিয়াছে।

আলমোড়ার পার্বত্য পরিবেশ

ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ১৫০ হইতে ৩০০ মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত। ইহার উচ্চাংশে বহু হিমবাহ আছে, গায়ে আছে গভীর অরণ্য এবং মধ্যে মধ্যে আছে উপত্যকা ও মালভূমি। সমগ্র হিমালয় তিনটি পর্বতশ্রেণীতে বিন্যস্ত। সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী চিরতুষারাবৃত, 'প্রধান হিমালয়' বলে। পরবর্তী পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম, অর্থাৎ ৬০০০ হইতে ১২০০০ ফুট পর্যন্ত তাহার উচ্চতা। কাশ্মীর উপত্যকা এই 'বহির্হিমালয়ে'র স্তরে অবস্থিত। তাহার পরবর্তী পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা সর্বাপেক্ষা কম, 'অব-হিমালয়' বলা হয়। এই নিম্নতম স্তরের উত্তরে বিস্তৃত অরণ্য, দক্ষিণে সমৃদ্ধ জনবসতি। এই তিন স্তরের পর্বতশ্রেণীই আলমোড়া জেলার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। সমুদ্রের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, পর্বতশ্রেণীর উচ্চতার উপরেই আবহাওয়ার তারতম্য নির্ভর করে। জেলার উত্তর সীমা শীতপ্রধান, গ্রীষ্মকালেও মধ্য-উষ্ণতা ৫০ ডিগ্রীর বেশী হয় না। এই অঞ্চলে গাছপালা জন্মায় না, জন্মাইতে পারে না। মধ্যবর্তী অঞ্চলে কিছুদিন গ্রীষ্মকালের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শীতের প্রকোপ এখানেও বেশী। অক্টোবর হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত চারিদিক তুষারে ঢাকা থাকে এবং জীবন্ত পশু ও মানুষ এই সময় আরও দক্ষিণে নিম্নাঞ্চলে নামিয়া যায়। নিম্নাঞ্চলের আবহাওয়া উত্তর ভারতের সাধারণ আবহাওয়ার মতো, গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীত তিন ঋতুরই আবির্ভাব হয় সেখানে।

আন্দামানীরা জলে
শিকার করিতেছে



পাহাড় অঞ্চলে এইভাবে থাক-কাটিয়া চাষ করা হয়।



ভোটদের কঠোর জীবন

ক্যাপকট হইতে অ্যাস্কট পর্যন্ত যদি একটি রেখা টানিয়া দুই ভাগে আলমোড়া জেলাকে ভাগ করা হয়, তাহা হইলে সেই রেখার উত্তর-পূর্ব অংশকে স্থানীয় লোকের ভাষায় **ভোট অঞ্চল** বলা যায় এবং বাকি অর্ধেক অংশকে বলা যায় **আলমোড়া অঞ্চল**। ভোট অঞ্চলের উপত্যকাগুলির উচ্চতা ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০ ফুট। চারিদিকে তাহার পাথরের কাঠিন্য ও তুষারের জড়ত্ব। জীবনের স্ফূর্তির জন্য কোন রসকষ নাই কোথাও। ভূবিদরা ইহাকে নীরস পাথর ও তুষারের মরুভূমি বলেন। ভোটদের জীবনযাত্রাও বাহিরের প্রকৃতির মতো কঠোর। পার্বত্য নদীর ধারে ধারে ভোটদের বসতি। তাহারই আশেপাশে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট ভূখণ্ডে তাহারা চাষ করে। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মতো থাক কাটিয়াও (Terracing) তাহাদের চাষ করিতে হয়। গরু-মহিষের মতো পশুর কাঁধে লাঙল জুতিয়া চাষ করা কঠিন বলিয়া, ভোটরা নিজেরাই প্রায় পশুর মতো লাঙল টানে। সামনে একজন বা দুইজন পুরুষ (বলদের মতো) লাঠিতে ভর দিয়া গায়ের জোরে লাঙল টানিতে থাকে, পিছনে একজন হাল ধরিয়া থাকে চাষীর মতো। এত মেহনত করিয়া পাহাড়ের গায়ে ও পাথুরে উপত্যকায় ফসল ফলাইয়াও ভোটরা নিশ্চিন্তে স্থায়ীভাবে একস্থানে বারোমাস বাস করিতে পারে না। গরু ছাগল ভেড়ার চারণভূমি দুর্লভ বলিয়া, ঘাস গাছ-আগাছার সন্ধানে তাহাদের স্থান হইতে স্থানান্তরে যাযাবরের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সারা গ্রামের সমস্ত ভোট পরিবার, গরু ভেড়া ছাগল ঘোড়ার পালের সহিত চলিতে থাকে। মানুষ ও পশুর কাঁধেপিঠে গোটা একটি ভোট গ্রাম যেন একস্থান হইতে অন্যস্থানে উঠিয়া যায়। প্রকৃতি নিষ্ঠুর ও উদাসীন

বলিয়া মানুষও কষ্টসহিষ্ণু হইতে বাধ্য হয়। প্রকৃতিই যেন সেইভাবে তাহাদের গড়িয়া তোলে। আরামপ্রিয় হইলে এখানে মানুষ বাঁচিতে পারিত না। ভোটরা তাই বলিষ্ঠ ও কর্মঠ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার সহিত পাল্লা দিয়া বাঁচিয়া আছে।

আলমোড়া পর্বতবাসীর যাযাবর জীবন

আল্পস ও পীরেনিজ পাহাড়ের অধিবাসীদের মতো হিমালয়বাসীরাও গবাদি পশু প্রতিপালনের জন্য কিছুটা যাযাবর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। মানুষ তাহার পালিত পশুর খাদ্যের সন্ধানে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সপরিবারে স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। উচ্চতর পর্বতাঞ্চলে চারণভূমির জন্য বিশেষ ঋতুতে এই অভিযান পর্বতবাসীদেরই বৈশিষ্ট্য।

পাহাড়ী গরু ছাগল ভেড়া দৈহিক গড়নে কতকটা পাহাড়ী মানুষের মতো বেঁটেখাট ও বলিষ্ঠ। দেখিতে বেটে হইলেও তাহারা খুব পরিশ্রমী। সমতলের গরু-ভেড়ার মতো দুগ্ধবতী নহে। অল্প দুধ দেয়, খাটিতে পারে খুব। মহিষের দুধই এই অঞ্চলে প্রধান, কিন্তু মহিষেও, খুব বেশী হইলে, দিনে দুই সেরের বেশী দুধ দেয় না। গরুতে সাধারণতঃ একসের করিয়া দুধ দেয়। দিনের বেলা কাছাকাছি জঙ্গলে তাহাদের চরাইতে লইয়া যাওয়া হয়। গাভীগুলিকে গোয়ালেই খাইতে দেওয়া হয়, কারণ পাহাড়ের ঢালু গা হইতে পিছলাইয়া পড়িয়া অনেক সময় তাহারা মরিয়া যায়। দুগ্ধবতী গাভী মরিয়া গেলে ক্ষতি হইবে বলিয়া, তাহাদের গোয়ালে বাঁধিয়া রাখিয়া, বলদগুলিকে চরিতে দেওয়া হয়। পাহাড়ীদের বাসস্থানের সংলগ্ন **গোঠে** রাত্রে তাহারা বাঁধা থাকে, শুইবার জন্য ওক ও পাইন গাছের পাতা বিছাইয়া

দেওয়া হয়। দূরে আলাদা গোয়ালঘরেও (গৌয়ার বলে) তাহাদের রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

গবাদির খাদ্য যোগানোই পাহাড়ীদের কাছে মহা সমস্যা হইয়া উঠে। শীতকালে পাহাড়ের উপরদিকের চারণভূমি তুষারে ঢাকিয়া যায়, গাছপালার ও ঘাসের বিশেষ চিহ্ন থাকে না কোথাও। চারিদিকে তুষারমরু ধূ ধূ করিতে থাকে। শীতকালে তাই পাহাড়ীদের পক্ষে উপরে বাস করা সম্ভব হয় না, নীচের উপত্যকায় তাহারা নামিয়া আসে, কারণ সেখানকার আবহাওয়া তখন উপভোগ্য ও বাসোপযোগী এবং গবাদির খাদ্যও তখন উপত্যকা অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রকৃতির রূপ আবার বদলাইতে থাকে। যত তাপ বাড়িতে থাকে, তত দ্রুত গাছপালা ঘাস গজাইতে থাকে। কচি কচি ঘাসের ও গাছের পাতায় জঙ্গল ছাইয়া যায়। প্রকৃতির সাদা ধবধবে তুষাররূপ গাছপালার শ্যামলতায় জীবন্ত হইয়া উঠে। অল্পদিনের মধ্যে পাহাড়ের উপরদিকের শীতের প্রকোপ কমিয়া যায় এবং তাহা গবাদি পশুর বিচরণের উপযোগী হয়। এদিকে উপত্যকার খাদ্যও ফুরাইয়া আসে। পাহাড়ী চাষী বুঝিতে পারে, নীচের উপত্যকায় থাকিলে গরু-ভেড়ার খাদ্য যোগানো আর সম্ভব হইবে না। উপরের দিকে যাত্রা করিবার সময় হইয়া আসে।

স্থানান্তরে যাত্রা করিবার প্রয়োজনীয়তা বাড়ে আরও একটি কারণে। চলাচলের উপযুক্ত গম্য পথ ভাল থাকিলে দূর হইতে ঘাসখড় গাড়ী বোঝাই করিয়া, বা পশুর পিঠে চাপাইয়া বহিয়া আনা যায়। সেরকমের পথের অভাব এ-অঞ্চলে খুব বেশী। অধিকাংশ পথই দুর্গম। তাই উপরের চারণভূমিতে চলিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। উপরে যাত্রা করিবার পরে নীচের উপত্যকায়

যে তৃণ-খাদ্য জন্মায় তাহা স্থানীয় অধিবাসীরা শীতকালের জন্য মজুত করিয়া রাখে।

আট-দশ হাজার ফুট উপরে ওকগাছের জঙ্গলের মধ্যে থাকে গোচারণভূমি। গ্রীষ্মকালে সেইখানে যাইতে হয়। চৈত্রের মাঝামাঝি কয়েকজন রাখাল বালক গরুর পাল লইয়া প্রথমে যাত্রা করে। স্থানের দূরত্ব অনুপাতে যাত্রার সময় ঠিক করা হয়। দূরত্ব ছাড়াও আরও অনেক সমস্যা আছে। গ্রামের মজুত খাদ্যের পরিমাণ বুঝিয়া, কতজন রাখাল বালককে গ্রামের অন্যান্য কাজ হইতে ছুটি দেওয়া যায় এবং চাষ আবাদের জন্য গরুমহিষের প্রয়োজন কতটা তাহা হিসাব করিয়া তবে যাত্রার সময় ঠিক করা হয়।

কয়েকঘণ্টার বা একদিনের পথ হইলে সাধারণতঃ বৎসরে চারবার উঠানামা করিলেই চলে। প্রথমে তাহারা চৈত্রের শেষে যাত্রা করিয়া জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় ফিরিয়া আসে, কারণ তখন গম কাটিবার জন্য এবং ধান বুনিবার জন্য লোকজন ও গরু-মহিষ দরকার হয়। পনের দিন বা একমাসের মধ্যে, জ্যৈষ্ঠের শেষে বা আষাঢ়ের গোড়ায়, দ্বিতীয়বার যাত্রা করিয়া আরও কিছুদিন বেশী থাকিবার অবসর হয়, কারণ খড়িফ শস্য বপনের কাজ তখন শেষ হইয়া যায়, কাজের বিশেষ তাগিদ থাকে না। বর্ষা পড়িলে আবার তাহারা ফিরিয়া আসে, কারণ তখন বাৎসরিক উৎসবের সময়। বর্ষাকালে প্রচুর ঘাস জন্মায় বলিয়া গরু-ভেড়ার খাদ্যেরও তখন অভাব হয় না। শ্রাবণের শেষে বা ভাদ্রের গোড়ায় তৃতীয় যাত্রা আরম্ভ হয়, কারণ তখন গরু-মহিষ ও মানুষের কোন প্রয়োজন হয় না চাষের জন্য। অবশ্য গরুর খাদ্য তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, খাদ্যের প্রয়োজনে উপরের চারণভূমিতে যাইবার দরকার হয় না। কিন্তু উচ্চভূমির ঘাস খুব পুষ্টিকর

বলিয়া গবাদির স্বাস্থ্যের জন্য পাহাড়ীরা তখন উপরে যায়। শস্য কাটার সময় হইলে আবার ফিরিয়া আসে। খড়িফ শস্য কাটা শেষ হইলে চতুর্থ যাত্রা আরম্ভ হয়। তারপর যখন শীতের আগমনে উপরের চারণভূমিতে আর ঘাস জন্মায় না, ক্রমে তুষার পড়িয়া সব ঢাকিয়া যাইতে থাকে, তখন তাহারা আবার নীচের উপত্যকায় ফিরিয়া আসে এবং সারা শীতকাল গ্রামেই বাস করে।

গ্রামের সকলেই যে এইভাবে চারবার উঠানামা করে, তাহা নহে। যাহাদের চাষের লোকজন বা গরুমহিষ বাড়্‌তি থাকে, তাহারা একবারই হয়ত চৈত্র মাসে যাত্রা করিয়া কার্তিক মাসে ফিরিয়া আসে। সাধারণতঃ তাহারা অনেক উপরের চাবণভূমিতে চলিয়া যায়। এই-সব চারণভূমির ঘাসপালা খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। বহু দূর হইতে পাহাড়ীরা তাহাদেব গরু ভেড়া লইয়া এইসব স্থানে উঠিয়া আসে। এইসব চারণভূমির মধ্যে দানপুরের ঢাকুরী ও গাড়ওয়ালের দুদাটোলি বিখ্যাত। ঢাকুরীর চারণভূমির খ্যাতি এত বেশী যে সুদূব কাশ্মীর হইতে গুজ্জররা পর্যন্ত সেখানে পশু চরাইতে যায়।

গ্রীষ্মকালীন গোষ্ঠযাত্রার বিবরণ

পাহাড়ীদের এই চারণভূমিতে যাত্রাকে 'গোঠে যাওয়া' বা **গোষ্ঠ-যাত্রা** বলা হয়। পশ্চিমের দানপুর হইতে পূর্বের শোর, সিরা পর্যন্ত আলমোড়া জেলার মধ্যভাগের পশুপালকদের মধ্যেই গোষ্ঠযাত্রার রীতি আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য এই রীতি প্রচলিত হইয়াছে। গোষ্ঠযাত্রা না করিয়া তাহাদের বাঁচিবার উপায় নাই। যাত্রার আগে সামান্য কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পালা শেষ হয়। শুভযাত্রার দিনক্ষণ ঠিক হইলে, গ্রামদেবতার পূজা দিয়া, পরিবারের

সকলে যাত্রা করে। জিনিসপত্তর বাঁধাবাঁধি দুইচার দিন আগেই আরম্ভ হয়। এক-একটি দলে পুরুষের সংখ্যাই থাকে বেশী। অক্ষম বৃদ্ধবৃদ্ধারা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গ্রামেই থাকে, কারণ তাহারা গোষ্ঠযাত্রার পথের কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা শুরু হয়। পালে গরু ছাগলের সংখ্যা বেশী হইলে দ্রুত পথচলা সম্ভব হয়, মহিষ থাকিলে মন্থর গতিতে চলিতে হয়। বিভিন্ন পরিবারের লোকজন যাত্রাকালে পথে দলবদ্ধ হইয়া যৌথ পরিবারের মতো চলিতে থাকে, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা, কাজকর্ম সকলে একসঙ্গে করে। নীচের গ্রাম্য বসতিতে যে পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য থাকে এবং বজায় রাখা চলে, গোষ্ঠযাত্রাকালে দুর্গম পার্বত্য পথের যাযাবর জীবনে তা ভাঙিয়া দিতে হয়। জঙ্গলে থাকিবার সময় কাছাকাছি গ্রামের লোক খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে। শাকসব্জী তেমন পাওয়া যায় না বলিয়া, দুধ ঘি প্রধান খাদ্য হইয়া উঠে।

গোঠে পৌঁছাইয়া প্রথমেই গোয়াল তৈরীর আয়োজন চলিতে থাকে। অস্থায়ী গোয়াল, পাহাড়ীরা বলে **খড়ক**। চার রকমের খড়ক বা গোয়াল আছে ; (১) চতুষ্কোণাকার খড়ক, খাড়াই চালের ; (২) তাঁবুর মতো খড়ক, নাম ঘুনগুটিয়া ; (৩) পিরামিডের মতো চাল দেওয়া খড়ক ; (৪) শীতকালের মজবুত খড়ক, কাঠ ও পাথর দিয়া গড়া। কাঠ কাটিয়া গাছের পাতা দিয়াও চলনসই খড়ক তৈরী করা হয়।

একই উপত্যকার কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি চারণভূমি নির্দিষ্ট থাকে, পাহাড়ীরা তাহাকে **খাটা** বলে। খাটা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, গ্রামের সকল পরিবারের সাধারণ সম্পত্তি। খাটার মধ্যে একটি স্থান বাছিয়া লইয়া বাসের ঘর নির্মাণ করা হয়। পানীয়

জল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া বসতির স্থান বাছা হয়। ৭। সাময়িক বাসের জন্য বলিয়া খুব মজবুত করিয়া ঘর বাঁধিবার দরকার হয় না। স্থানীয় গাছ কাটিয়া কাঠের খুঁটি দিয়া কাঠাম তৈরী করিয়া পাতা দিয়া ছাওয়া হয়। খুঁটিগুলি একসঙ্গে



পাহাড়ী খড়ক

বাঁধিয়া তাহার ফাঁকে ফাঁকে পাতা গুঁজিয়া দেয়াল দেওয়া হয়। প্রায় আট-দশ ফুট উঁচু দেয়ালের উপর ঢালু চাল থাকে এবং দরজাগুলি খুব ছোট ও নীচু করা হয়, যাহাতে বন্য জন্তু না ঢুকিতে পারে।

গোচারণের নিয়মিত কাজের ফাঁকে ফাঁকে সকলে অন্যান্য কাজকর্মও করে। দুধ হইতে মাখন তুলিয়া গ্রামে চালান দেওয়া হয়। গোঠে বিভিন্ন গ্রামের গরু-মহিষের সমাবেশ হয় বলিয়া তাহার আদান-প্রদান, বেচাকেনাও চলে। স্থানীয় গাছের কাঠ হইতে নানারকমের হাতিয়ার তৈরী করা হয়, যেমন **কুত্‌লা** (Hoe), **কাস্তে, কুঠারের হাতল** ইত্যাদি। এইভাবে গ্রীষ্মকালে গোচারণের দিনগুলি পাহাড়ের উপরে কাটিয়া যায়।

শীতকালীন অবরোহণ

আলমোড়া জেলার পশুপালকদের মধ্যেই এই গ্রীষ্মকালীন গোষ্ঠ-যাত্রার রীতি আছে। মধ্যাঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিমভাগে পশু-পালকদের প্রাধান্য। কিন্তু মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ীরা কেবল পশুপালন করে না, তাহার সহিত চাষবাস ও ব্যবসাবাণিজ্যও করে। তাহাদের মধ্যে সকল রকমের বৃত্তিজীবী দেখিতে পাওয়া যায়। শীতকালে কার্তিক-অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন-চৈত্র পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে যখন অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়ে, গাছপালা সব মরিয়া যায়, দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যখন প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন পাহাড়ীরা নীচে ভাবর্স অঞ্চলে নামিয়া আসে। পাহাড়ের পাদদেশে, তরাই ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে ভাবর্স অঞ্চল বলা হয়। বর্ষাকালে এখানে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয় এবং জলবায়ুর আদ্রতা, গরম ও পলিমাটির জন্য গাছপালাও অনেক জন্মায়। শীতকালে স্বাস্থ্য ভালই থাকে। তাই উপরের পার্বত্য অঞ্চলের, বিশেষ করিয়া পাচায়ুন, কুমায়ুন ও ফাল্‌দাকোটের অধিবাসীরা শীতকালে নীচের দিকে ভাবর্স অঞ্চলের মনোরম পরিবেশে নামিয়া আসিয়া বসবাস ও কাজকর্ম করে।

অগ্রহায়ণে ফসল কাটার কাজ শেষ হইবার পর হইতেই ভাবর্সে যাত্রার প্রস্তুতি চলিতে থাকে। গ্রহাচার্য যাত্রার শুভদিনক্ষণ ঠিক করেন। সকলে ভাল পোশাক পরিয়া, কপালে সিঁদুরের মঙ্গলটিপ দিয়া, জিনিসপত্র গুছাইয়া, বোঁচকাবুচকি বাঁধিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়। বিছানা, বাসনকোসন, খাদ্যদ্রব্য, চাষের যন্ত্রপাতি সব সঙ্গে থাকে। গরুর গাড়ীতে ও ঘোড়ার পিঠেও মাল বোঝাই করা হয়। পুরুষেরা পিঠে বোঝা বহন করে। মেয়েরা গাড়ী চালায়, কেহ কেহ টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বোঁচকার উপর বসিয়া চলিতে থাকে। ঘোড়ার মধ্যে

শিশুদের বসাইয়া দিয়া, ঘোড়ার পিঠে দুইদিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, আবার মায়েদের পিঠে শিশুদের ঝোড়ার মধ্যে রাখিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। গরুমহিষের পালও রাখালদের তত্ত্বাবধানে সহযাত্রীর মতো চলিতে থাকে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য! চোখে না দেখিলে কেবল বর্ণনা পড়িয়া তাহা উপভোগ করা যায় না।

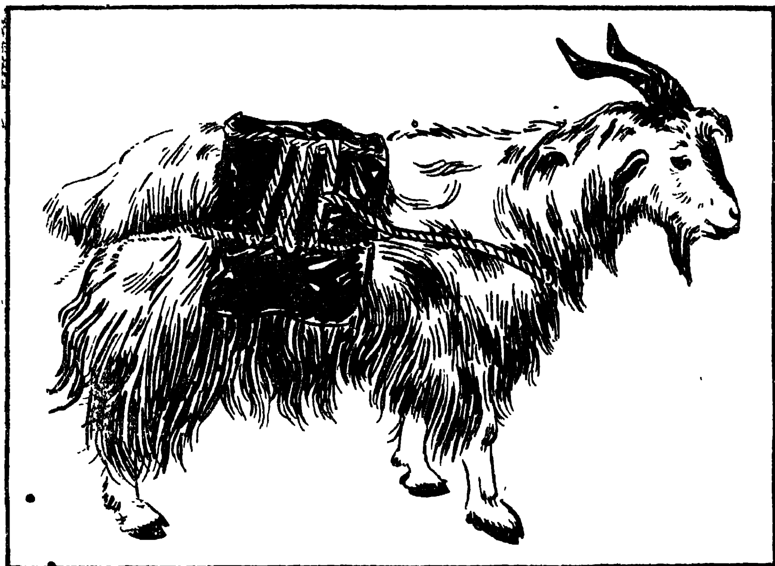
দশ-পনের মাইলের বেশী পথ একদিনে চলা হয় না, এবং সমস্ত পথ চলিতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে। সারাদিন পথ চলিয়া সূর্যাস্তের পর বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। তখন কোন গ্রাম বা হাট-বাজার-দোকানেব কাছে রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু ফেলা হয়। চা খাবার-দাবার তৈরী হইলে, তাহা খাইয়া, পুরুষেরা ধূমপান করিতে করিতে গল্পের আসর জমায়, মেয়েরা শিশুদের আদরযত্ন করে, কেহ কেহ হাতের কাজকর্মও করিতে থাকে। ঠিক গ্রামের মতো পরিবেশ রচিত হয় এবং মনে হয় যেন একটি চলন্ত গ্রাম পথ চলিতে চলিতে থামিয়া রহিয়াছে।

ভাবর অঞ্চলে প্রত্যেক গ্রামের পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট গোঠ থাকে। জঙ্গল হাসিল করিয়া বংশানুক্রমে তাহারা সেই গোঠ ভোগ করিয়া আসিতেছে এবং শীতকালে সেইখানে আসিয়া বসবাসও করিতেছে। ভাবরে পৌঁছিবার পর যে যাহার নির্দিষ্ট গোঠে ঘর বাঁধিবার আয়োজন করে। পাশাপাশি গ্রামের লোক কাছাকাছি ঘর বাঁধিয়া বসবাস করে, কারণ তাহাতে কাজকর্মে, জন্তুজানোয়ার চোরডাকাতের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষায়, পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের সুবিধা হয়। ঊর্ধ্বাঞ্চলের খড়কের মতো গরু, বাছুরের জন্য গোয়ালঘর তৈরী করা হয়। এইভাবে বসবাসের ব্যবস্থা হইলে যে যাহার কাজকর্মে নিযুক্ত হইয়া যায়।

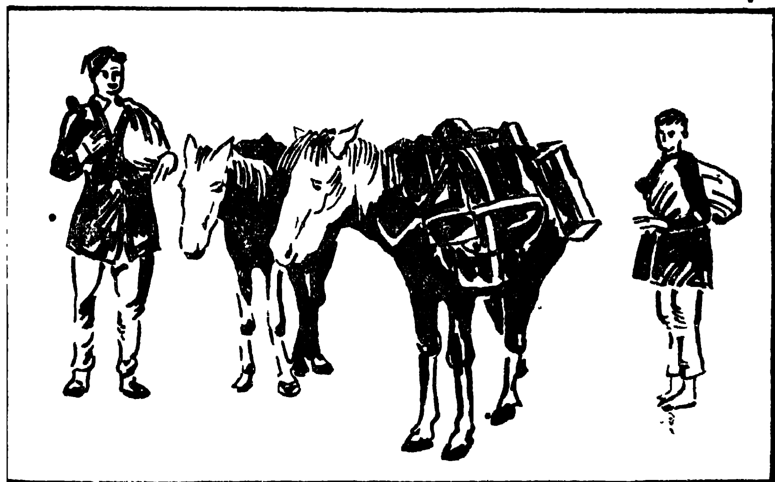
ভাবর্সে যাহারা নামিয়া আসে তাহাদের মধ্যে চারশ্রেণীর লোক দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর লোক অর্ধ-যাযাবর শ্রেণী বলা যায়। ইহারা দিনমজর খাটে, পশুপালন করে, ঘি-মাখন করিয়া বিক্রয় করে, আবার কিছু কিছু চাষবাস ব্যবসাবাণিজ্যও করে। যখন যাহা করিলে সুবিধা হয়, তাহাই করে, কোন বিশেষ বৃত্তির প্রতি কোন অনুরাগ নাই। জঙ্গলের কাঠ কাটার কাজই ইহারা বেশী করিয়া থাকে এবং স্থানীয় কনট্র্যাক্টররা তাহাদের দিনমজুর নিযুক্ত করিয়া রেলপথের জন্য কাঠ সরবরাহ করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা প্রধানতঃ পশুপালক। তাহারা পশুপালন করিয়া দুধ-ঘিয়ের ব্যবসা করে। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা প্রধানতঃ চাষী। তাহারা স্থানীয় জমিদার-জোতদারের জমি বন্দোবস্ত করিয়া ভাগচাষ করে, যাহারা দরিদ্র তাহারা ক্ষেতমজরও খাটে। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা প্রধানতঃ ব্যবসায়ী। তাহারা ভাবর্সের হাটবাজারে গুড় লবণ তামাক কাপড় ইত্যাদির দোকান খুলিয়া বাণিজ্য করে, দূরের পাহাড়ী গ্রামের হাটে নানারকম জিনিস লইয়া গিয়া সেখানকার জিনিস ভাবর্সের হাটে ও বাজারে বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে। সাধারণতঃ ইহারা বেশ সঙ্গতিপন্ন।

আরোহী ও অবরোহীদের মধ্যে পার্থক্য

আলমোড়ার মধ্যাঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিমভাগের ভোট পশুপালক যাহারা উপরদিকে গোঠে আরোহণ করে, এবং অন্যান্য পাহাড়ীরা যাহারা নীচের দিকে ভাবর্সে অবরোহণ করে, তাহাদের অভিযানের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও, পার্থক্য আছে যথেষ্ট। উর্ধ্বযাত্রী বা আরোহীরা শীতগ্রীষ্ম দুই ঋতুতেই যাত্রা করে, গ্রীষ্মকালেই বেশী



পার্বত্য অঞ্চলের মালবাহী ছাগল



পার্বত্য অঞ্চলের মালবাহী অশ্বতর

অবরোহীরা বা নিম্নযাত্রীরা শীতকালে যাত্রা করে, গ্রীষ্মকালে নহে। ভোট পশুপালকদের চলাচলের পথ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী দুর্গম, কোন চাকাগাড়ীতে তাহারা চলাচল করিতে পারে না, ছাগল ভেড়া ঘোড়া জিবু (গরু) ও মহিষের পিঠে করিয়া মালপত্র বহন করিয়া লইয়া যায়। নীচের ভাবস যাত্রীরা গরুর গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই করিয়া লইয়া যায়, আজকাল মোটরবাসও তাহারা ব্যবহার করে। ভোট মেয়েদের পিঠের ঝুড়িতে বোঝা বাঁধা থাকে, তাহাতে উঁচুপথে উঠিতে সুবিধা হয়। নিম্নযাত্রীদের তাহা প্রয়োজন হয় না বলিয়া তাহারা ঝুড়িতে বোঝা মাথায় চাপাইয়া লইয়া পথ চলে। ভোটদের সঙ্গে বেশী মহিষ থাকে না, ভাবস যাত্রীদের সঙ্গে মহিষ বেশী থাকে। ভোটরা তাঁবু ব্যবহার করে বেশী, ভাবস যাত্রীরা তাহা করে না বলিলেই হয়। চারণভূমি ও পানীয় জলের পাহাড়ী ঝরনা ও নদীর কাছে ভোটরা তাঁবু ফেলিয়া থাকে, ভাবস যাত্রীরা থাকে দোকান হাটবাজারের কাছে কোন স্থানে। ভোটরা দৈনিক পাঁচ-ছয় মাইলের বেশী পথ চলিতে পারেনা, ভাবস যাত্রীরা দশ-পনের মাইল পর্যন্ত চলিতে পারে। ভোটদের মেয়েপুরুষে সমান মেহনত করে, ভাবস-যাত্রীদের মেয়েদের তাহা করিতে হয় না।

দুই দলের মধ্যে এই পার্থক্য থাকিলেও উভয়েরই স্থানান্তরে যাত্রা সাময়িক। উভয়েই ঋতুর পরিবর্তনের ফলে জীবনযাত্রার, বসবাসের ও কাজকর্মের সুবিধার জন্য গ্রাম ছাড়িয়া স্থানান্তরে যায়।

মেলা, দেবদেবী ও উৎসব-পার্বণ

গ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃ শহর-নগরের মতো স্থায়ী দৈনন্দিন হাট-বাজার থাকে না। সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন হাটবাজার বসে।

আর গ্রামের মেলাগুলিতেও পাশাপাশি অঞ্চলের জিনিসপত্রের আমদানি ও কেনাবেচা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ইহা আরও বেশী হয়, কারণ সেখানকার লোকজনের পক্ষে তুর্গম পথে দৈনিক হাট-বাজারে যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। ক্রেতা ও বিক্রেতা কাহারও পক্ষে নয়। আলমোড়া জেলায় তাই মেলার খুব প্রাধান্য দেখা যায়। মেলাগুলিতেই জিনিসপত্রের আদান-প্রদান ও বেচাকেনা হয় বেশী। কোন পূজা বা উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে এবং সেই মেলায় কাছাকাছি গ্রামের লোক তাহাদের নানারকমের জিনিসপত্র বেচিতে আসে। মেলা হইতে জিনিস কিনিবার জন্যও অনেক লোক আসে। এমনিতেই উৎসবের জন্য মেলায় যে জনসমাগম হয়, তাহাতে আদান-প্রদান, আনন্দ-উৎসব বেশ জমিয়া উঠে। সাধারণ হাটবাজারে এই আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। কেবল পার্বত্য অঞ্চলে নহে, আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র যে মেলা (Fair) হয়, গ্রাম্য জীবনে তাহার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

আলমোড়ার পাহাড়ীদের জীবনে মেলার গুরুত্ব খুব বেশী, কারণ মেলা তাহাদের হাটবাজার, মেলা তাহাদের মেলামেশার স্থান, মেলা তাহাদের জাতীয় ঐক্যবোধের কেন্দ্র, ধর্মোৎসবের তীর্থ, সবকিছু। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে মেলা বসে। জেলার প্রত্যেক মহকুমায় ও থানায় প্রায় মাসে মাসে একটি করিয়া মেলা হয়। শীতকালেই মেলার সংখ্যা বেশী এবং যে অঞ্চলে যত বেশী মেলা হয়, বুঝা যায় সেই অঞ্চল তত বেশী সমৃদ্ধ। সমগ্র জেলায় প্রায় ১০০ মেলা হয় এবং প্রত্যেক মেলায় গড়ে ১০০০ হইতে ২০,০০০ হাজার লোকের সমাগম হয়। টাকাপয়সা দিয়া জিনিস কেনাবেচা হয়, আবার এক জিনিসের বদলে অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের আদান-প্রদানও চলে।

মেলার সংখ্যা দেখিয়াই বোঝা যায়, আলমোড়া জেলার পাহাড়ীদের দেবদেবীর ও উৎসব-পার্বণের সংখ্যাও প্রচুর। ভোটদের দেবতার মধ্যে পর্বতশৃঙ্গবাসী **মহাদেব** প্রধান। কৈলাস, মানস-সরোবর ও কেদার-বদরিতে দেবতার পীঠস্থান আছে। হিমালয়-কন্যা মহাদেবের পত্নী **নন্দা দেবী**ও পর্বতশিখরে বিরাজ করেন। তুষারাবৃত পথের ধারে ধারে **কাঠবুড়িয়া** দেবীর স্থান আছে। পাথরখণ্ড বা কাঠের টুক্‌রার স্তূপ, তাহার উপর সাদা-লাল কাপড়ের টুকরা ফেলা। পাহাড়ে উঠিবার সময় একটির পর একটি চূড়া অতিক্রম করিয়া, কাঠবুড়িয়ার কাছে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া, পাহাড়ীরা সামনের উন্নত চূড়ার দিকে চাহিয়া মন্ত্রপাঠ করে। প্রার্থনা করে যেন নিরাপদে তাহারা ঐ চূড়াতেও উঠিতে পারে। কাঠবুড়িয়া দেবী প্রীত না হইলে পার্বত্য পথে সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। ঝড়জল বিদ্যুতের দেবতারা আছেন। বৃষ্টির দেবতা **গাব্‌লা** সকলেরই খুব প্রিয় দেবতা, কারণ তিনি তুষার সরাইয়া জল দান করেন, শস্যফল দান করেন, খাদ্যের অভাব দূর করেন। তাঁহার পূজায় ছাগল বলি দেওয়া হয়। রাখালদের দেবতা **রুনিয়া** আছেন। তিনি রাখালদের মতো গ্রামে গ্রামান্তরে তাঁহার বাহনের পিঠে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ান, হারানো গরু-ভেড়ার সন্ধানে। পালের গরুমহিষ কিছু হারাইলে রুনিয়ার শরণাপন্ন না হইয়া পাহাড়ী রাখালদের উপায় নাই। গ্রামে গ্রামে **গ্রামদেবতা** আছেন, গ্রামের রক্ষক ও পালক তিনি। তাঁহার একটি স্থান আছে, মন্দির বিশেষ নাই। বড় লম্বা খুঁটিতে চমরী গরুর লেজ ও সাদা-লাল কাপড় ঝুলিতে থাকে। এই খুঁটিই গ্রামদেবতার স্থান। এরকম আরও অনেক দেবদেবী আছেন, তাঁহাদের বিশেষ পূজা উৎসব আছে। এই

সব উৎসব উপলক্ষে মেলা হয় এবং পাহাড়ীরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া সেই মেলায় আনন্দ করে। নৃত্যগীতের ও বেচাকেনার কলরবে পাহাড়ী দেবস্থানের মেলাগুলি মুখর হইয়া উঠে ঃ

তথ্য ও সিদ্ধান্ত

আন্দামানীদের সহিত আলমোড়ার পবতবাসীদেব সমাজ ও জীবনযাত্রার পার্থক্য এইবার সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে ;

ক। দুই অঞ্চলেই প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের প্রভাব স্থানীয় অধিবাসীদের সমাজ-জীবনে প্রবল। আন্দামানীরা সম্পূর্ণ প্রকৃতি-নির্ভর ও খাদ্য-সংগ্রাহক, আলমোড়াবাসীবা খাদ্য-উৎপাদক। সেইজন্য তাহাদের স্থায়ী বসতি ও গ্রাম আছে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধ আন্দামানীদের তুলনায় অনেক বেশী তীব্র।

খ। তবু প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের কঠোরতার জন্য তাহাদের সমবায় জীবনের ভিত্তি একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই। গোষ্ঠযাত্রা ও নিম্নভূমিতে যাত্রাকালে সেই পরস্পর-নির্ভর সম্মিলিত জীবনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

গ। চাষবাস ও ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য পর্বতবাসীদেব মধ্যে ধনীদরিদ্রের শ্রেণীভেদও আছে, আন্দামানীদের মধ্যে তাহা নাই। কিন্তু লক্ষণীয় হইল, যে-প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সকলকেই নির্ভর করিতে হয়—যেমন আন্দামানীদের শিকারক্ষেত্র, আলমোড়া-বাসীদের গোঠ—তাহাব প্রতি সকলের সমানাধিকার আছে। যাহাদের যত বেশী প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের সাম্যবোধ তত বেশী সজাগ (যেমন আন্দামানীদের)। আলমোড়া পর্বতবাসীদের, বিশেষ করিয়া ভোট পশুপালকদের, খানিকটা

নির্ভর করিতে হয় বলিয়া, তাহাদের মধ্যে যৌথ অধিকারবোধ এখনও আছে। তাহাদের জীবনযাত্রায় সমাজে ও সংস্কৃতিতেও তাহার প্রভাব আছে।

কৃষিনির্ভর ও বাণিজ্যনির্ভর সমাজে ক্রমেই এই বোধ লোপ পাইয়াছে। কৃষিপ্রধান গ্রাম্যসমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখিয়া, কেবল অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই সহযোগিতার স্বরূপ আলাদা। বাণিজ্যনির্ভর সমাজে শ্রেণীবিভেদ্ বাড়িয়াছে এবং নূতন যে সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হইয়াছে তাহা শ্রেণীসহযোগিতা। সমব্যবসায়ী ও সমান সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা দুইয়েরই বোধ আছে, সমাজের সমস্ত লোকেব মধ্যে সমানভাবে তাহা নাই। গ্রাম নগর শহর বাণিজ্যকেন্দ্র প্রভৃতির মধ্যে সমাজের এই রূপ পরবর্তীকালে বেশী প্রতিফলিত হইয়াছে।



চতুর্থ অধ্যায়

কৃষিপ্রধান গ্রাম্যসমাজ

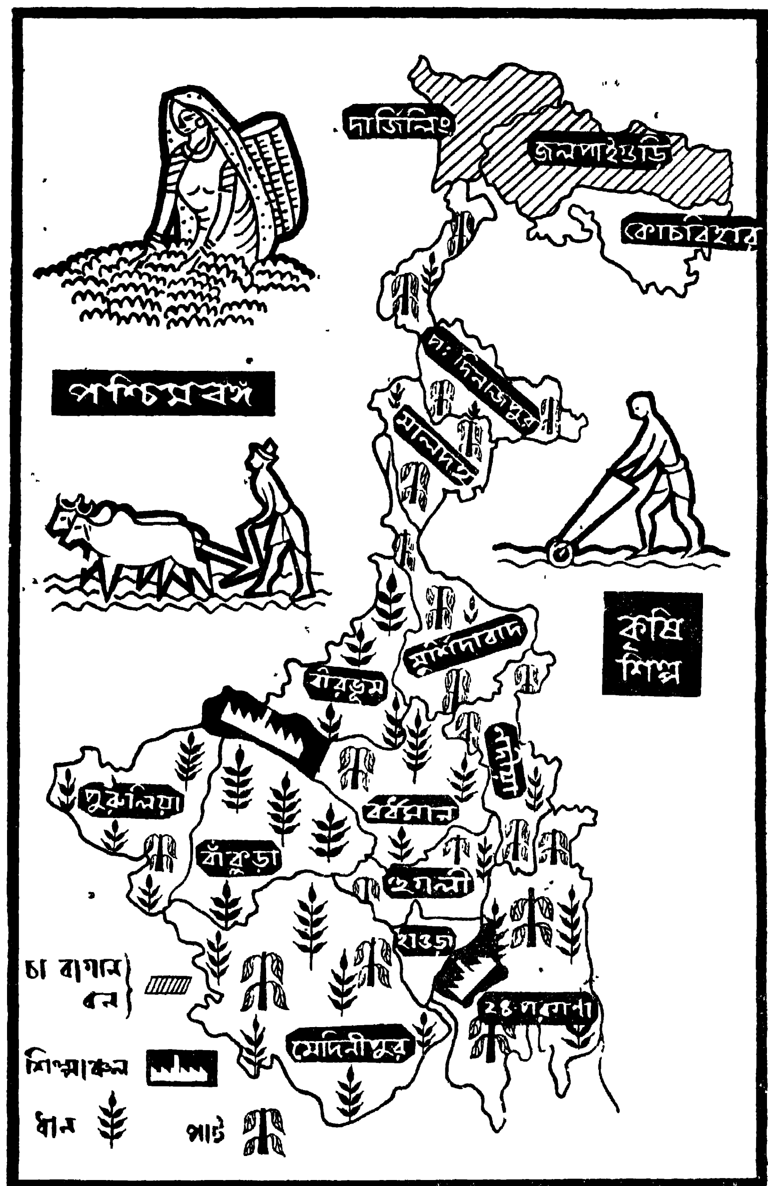
যে-সমাজ প্রধানতঃ কৃষি-নির্ভর, তাহার রূপ আলাদা। শিকারজীবী আন্দামানী ও পশুপালক ভোট বা আলমোড়াবাসীদের সমাজের সহিত তাহার পার্থক্য আছে। কৃষি-নির্ভর সমাজের মধ্যেও পার্থক্য আছে। ধান পাট ইত্যাদি উৎপাদন করা এবং চা কফি বা রবার ইত্যাদি উৎপাদন করা এক নহে। সবই মূলতঃ কৃষিকাজ হইলেও, কাজের তফাৎ আছে। ধান ও পাট যেভাবে উৎপাদন ও বিক্রয় করা হয়, চা বা কফি ঠিক সেইভাবে করা হয় না। চায়ের বাগান রচনা করিতে হয়, সেই বাগান যত্ন করিয়া লালন করিতে হয়, এবং চা তৈরী করিয়া ব্যবসা করিবার জন্য ছোটখাট একটি ফ্যাক্টরীও বাগানের কাছে স্থাপন করিতে হয়। ধান ও পাট অনেক স্থানে চাষ করিলে হইতে পারে, চা হয় না। যেখানে চা-বাগান আছে বা করা যায়, সেখানে সেই অঞ্চলের স্থানীয় লোক ছাড়াও বাহির হইতে লোকে ব্যবসা ও কাজ করিতে আসে। সেইজন্য চা-বাগান অঞ্চলে গ্রাম-ও-শিল্পনগরের একটি **মিশ্র-সমাজ** গড়িয়া উঠে, অন্যান্য কৃষিপ্রধান অঞ্চলে গড়িয়া উঠে **গ্রাম্য-সমাজ**। ধান পাট চা ইত্যাদির উৎপাদনের কথা বলিয়া আমরা এই সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতির উপর কৃষিজাত শস্যের ফসল ও বৈচিত্র্য নির্ভর করে। মাটির গুণ ও জলবায়ুর তারতম্যের জন্য কোথাও ভাল ধান হয়, কোথাও হয় পাট, কোথাও হয় আম বা কমলালেবুর মতো ফল, কোথাও চা কফি ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল বনজ ও চা-বাগানের জন্য বিখ্যাত, দক্ষিণে ধান ও পাট ভাল উৎপন্ন হয়। জলবায়ু ও ফসল উৎপাদনের পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের জীবনযাত্রারও পার্থক্য ঘটে। ধানচাষী বা পাটচাষীর মতো চা-বাগানের কুলি জীবন কাটায় না। সমস্যাও সকলের এক নহে। স্থানীয় সমাজের গড়ন ও রূপও পৃথক। কেন পৃথক, তাহা আমরা পরবর্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিব।

ধান ও পাট

ধান ও পাট, এই দুই শস্যই হইল বাংলাদেশের প্রধান কৃষিজ সম্পদ। বর্ষাকালীন শস্যকে **খড়িফ শস্য** এবং শীতকালীন শস্যকে **রবিশস্য** বলে। খড়িফ শস্যের মধ্যে ধান, পাট ও আখ প্রধান, এবং রবিশস্যের মধ্যে প্রধান গম, দাল, চা, তৈলবীজ, আলু ও শাকসবজী। বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে খড়িফ শস্যের বীজ বপনের সময়। বর্ষার উপর বীজ বপন নির্ভর করে। শীতের পূর্বে, আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে, ফসল কাটা শেষ হয়। খড়িফ ফসল ঘরে তুলিয়া রবিশস্যের রোপণ আরম্ভ হয়। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে এই শস্য পাকে বলিয়া ঐ সময় উহা কাটা হয়।

ধানচাষ। উৎপাদনের সময়ভেদে ধান তিন প্রকার। শীতের অবসানে নদীর চরে, বিলের ধারে ও জলাভূমিতে **বোরো** ধান



দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
প: দিনাজপুর
মালদহ
পশ্চিমবঙ্গ
কৃষি
শিল্প
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
নদীয়া
পুরুলিয়া
বর্ধমান
বাঁকুড়া
হুগলী
হাওড়া
২৪ পরগনা
মেদিনীপুর
চা বাগান
বন
শিল্পাঞ্চল
ধান
পাট

রোপণ করা হয়। কোন কোন অঞ্চলে ইহার নাম ষেটে ধান, অর্থাৎ রোপণের পরে ষাট দিনে ধান পাকে। বৈশাখে শিলাবৃষ্টি হইলে বোরো ধানের ভীষণ ক্ষতি হয়। বসন্তের শেষের দিকে **আউশ** বা **আশু** ধানের বীজ বপন করা হয়। এই ধানের চারাগাছের বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য প্রচুর জলের দরকার হয়। সাধারণতঃ বর্ষার দ্বিতীয় মাসে ধান কাটা হয়। নাম 'আশু' হইলেও উহা বোরো অপেক্ষা শীঘ্র ফলে না। বর্ষার বৃষ্টিধারায় সিক্ত ভূমিতে শরতের প্রারম্ভে **আমন** ধান রোপণ করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর আমন ধান শীতকালের বিভিন্ন সময়ে কাটিয়া ঘরে তোলা হয়। বর্ষার বৃষ্টিতে যে-জমি ভাসিয়া যায় সেখানে আমন ধান বসন্তকালে বপন করিতে হয়। এরকম জমিতে আউশ ও আমন একত্রেও বপন করা হইয়া থাকে। বর্ষাকালে আউশ ধান কাটা হয়, শীতকালে কাটা হয় আমন।

আমন ধানের ক্ষেত পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক। বর্ধমানের আবাদী জমির পাঁচভাগের চারভাগ জমিতে এবং বীরভূমের অর্ধাংশের বেশী জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। বাঁকুড়া জেলারও প্রধান কৃষিজাত শস্য আমন ধান। মেদিনীপুরে ধানের ৯৩ শতাংশ আমন। হাওড়া ও হুগলিতেও আমনের চাষ বেশী। চব্বিশ পরগণায় চাষের জমির শতকরা ৮০ ভাগে আমন ধান হয়। কেবল নদিয়া জেলায় চাষের জমির চার ভাগের তিনভাগে আউশ ধান হয়। মুর্শিদাবাদেও আমনের চাষ বেশী। মালদহে ও পশ্চিম দিনাজপুরে আউশ, আমন ও বোরো তিনরকমেরই ধান হয়। বাঁকুড়া বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় অল্প পরিমাণে বোরো ও আউশ ধান হয়। কোচবিহার জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের ধানও আমন। ধানের মধ্যে উৎকৃষ্ট হইল আমন ধান। বর্ষার সময় ক্ষেতে আমনের বীজ বপন করা

হয়। সেই বীজ হইতে চারাগাছ জন্মায়। চারাগাছ পাঁচ-ছয় ইঞ্চি বা ততোধিক বড় হইলে, লাঙ্গল দিয়া চষা ক্ষেতে চারাগাছগুলিকে তুলিয়া 'রোপণ' করা হয়। আউশ ধান সাধারণতঃ বীজ ছড়াইয়া বপন করা হয়, রোপণ করা হয় না। বর্ষার পরে শীতের দিনে জলাভূমি ক্রমশঃ শুকাইয়া আসিলে তাহাতে বোরো ধান বপন করা হয়। বোরো ধানের চাল সুখাদ্য নহে, আউশ ধানের চালও আমনের মতো সুখাদ্য নহে।

পশ্চিমবঙ্গের মোট ১,৩১,১৫,০০০ একর (১ একর=৩ বিঘা) আবাদী জমির মধ্যে প্রায় ১,০৪,২৩,৪০০ একর জমিতে (অর্থাৎ প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে) ধান চাষ হয়। তাহার মধ্যে বোরো ধান হয় মাত্র ৪৩,২০০ একর জমিতে (০·৪ ভাগ জমিতে), আউশ ধান হয় ৯,৫৪,০০০ একর জমিতে (৭·১ ভাগ জমিতে) এবং আমন ধানের চাষ হয় ৯৪,২৬,২০০ একর জমিতে (৭১·৯ ভাগ জমিতে)। ইহা ১৯৫২-৫৩ সালের হিসাব। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর হইতে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা, মোট আয়তন ও আবাদী জমি কিছু বাড়িয়াছে। সম্প্রতি সার ও সেচের উন্নতির দিকে নজর দিয়া এবং নূতন প্রথায় (যেমন জাপানী প্রথা) চাষ করিয়া ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে নানাভাবে।

পাটচাষ। অর্থকরী শস্যের মধ্যে বাংলাদেশে পাট প্রধান। পাট উৎপাদনে অবিভক্ত বাংলার প্রায় একাধিকার ছিল। পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট পাট জন্মায়। কিন্তু বিদেশে পাট রপ্তানি ও চটকলের জন্য পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাহিদা খুব বেশী। বঙ্গবিভাগের পরে তাই কাঁচামালের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পে সঙ্কট দেখা দেয়। পাট উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্যে তাই পাটের চাষ

বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়। এখন পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতে পাটচাষ করা হইয়া থাকে এবং কোন কোন জেলায়, পাটচাষ বেশী লাভজনক বলিয়া, পাট আজকাল ধানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে ধানের চাষ কমাইয়া পাটের চাষ বৃদ্ধি করা হইতেছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের হিসাবে দেখা যায়, সারা ভারতের মোট পাট-চাষের জমির প্রায় ৪৫ শতাংশ জমিতে পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ হইত এবং ভারতের মোট উৎপন্ন পাটের ৪৮ শতাংশ (প্রায় অর্ধেক) পাট উৎপন্ন হইত পশ্চিমবঙ্গে। (পশ্চিমবঙ্গের মোট পাটের ৮১ শতাংশ উৎপন্ন হয় মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা, নদিয়া, মালদহ, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও হুগলি জেলায়।) অন্যান্য পাট-উৎপাদক প্রদেশ বা রাজ্যের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, এখনও পশ্চিমবঙ্গের প্রাধান্য সর্বাধিক। নীচের হিসাব (১৯৫৩-৫৪) হইতে ইহা বুঝা যাইবে ঃ

	মোট একর জমির শতাংশ	মোট উৎপাদনের শতাংশ
পশ্চিমবঙ্গ	৪৪·৭	৪৭·৯
বিহার	২৫·৩	১৯·২
আসাম	২১·৫	২৫·৮
ত্রিপুরা	৪·৯	৪·১
উত্তর প্রদেশ	২·৩	১·৮

(বর্ধমান জেলায় আগে পাটের চাষ সীমাবদ্ধ ছিল কালনা ও জামালপুর থানায়, এখন উহা প্রায় সকল অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মালদহে পাট প্রধান শস্য হইয়া উঠিয়াছে। মুর্শিদাবাদে ধান ও পাটের প্রতিযোগিতা চলিতেছে। দার্জিলিঙের তরাই অঞ্চলে প্রচুর পাট হয়। কোচবিহারে ধানের চাষ কমিয়া পাটের চাষ

বাড়িতেছে। হুগলি, নদিয়া, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা সর্বত্র পাটচাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটচাষ সর্বাপেক্ষা অল্প বীরভূম ও বাঁকুড়াতে।

আমাদের দেশে যে পাটচাষ করা হয় তাহা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, **তিতা পাট** ও **মিঠা পাট**। তিতা পাটের বৈজ্ঞানিক নাম 'ক্যাপস্থলারিস' (Capsularis) এবং মিঠা পাটের নাম 'ওলি-টোরিয়াস' (Olitorius)। পশ্চিমবঙ্গে তিতা ও মিঠা পাটের আরও দেশী নাম আছে ঃ

তিতা পাট ঃ সাদা পাট ; দেশী পাট ; স্থতি পাট ইত্যাদি

মিঠা পাট ঃ বগি পাট ; কুচানি পাট ; শ্যামলা পাট ; তোষা পাট ইত্যাদি

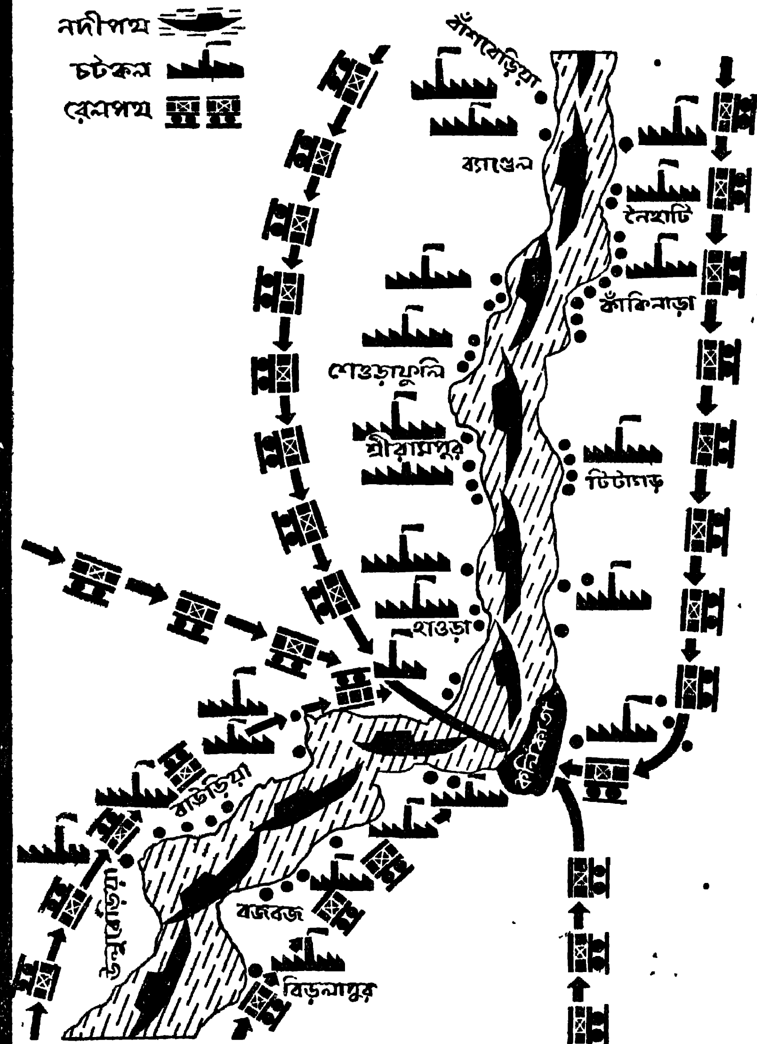
তিতা পাটেব পাতার স্বাদ তিতো বলিয়া তিতা পাট বলা হয়, মিঠা পাটের পাতাব স্বাদ নাই। তিতা পাট খুব আঁশাল, কিন্তু মিঠা পাটের আঁশের মতো সূক্ষ্ম ও নরম নহে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম-বঙ্গে মিঠা পাটের চাষ সর্বাধিক এবং প্রধানতঃ চব্বিশ পরগণা, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় এই শ্রেণীর পাটের চাষ হয় বেশী। জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, মালদহ ও দার্জিলিঙে তিতা পাট বেশী উৎপন্ন হয়।

পাটের বীজ ছড়াইয়া বুনিতে হয় এবং পাটগাছ বড় হইলে তাহার গোড়ার ঘাস ও আগাছা নিড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। পাট কাটিয়া, ডাঁটা হইতে পাতা ছাড়াইয়া জমিতে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং সেই পাতা পচিয়া সার হয়। পাটের ডাঁটাগুলি বাণ্ডিল করিয়া বাঁধিয়া জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। ডাঁটা ভিজিয়া নরম হইলে তাহার ভিতর হইতে আঁশ ছাড়াইয়া নিয়া রৌদ্রে শুকানো হয়। তারপর শুকনা পাট গাঁইট বাঁধিয়া বাজারে ও চটকলে চালান দেওয়া হয়।

সম্প্রতি পাটচাষের উন্নতির জন্য **সারিবদ্ধ চাষের** প্রবর্তন করা হইতেছে। একপ্রকার 'ড্রিল' যন্ত্রের সাহায্যে লাইনে বীজ বুনিয়া এবং 'হুইল হো' যন্ত্রের সাহায্যে ঘাস নিড়াইয়া ভারতের কেন্দ্রীয় পাটকৃষি গবেষণাগার দেখিয়াছেন, অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে অনেক উত্তম পাট জন্মাইতে পারে। দেশের কৃষকরা অবশ্য এখনও এই সারিবদ্ধ পাটচাষে অভ্যস্ত হয় নাই।

পাটজাত শিল্প। পাট হইতে নানারকমের দড়ি ও চট তৈরী হয়। মোটা মোটা কাছি দড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম সূতা পর্যন্ত পাটের আঁশ পাকাইয়া তৈরী করা যায়। সেই সূতা দিয়া কাপড়ও বোনা হইয়া থাকে। পাট হইতে কার্পেট, সতরঞ্চ ইত্যাদিও তৈরী করা হয়। নানাবিধ মালবহনের জন্য চটের থলি অদ্বিতীয়। পুরু টাট এবং ডোখ্‌রা বা মেকৃলি নামে একরকমের চটের কাপড় দরিদ্র লোকেরা ব্যবহার করে। পাট হইতে কাগজও হয়। পাট হইতে এত প্রয়োজনীয় দ্রব্য হয় বলিয়া পাটশিল্প বাংলাদেশের ও ভারতের অন্যতম শিল্প।

ভারতবর্ষের সর্বাধিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ পাটকলের কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে, কলিকাতার উপকণ্ঠে, হুগলি নদীর তীরে (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। ভারতের মোট ১১২টি পাটকলের মধ্যে ১০১টি পশ্চিমবঙ্গে (১৯৫১ সালের হিসাব)। ভারতের মোট প্রায় ৫ কোটি মণ উৎপন্ন পাটের মধ্যে ৩ কোটি মণ পাট নানাবিধ শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত করিবার উপযোগী চটকল হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত, বাঁশবেড়িয়া হইতে বিড়লাপুর পর্যন্ত। প্রতি বৎসর এখান হইতে প্রায় এক হইতে দেড় কোটি মণ কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানি হইত। এত বিরাট পরিমাণ মাল নাড়াচাড়া করিবার ক্ষমতা কলিকাতা বন্দরেরই ছিল। বাংলা,



হুগলী নদীর তীরবর্তী পাটকল

আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার পাট নদীপথে ও স্থলপথে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিত। তাই কলিকাতার কাছে নদীতীরে ভারতের শ্রেষ্ঠ পাটশিল্পের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই পাটশিল্পকেন্দ্রে, পাটকলে কাজ করিবার জন্য, ভারতের নানা প্রদেশ হইতে লোক আসিয়াছে। পাটকলের শ্রমিকদের মধ্যে অবাঙালীর সংখ্যা অনেক। হুগলি নদীর উভয় তীরে, বাঁশবেড়িয়া হালিশহর ব্যাণ্ডেল, নৈহাটি কাঁকিনাড়া হইতে বাউড়িয়া উলুবেড়িয়া বজ্‌বজ্‌, বিড়লাপুর পর্যন্ত যেসব **শিল্পনগর** গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের সামাজিক রূপও অন্যপ্রকার। বাংলার অন্যান্য সাধারণ শহর ও নগরের সহিত তাহাদের মিল নাই। বহু প্রদেশের বিচিত্র জনগোষ্ঠীর এমন বিসদৃশ সমাবেশ ও সংমিশ্রণ, বাংলার খুব বেশী অঞ্চলে দেখা যায় না।

উত্তরের চা-বাগান

চা ও বনজ সম্পদে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল সমৃদ্ধ। ভঙ্গুর মাটি, প্রচুর বৃষ্টিপাত, কিন্তু তাহা জমিতে না দিয়া দ্রুত নিষ্কাশন এবং অপেক্ষাকৃত অল্প রৌদ্রতাপ চা-গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। পাহাড়ের ঢালু জমিতে এইজন্য চা-গাছ ভাল হয়। এই অনুকূল অবস্থার জন্য বাংলার উত্তর প্রান্তে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে ও দার্জিলিঙে চা-বাগান রচিত হইয়াছে।

চা-গাছ বীজ হইতে জন্মায়, কিন্তু ধান বা পাট গাছের মতো নহে। চায়ের চারাগাছ ছয় মাস হইতে তিন বছর পর্যন্ত নার্সারীতে সযত্নে পালন করা হয়। তাহার পর সেই চারাগাছ তুলিয়া, একটি একটি করিয়া, অন্তত: চার ফুট অন্তর, ক্ষেতে রোপণ করিতে হয়। চারাগাছ বাড়িয়া পরিণত হইতে পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় সাত বৎসর

সময় লাগে। ১০০ বৎসরের প্রবীণ চা-গাছ দার্জিলিঙের বহু পুরাতন চা-বাগানে আছে। অনেক বাগানে পরে নূতন গাছ রোপণ করা হইয়াছে এবং এখনও করা হয়। চা-গাছগুলি ঝোপের মতো বাড়িয়া উঠে বলিয়া মধ্যে মধ্যে ছাঁটাই করিতে হয়। পার্বত্য অঞ্চলে তিন বৎসর অন্তর একবার এবং তরাই অঞ্চলে বৎসরে একবার সাধারণতঃ ছাঁটাই করা হয়।

চা-গাছের ডগার **দুইটি পাতা ও একটী কুঁড়ি** তোলা হয় চা তৈরীর জন্য। প্রায় ১৮ ঘণ্টা পাতাগুলিকে শুকাইয়া, খানিকটা চুপসাইয়া লইয়া, বড় বড় রোলারের মধ্যে দেওয়া হয়। এক-একটি রোলারে প্রায় ৩০০ পাউণ্ড পাতা ধরে এবং তাহা হইতে আনুমানিক ১০০ পাউণ্ড চা হয়। চা-পাতার কোষগুলিকে (Cells) নষ্ট করিবার জন্য রোলিঙের বা ডলাইয়ের প্রয়োজন হয়। কোষগুলি নষ্ট হইবার ফলে বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া, রোলিঙের পরে চা-পাতার রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে। চায়ের সাদা কষ তাহাতে লালচে হইয়া যায় এবং পাতার রঙ হয় তামাটে। প্রায় দেড়ঘণ্টা পাতাগুলি ডলাই করিয়া 'ফার্মেণ্ট' করা হয়। তারপর সেগুলি গরম বাতাস দিয়া শুকাইয়া ফেলা হয়।

শুকনা পাতা প্রথমে বেশ বড় থাকে। সেইজন্য কাটাই-বাছাই করিয়া সেগুলি দস্তার পাত্রে রাখা হয়। একেবারে গুড়া হইতে প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা পাতা (পিকো) আকারের নয় রকমের ভাগ করা হয়। বাছাই হইয়া গেলে প্যাকিং-বাক্সে ভর্তি করিয়া কলিকাতার নিলাম-বাজারে চালান দেওয়া হয়। কলিকাতা হইতে চা দেশ-বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

বনজ কাঠ। ভারতের বনজ সম্পদ মহামূল্যবান। পশ্চিম-

বঙ্গের বনজ সম্পদ এখন প্রধানতঃ উত্তর সামান্তের দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলার অরণ্যে এবং দক্ষিণ সীমান্তের সুন্দরবনের অরণ্যে সীমাবদ্ধ। সুন্দরবনের অরণ্যভাগ এখন সবই প্রায় পাকিস্থানে পড়িয়াছে। পশ্চিম প্রান্তে ঝাড়গ্রাম, আসানসোল ও বাঁকুড়া অঞ্চলেও সালবন আছে, কিন্তু তাহাকে গভীর অরণ্য বলা চলে না, ক্রমেই তাহা কাটিয়া ফেলিয়া বসতি ও চাষ-আবাদ করা হইতেছে। অরণ্যের প্রাকৃতিক উপকারিতার মধ্যে প্রধান হইল বৃষ্টিধারার গতি নিয়ন্ত্রণ। ছোটনাগপুর অঞ্চলের অরণ্য ধ্বংস হইবার ফলেই দামোদরে ভীষণ বন্যা হইত। কেবল কাঠ ও অন্যান্য সম্পদের জন্য নহে, এই কারণেও অরণ্য সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হওয়া উচিত। ভারতের বড় বড় অরণ্য এখন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি।

দার্জিলিঙ জেলায় ১২,০০০ ফুটের উপরে অরণ্য নাই, উহা ঘাস চরাইবার স্থান। তাহার নীচে, ৯,০০০ হইতে ১১,০০০ ফুটের মধ্যে, সরল বর্গীয় গাছ ও নানারঙের রডোডেনড্রনের জঙ্গল। আরও নীচে লাল ও সফেদ চাঁপ, চেস্টনাট ইত্যাদি গাছ আছে। ৩,০০০ ফুটের নীচে আছে শিরীষ, শিমুল ইত্যাদি। সমতলভূমির কাছে ক্রমে এই অরণ্য সাল-অরণ্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সাল গাছ ৩,০০০-৩,৫০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত জন্মায়। কোথাও কোথাও নদীর চড়ায় খয়েব, শিশু, শিমুল ও শিরীষের গাছ আছে।

বনজ সম্পদের মধ্যে **কাঠ** সর্বপ্রধান। কাঠ যে মানুষের কত রকম কাজে ও ব্যবহারে লাগে তাহার বিবরণ দিতে হইলে দীর্ঘ তালিকা করিতে হয়। সংক্ষেপে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

ক। বাড়ির দরজা জানালা কড়ি-বরগা দেওয়াল-মেঝে, পুলের পাটাই, রেলিং ইত্যাদি।

খ। ঘরের ও বেড়ার খুঁটি, নরম ও জলাভূমিতে বাড়ী করিবার জন্য পাইল, রেলওয়ে স্লিপার, টেলিগ্রাফের খুঁটি, খনির খুঁটি ইত্যাদি।

গ। নদীর বাঁধের জন্য কাঠ।

ঘ। তেল ও আখের ঘানি, ঢেঁকি, চরকা, তাঁত।

ঙ। জাহাজ নৌকা, মাস্তুল দাঁড় হাল ডিঙ্গি-ডোঙ্গা ইত্যাদি।

চ। ছুতার মিস্ত্রীব আসবাব।

ছ। গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রেলগাড়ীর বহু অংশ।

জ। বাসন-কোসন (যেমন বারকোশ, গামলা), যন্ত্রেব হাতল, বাক্স, প্যাকিং বাক্স, ছড়ি, কাঠের মূর্তি ইত্যাদি।

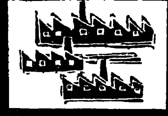
আমাদের সামাজিক প্রয়োজনের কতখানি অংশ যে কাঠ দিয়া মিটাইতে হয়, তাহা এই তালিকা হইতেই অনুমান করা যায়। মনে হয় যেন কাঠ ছাড়া একপাও চলিবার উপায় নাই।

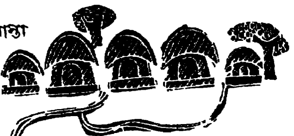
পরিবহন ব্যবস্থা

ধান পাট চা কাঠ ইত্যাদির উৎপাদনের কথা বলা হইল, কিন্তু কেবল উৎপাদনের কথা বলিলেই সব কথা বলা হয় না। চাষীর ক্ষেত-খামার হইতে, চা-বাগান হইতে ও অরণ্য হইতে কিভাবে এই সব জিনিস নানাস্থানে, হাটবাজারে, বাণিজ্যকেন্দ্রে ও কলকারখানায় চালান দেওয়া হয়, তাহা না জানিলে অনেকটাই অজানা থাকিয়া যায়। নিজে চলিবার জন্য ও উৎপন্ন জিনিস স্থান হইতে স্থানান্তরে চালান দিবার জন্য মানুষ যে কতখানি চিন্তা করিয়া নানাবিধ বাহন উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। পায়ে হাঁটিয়া চলা ও কাঁধে বোঝা বহন করা, ঘোড়া হাতি উট ইত্যাদি পশুর পিঠে চড়া ও বোঝা বহন করা, চক্রযান নির্মাণ করিয়া গরু-ঘোড়ার গাড়ীতে চড়া ও বোঝা বহন করা, বাষ্পীয় যান রেলগাড়ীতে চলা ও মাল বহন

করা, জলপথে ভেলায় নৌকায় জাহাজে চলা ও মাল বহন করা, অবশেষে বিমানে চড়িয়া শূন্যে চলা ও মাল বহন করা, মনে হয় যেন মানুষের সভ্যতার ইতিহাস কেবল নিজের চলার ইতিহাস ও তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চলাচলের ইতিহাস। না চলিতে ও চালান দিতে পারিলে মানুষ উন্নত সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে পারিত না। আজও যেখানে, যে দেশে, যে অঞ্চলে, চলাচলের বা পরিবহনের সুব্যবস্থা নাই, দেখা যায় যে সেই সব দেশ ও অঞ্চল অনুন্নত রহিয়াছে। চলাচলের সুবিধা এবং সর্বপ্রকার পরিবহনের কেন্দ্র যেখানে সেখানেই শহর মহানগর গড়িয়া উঠে। সুদূর গ্রামে তাহা নাই বলিয়াই গ্রাম অনুন্নত গ্রাম। গ্রামের ধান বা পাট যদি গ্রামেই থাকিত, চা-বাগানের চা যদি পাহাড়ের বাগান হইতে না পাঠান সম্ভব হইত, অরণ্যের কাঠ যদি অরণ্যেই পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে সমাজ ও জীবন দুইই অচল হইয়া যাইত, সচল সমাজ গড়িয়া উঠিত না। পরিবহনের কথা তাই জানা প্রয়োজন।

ধান ও পাট চালান। ধান ও পাট প্রায় একভাবেই গ্রাম হইতে হাটে, হাট হইতে বড় কোন বাজারে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে, এবং সেখান হইতে চালকলে ও পাটকলে চালান দেওয়া হয়। বস্তাভর্তি ধান মাথায় করিয়া ও গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া এবং কাছাকাছি নদী থাকিলে নৌকা-বোঝাই করিয়া হাটে আনা হয়। সেখান হইতে গরু-মহিষের গাড়ীতে, মোটর লরীতে, অথবা রেলের মালগাড়ীতে চটকলে ও বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। পাট পরিবহনের অন্য কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু লেনদেন ও প্রস্তুতির মধ্যে কিছুটা তফাৎ আছে। পাট বস্তাবন্দী করিবার প্রয়োজন হয় না। ছোট ছোট ৫-১০ সেরের বাণ্ডিল বাঁধিয়া, মাথায় ও গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া




ক্ষেত-খামার
থেকে
কারখানায়
ধান ক্ষেত
গ্রাম ও গ্রামের হাট
কল কারখানা
শহর
মানুষের মাথা
কাঁচা রাস্তা
পাট ক্ষেত
গরুর গাড়ী
পাকা রাস্তা
মালগাড়ী
নদীপথ
রেলপথ

পাট হাটে আনা হয়। ক্রেতারা দরদস্তুর ঠিক করিলে, সাধারণত বিক্রেতারা গাড়ীতে করিয়া পাট তাহাদের গুদামে পৌঁছাইয়া দেয়। নৌকা করিয়া যাহারা পাট আনে, তাহারা হাটের ধারে নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া রাখে। ক্রেতাদের নৌকাও পাশে থাকে। পাটের দর যাচাই হইয়া গেলে বিক্রেতারা ক্রেতাদের নৌকায় পাট তুলিয়া দেয়। এই গ্রাম্য হাটই প্রাথমিক বিনিময়-কেন্দ্র। পাটকলে বা বন্দরে পৌঁছিবার পূর্বে আরও একটি মধ্যবর্তী কেন্দ্র অতিক্রম করিতে হয়। কাঁচা পাট এই মধ্যবর্তী কেন্দ্রে আনিয়া বাছাই করা ও গাঁইট-বাঁধা (baling) হয়। হাতে চাপ দিয়া ও স্টীমপ্রেসে যাহা বাঁধা হয় তাহাকে **কাঁচা গাঁইট** বলে, এবং হাইড্রলিক প্রেসে যাহা বাঁধা হয় তাহাকে বলে **পাকা গাঁইট**। কাঁচা গাঁইটের ওজন সাধারণতঃ সাড়ে তিন মণ হয়, এবং পাকা গাঁইটের ওজন হয় পাঁচ মণ। একটির উপর একটি গাঁইট সাজাইয়া গুদামজাত করাকে **থামালি** বলে। এইবার পাট বাহিরে যাইবার উপযুক্ত হইল। এখন উহা জলপথে নৌকায় বা জাহাজে, স্থলপথে রেলে ও মোটর লরীতে বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে, অথবা দেশের পাটশিল্পকেন্দ্রে পাঠানো যাইতে পারে।

চা ও কাঠ বহন। দার্জিলিঙ, কার্সিয়াঙের পার্বত্য অঞ্চলে ভাল মোটর চলাচলের পথ আছে। চা-বাগানের মালিক প্রধানতঃ সাহেবরা ছিলেন বলিয়া তাঁহারা দার্জিলিঙ-হিমালয় রেলপথ, এবং বাগান পর্যন্ত ভাল ভাল মোটরপথ নির্মাণ করিয়া লইয়াছেন। ইহা ছাড়া, বাগান হইতে বাগানে মাল চলাচলের রজ্জুপথও (Ropeway) আছে। প্যাকিং বাক্স ভর্তি চা চালান দিবার কোন অসুবিধা নাই।

কিন্তু অরণ্যে কাঠ কাটিয়া, বড় বড় কাঠের কাণ্ড চালান দেওয়া সত্যই এক সমস্যা। সে-সমস্যারও সমাধান করা হইয়াছে এক

অভিনব পদ্ধতিতে। বহুকাল আগে হইতেই এই উপায়ে অরণ্যের কাঠ চালান দেওয়া হয়। কাঠ কাটিয়া, বড় বড় কাণ্ডগুলি নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয় এবং স্রোতের টানে ভাসিতে ভাসিতে কাঠ গন্তব্য স্থানে পৌছায়। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই এই উপায়ে কাঠ অরণ্য হইতে স্থানান্তরে পাঠানো হয়। কয়েকটি কাঠের কাণ্ড পাশাপাশি বাঁধিয়া চালি (raft) করিয়া ভাসাইয়া দিলে তাহার উপরে লোকও বসিয়া যাইতে পারে। নদীর ধারে ধারে যথাস্থানে ঘাট থাকে, সেই সব ঘাটে ভাসমান কাঠ টানিয়া লওয়া হয়। তারপর সেখান হইতে লরীতে ও রেলের খোলা মালগাড়ীতে কাঠ দেশের ভিতরে নানাস্থানে পাঠানো হয়।

সমাজ-জীবনের নবরূপ

আগে আমরা শিকারজীবী আন্দামানী ও পশুপালক আলমোড়া পর্বতবাসীদের জীবনযাত্রা ও সমাজের কথা বলিয়াছি। কৃষিজীবীদের সহিত তাহাদের অনেক দিক হইতে পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য মোটামুটি এইভাবে বর্ণনা করা যায়ঃ

ক। কৃষিজীবীদের সমাজ অস্থায়ী নহে এবং তাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় না। তাহারা **স্থায়ী গ্রাম্যসমাজ** গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের ঘরবাড়ী, বসতি, চাষের জমি সবই স্থায়ী, বংশপরম্পরায় তাহারা ভোগ করে। দুর্ভিক্ষ মহামারী রাষ্ট্রবিপ্লব বন্যা ইত্যাদি কোন অঘটন না ঘটিলে তাহারা পৈতৃক বাস্তুভিটা ও গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায় না।

খ। অর্থনৈতিক কারণেই তাহাদের পক্ষে স্থায়ী গ্রাম্যসমাজ গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। একস্থানে বাস করিয়া তাহাদের

পক্ষে জীবিকা অর্জন করা, অর্থাৎ চাষ করিয়া খাদ্যশস্য বা পণ্যশস্য উৎপাদন করা, এবং ব্যবসাবাণিজ্যাদি করা সম্ভব বলিয়াই তাহাদের স্থায়ী বসতি ও জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

গ। ধনসম্পত্তির ব্যক্তিগত স্বত্ববোধ কৃষিজীবীদের মধ্যে প্রবল। সেইজন্য কৃষিজীবী গ্রাম্যসমাজে ধনী-দরিদ্রের সামাজিক ভেদ আছে।

ঘ। পুরুষানুক্রমে একই গ্রামে বাস করিবার জন্য, প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিজের গ্রামের প্রতি মমত্ববোধ আছে, গ্রামের কীর্তি-কাহিনীর স্মৃতিজড়িত ঐতিহ্য (Tradition) সম্বন্ধে গৌরববোধ আছে। এই বোধ হইতেই গ্রামের সকলের মধ্যে, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে, যে ঐক্যচেতনা জাগে তাহাকে **জানপদ-চেতনা** (Community-consciousness) বলে। বিদেশে যদি নিজের দেশের লোকের সহিত দেখা হয়, মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। আর যদি নিজের দেশের, একই জেলার একই গ্রামের লোকের সহিত বিদেশে-বিভুঁইয়ে কোথাও দেখা হয়, নিজের সহোদর ভাই মনে করিয়া মানুষ তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চায়। এই **জানপদ-চেতনা** শিকারী-যাযাবরদের **গোষ্ঠীচেতনা** অপেক্ষা আরও উন্নত স্তরের সামাজিক চেতনা। এই জানপদ-চেতনার আরও উচ্চতর স্তরের চেতনাকে **স্বরাষ্ট্রচেতনা** বা **দেশাত্মবোধ** বলা যায়।

গ্রামের জীবন

বাংলাদেশের কৃষিপ্রধান গ্রামের লোক স্থায়ী ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া বাস করে। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, মোটা মাটির দেয়ালের

উপর খড় বা হোগ্‌লাপাতা দিয়া চাল দেওয়া হয়। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর (ঝাড়গ্রাম ও সদর মহকুমা) ও উত্তর বর্ধমান অঞ্চলে প্রধানতঃ সালকাঠের খুঁটি ব্যবহার করা হয়, কারণ সাল কাঠ এই সব অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। অন্যান্য অঞ্চলে বাঁশের খুঁটি ও বাতা দিয়া ঘরের কাঠাম তৈরী করা হয়। যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা টিনের চাল দেয়, অথবা ইটের পাকাবাড়ী তৈরী করে। কাঁচা বা মাটির খড়ো বাড়ীর সংখ্যাই গ্রামে বেশী। সূর্যোদয় হইতেই গ্রামের কর্মজীবন আরম্ভ হয়। চাষীরা হাল-বলদ লইয়া মাঠে যায়, বাকি সকলে নিজেদের কাজকর্মের জন্য প্রস্তুত হয়। সারাদিন কাজকর্মের পর, সন্ধ্যার সময় হাটে-বাজারে, দেবস্থানে, চণ্ডীমণ্ডপে, ঘরের বাহিরের উঠানে বা দাওয়ায় বসিয়া প্রতিবেশীদের সহিত কিছুক্ষণ গল্পগুজব চলে। মেয়েরা দিনের বেলা ঘরের কাজ করে, মাঠে পুরুষদের জন্য খাবার লইয়া যায়, কেহ কেহ ক্ষেতের টুকিটাকি কাজেও সাহায্য করে। সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে, সাধারণতঃ দুইদিন, হাট বসে এবং সেই হাটে নিজেদের ও আশপাশের গ্রামের লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয়। গ্রামদেবতার নিত্যপূজা ও বিশেষ উৎসব ছাড়াও বার মাসে তের পার্বণ গ্রামে লাগিয়াই থাকে। উৎসব-পার্বণে সকলে মিলিয়া মিশিয়া, ভেদবৈষম্য ভুলিয়া, আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দেয়। দৈনন্দিন কর্মজীবনের ক্লান্তি উৎসবের বন্যায় ধুইয়া-মুছিয়া যায়। উৎসবান্তের শূন্যতা আবার কাজের চাপে ভরিয়া উঠে।

চা-বাগানের জীবন

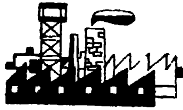
চা-বাগানের জীবন কিন্তু একেবারে অন্য ধরনের। চা-বাগান গ্রাম নহে, গ্রাম্যসমাজ বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও সেখানে নাই।

কারণ চা-বাগানের মালিকরা সেখানে ব্যবসায়ের জন্য গিয়াছেন, কর্মচারী ও কুলিরা গিয়াছে চাকরি ও মেহনত করিয়া জীবিকা অর্জনের জন্য। চায়ের বাগান ও কারখানা দুইটি মিলিয়া একটি চা-শিল্প প্রতিষ্ঠান বলা চলে। নিজেদের গ্রাম ও ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সকলে সেখানে কাজ করিবার জন্য গিয়াছে। আপিসঘর, বাগান, ফ্যাক্টরী, মালিকের বাড়ী, কর্মচারীদের কোয়ার্টার, কুলিদের বস্তি, সব মিলিয়া প্রত্যেকটি বাগানে এক-একটি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে, দেশ-বিদেশের লোকের সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে গ্রাম্য-সমাজের বন্ধন নাই।

দার্জিলিঙের চা-বাগানে নেপালী কুলির সংখ্যা বেশী, তরাইয়ের বাগানে বাহিরের কুলির সংখ্যা বেশী। ছোটনাগপুর, বিহার, দ্বারভাঙ্গা, মজফ্ফরপুর প্রভৃতি নানাস্থানের দরিদ্র লোক চা-বাগানে কুলিগিরি করিতে আসিয়াছে। আগে সর্দার পাঠাইয়া ('আড়কাঠি' বলে) তাহাদের সংগ্রহ করিয়া আনা হইত। বাহির হইতে সংগৃহীত, চুক্তিবদ্ধ কুলিদের বলা হইত 'গিরমিটি কুলি'। বাগানের কুলিদের মধ্যে অনেকে হয়ত এখন স্থায়ী অধিবাসী হইয়া দুই-তিন পুরুষ বাস করিতেছে, চাষ-আবাদ করিয়া পারিবারিক জীবনও যাপন করিতেছে, কিন্তু তবু স্থানীয় সমাজের বন্ধন তেমন দৃঢ় হয় নাই। কারখানার ও শিল্পাঞ্চলের সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সহিত কতকটা ইহার সাদৃশ্য আছে।

বাগানের কুলির কাজ গ্রীষ্মকালে সকাল ৮ হইতে এবং শীতকালে ৯টা হইতে আরম্ভ হয়, বিকাল ৫টা পর্যন্ত চাষের কাজ বা পাতা চয়নের কাজ চলে। কারখানার কাজ সকাল ৮টা হইতে ৫টা পর্যন্ত চলে, বড় বড় বাগানের কারখানায় দুই শিফ্টে মধ্যরাত্রি পর্যন্তও কাজ

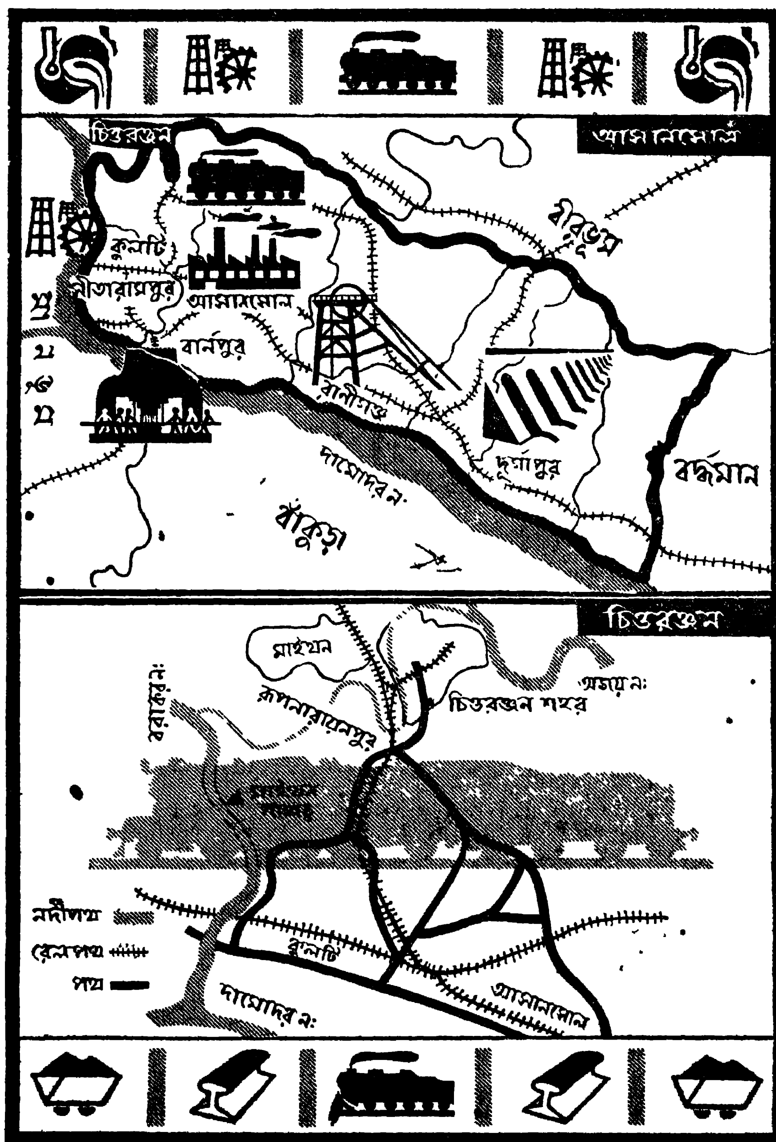
হয়। কাজের মজুরি, চুক্তি অনুযায়ী, দিনে বা সপ্তাহে দেওয়া হয়। কালীপূজা ও দোলযাত্রা বাগানের কুলিদের বড় উৎসব। নিজেদের দেশের উৎসব-অনুষ্ঠানও বাগানের কুলিরা পালন করে। সিংহভূম মানভূম অঞ্চলের মেয়ে-কুলি বা কুলিকামিনরা পৌষ-পার্বণের দিন নাচগান করে। টুসু দেবীকে রঙিন সাজ পরাইয়া, পত্রপুষ্পশোভিত তাজিয়া লইয়া তাহারা চা-বাগানের বাবুদের বাড়ী বাড়ী যায়, বকশিস আদায় করে। বাগানের মালিকদের নামে রঙ্গবিদ্রূপ করিয়া গান বাঁধিতেও তাহারা ভয় পায় না। বাগানের মালিকরা ক্লাবে যান, সেখানে নাচগান হল্লা করেন, ব্যবসায়ের গ্লানি কাটাইবার জন্য। বাগানের অন্যান্য মধ্যবিত্ত কর্মচারীদেরও নিজেদের সভা ও অ্যাসোসিয়েশন আছে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কুলিরা নানাবিধ উৎসব-অনুষ্ঠানের ঝঙ্কারের মধ্যে অবসর সময়টুকু কাটাইয়া দেয়। চা-বাগানের বিচ্ছিন্ন উপনিবেশের জীবনধারা এইভাবে বহিয়া চলে। তাহার বৈচিত্র্য নাই, বাহিরের বহমান সমাজ-জীবনের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগেরও তেমন সুযোগ নাই। দেখিলে মনে হয় যেন জীবিকার টানে বাহির হইতে ভাসিয়া আসা একদল মানুষ, কেহ অর্থের লোভে, কেহ প্রাণধারণের দায়ে একত্রে একস্থানে বসবাস করিতেছে। কেবল চা-বাগানের চা-গাছ ছাড়া, সেই স্থানের আর কোন-কিছুর প্রতি তাহাদের তেমন অন্তরের টান নাই



পঞ্চম অধ্যায়

শিল্পাঞ্চলের সমাজ

কৃষিপ্রধান গ্রামের কথা বলিয়াছি। কৃষিজাত ধান, পাট ও চা হইতে কিভাবে দেশের মধ্যে শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে। কলিকাতা ও শহরতলীর কলকারখানার মধ্যে চালকল ও পাটকল অন্যতম। কিন্তু কৃষিজাত কাঁচামাল ছাড়াও আর একরকমের কাঁচামাল আছে, তাহাকে খনিজাত বা **খনিজ** বলে। সোনা রুপো লোহা তামা, কয়লা পেট্রোলিয়ম ইত্যাদি খনিজ বস্তু। কৃষি মানুষের আয়ত্তে, যে-কোন অঞ্চলে মানুষ নানা উপায়ে শস্য উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু খনিজ বস্তুর কণামাত্রও মানুষের আয়ত্তে নাই। ইচ্ছা করিলে যে-কোন অঞ্চলে তাহা মাটি খুঁড়িয়া বা পাথর ভাঙ্গিয়া পাওয়া যায় না। খনিজ প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূগর্ভে ও শিলাগাত্রে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বৎসরে তাহা মজুত হইয়াছে। প্রকৃতির এই খনিজ ভাণ্ডার যেখানে রহিয়াছে, সেখান হইতেই তাহাকে সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন কাজকর্মের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। লোহাপাথর বা 'হিমাটাইট' যেখানে পাওয়া যায় সেখানে লোহার কলকারখানা, তামা-যুক্ত খনিজ যেখানে পাওয়া যায় সেখানে তামার কারখানা, কয়লা যেখানে পাওয়া যায় সেখানে কয়লার খনি স্থাপন না করিয়া উপায় নাই। খনিজের



(উপরে) আসানসোল শিল্পাঞ্চল। (নীচে) চিত্তরঞ্জন অঞ্চল।

এই আঞ্চলিক আকর্ষণ হইতে খনিজ পদার্থ-নির্ভর কলকারখানার নিস্তার নাই।

লোহা-কয়লার কেন্দ্র

আধুনিক যুগের বড় বড় কলকারখানা ও শিল্পনগর (Industrial Town) তাই কয়লা ও লোহার কেন্দ্রস্থলে গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মতো আমাদের দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কয়লাই এযুগের প্রধান গতিশক্তি। অগ্নি বাষ্প বিদ্যুৎ সবই কয়লা হইতে উৎপন্ন হয়। কয়লা ছাড়া গতি নাই। কয়লা ছাড়া বড় বড় যন্ত্র-দানবের এক-পাও চলিবার শক্তি নাই। লোহা-ইস্পাতের কারখানার বড় বড় চুল্লীতে হাজার হাজার টন কয়লা দরকার। কয়লাখনির কাছাকাছি লোহা-ইস্পাতের কারখানা থাকিলে সুবিধা বেশী। আর যদি লোহাপাথরও কাছাকাছি থাকে তাহা হইলে তো কথাই নাই। লোহা-ইস্পাতের কারখানা ও তাহার নানাবিধ উপশিল্পের কল-কারখানা, সবই সেই অঞ্চলে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে। লোহা-কয়লার কেন্দ্রেই তাই দেখা যায়, পৃথিবীর সর্বত্র আধুনিক শিল্পনগরেরও দ্রুত বিকাশ হইয়াছে।

আসানসোল-রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল

কয়লা-লোহার অন্যতম কেন্দ্র বলিয়া আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান শিল্পাঞ্চলরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। যন্ত্রশিল্পের মূল শক্তির আকর কয়লা এবং প্রধান উপাদান লোহা-পাথর ও অন্যান্য খনিজ এই অঞ্চলে ও কাছাকাছি স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া ইহা আমাদের শ্রমশিল্পের প্রাণকেন্দ্র

হইয়া উঠিয়াছে। সিংহভূম, মানভূম, হাজারিবাগ, রাঁচি, সাঁওতাল পরগণা, আসানসোল-রানীগঞ্জ জুড়িয়া বিস্তৃত অঞ্চলকে ভারতের খনিজ-স্বর্গ বলা যায়। এই খনিজ সম্পদের মধ্যে ও নিকটে অবস্থিত বলিয়া আসানসোল-রানীগঞ্জ-দুর্গাপুর অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চলরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। যে-যে কারণে ইহা প্রধান শিল্পকেন্দ্র হইয়াছে তাহা এই :

১। **কয়লাখনি**। ভারতবর্ষের প্রধান কয়লার খনি পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে এবং বিহারের ঝরিয়া, বোকারো, গিরিডি ও করনপুরা অঞ্চলে। এই কয়লা এই অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রের যন্ত্র পরিচালনার ইন্ধন যোগায় দূর হইতে কয়লা বহন করিয়া আনিতে হইলে শিল্পকারখানার উৎপাদনের খরচ বাড়িত। কয়লা-খনির সান্নিধ্য কারখানার উৎপাদনের ব্যয় অনেক কমাইয়াছে।

২। **লোহাপাথর**। বর্ধমানের এই অঞ্চলে, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায়, বিহারের সিংহভূম ও মানভূম জেলায়, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, বোনাই ও কেউঞ্ঝর রাজ্যে লোহাপাথরের ভাণ্ডার মজুত আছে। বিহার ও উড়িষ্যার এই সব অঞ্চলের অনেক পাহাড় আগাগোড়া লোহাপাথরে গঠিত। টাটানগরের ও কুলটি-বার্নপুরের লোহার কারখানায় এই লোহাপাথর হইতেই লোহা তৈরী হয়।

৩। **পরিবহন**। এই অঞ্চল হইতে বড় বড় মোটর-পথ বিহারের ছোটনাগপুরের সর্বত্র যেন মাকড়সার জালের মতো বিস্তারলাভ করিয়াছে। পূর্ব-রেলওয়ে ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দুইয়েরই সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে আসানসোল জংশনে। তাহার ফলে, দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর কোন দিক হইতে কোন মালপত্র বহন করিয়া এই

অঞ্চলে আনার কোন অসুবিধা নাই। কলিকাতার বন্দরের সহিতও সোজা রেলপথের ও ট্রাঙ্ক-রোডের যোগ রহিয়াছে।

৪। **বিদ্যুৎশক্তি।** উন্নত বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা রানীগঞ্জ, বরাকর ও দিশেরগড়ে আছে। দামোদর পরিকল্পনার জেলবিদ্যুৎ ও দুর্গাপুরের প্রস্তাবিত তাপবিদ্যুৎ সরবরাহ আরম্ভ হইলে বিদ্যুৎশক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইবে, সস্তাও হইবে।

৫। **কাঠ ও বালি।** কেবল কয়লা, লোহা ও অন্যান্য খনিজ নহে, খনি ও কারখানার নানাকাজে কাঠ ও বালি বিশেষ প্রয়োজন। সালবনের কাঠ এবং নিকটের দামোদর প্রভৃতি নদ-নদীর বুকে বালি এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। কয়লাখনির জন্য সালকাঠের খুঁটি ও বালি দুইই একান্ত প্রয়োজন। কোনটারই এখানে অভাব নাই।

৬। **শ্রমিক।** শিল্পাঞ্চলের জন্য শ্রমিক সরবরাহেরও সুবিধা থাকা প্রয়োজন। যেখান হইতে শুধু সংখ্যায় বেশী নহে, অপেক্ষাকৃত সুলভ মজুরিতে বেশী শ্রমিক পাওয়া যাইবে, সেইখানেই মালিকদের পক্ষে শিল্পকারখানা স্থাপন করা লাভজনক। রানীগঞ্জ-আসানসোলের আশপাশের ও মানভূম-ছোটনাগপুরের আদিবাসীপ্রধান অঞ্চল হইতে অনেক সুলভ হারে শ্রমিক পাওয়া যায়, কাজ করিবার লোকের অভাব হয় না। এখানকার শুষ্ক হাওয়া ও জলবায়ু শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল। শ্রমিকরাও তাহাদের স্বার্থের জন্য এই অঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত হইতে চায়, কারণ রানীগঞ্জ-আসানসোলের কলকারখানা সব এমনভাবে গড়া হইয়াছে যে শ্রমিকদের কোনদিন কাজের অভাব হয় না। এখানকার অধিকাংশ শিল্পকারখানার বয়েলার, চুল্লী, ধাতু-নিষ্কাশন যন্ত্র, ফাউণ্ড্রি, ওআর্কশপ, সংযোজনশালা (Assembly) ইত্যাদি প্রায় একই ধরনের। সেইজন্য

এক কারখানার কাজে অভিজ্ঞ শ্রমিক অন্য কারখানার যন্ত্রপাতি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারে, তাহকে বেকার থাকিতে হয় না, বা স্থানান্তরে যাইতে হয় না। কয়লাখনির শ্রমিকদেরও একই সুবিধা আছে, কারণ খনি আছে অনেক, এক খনির কাজ ফুরাইলে অন্য খনিতে কাজ পাওয়া যায়। এই কারণে শ্রমিকদেরও এই শিল্পাঞ্চলের প্রতি আকর্ষণ বেশী।

এই সব সুযোগ-সুবিধা সাধারণতঃ একটি অঞ্চলে পাওয়া যায় না। কয়লা থাকে তো অন্য খনিজ থাকে না, খনিজ থাকে তো যানবাহন-যোগাযোগের ব্যবস্থা করা যায় না, শ্রমিক পাওয়া যায় না, একটা কিছু অসুবিধা থাকেই। এতরকম সুযোগের যোগ একসঙ্গে একটি অঞ্চলে হইয়াছে বলিয়াই রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চল পশ্চিম-বঙ্গের সর্বপ্রধান শিল্পাঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহার প্রসার ও সমৃদ্ধিরও সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট।

খনি ও শিল্পকারখানার কর্মজীবন

কয়লাখনি ও শিল্পকারখানার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এই অঞ্চলে অনেক। ছোটবড় কয়লার খাদ ও খনি এবং মৌলিক শিল্পের ও উপশিল্পের কারখানা এখানে অনেক গড়িয়া উঠিয়াছে। বার্নপুর-কুলটির লোহা-ইস্পাতের কারখানা, আসানসোলের রেলের ওআর্কশপ ও চিত্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন তৈরীর কারখানা, এই অঞ্চলকে পৃথিবীর যে-কোন বৃহৎ শিল্পনগরের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ছাড়াও অ্যালুমিনিয়াম, লোহা-ঢালাই, তাপসহ ইট, সাইকেল, চীনামাটির জিনিস, পাইপ, বেনজল ও আলকাতরা প্রভৃতি নানারকম শিল্পদ্রব্য তৈরীর কারখানাও অনেক আছে। এখানে আসিলে কলকারখানার

বিকটাকার সব যন্ত্রের কর্কশ শব্দ ও কর্ণভেদী গর্জনের মধ্যে শত শত ইঞ্জিনিয়ার, হাজার হাজার কর্মচারী ও শ্রমিকের সংঘবদ্ধ কাজকর্মের সুশৃঙ্খল রূপ দেখিয়া বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়।

কয়লা খনি। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল মহকুমায় সীতারামপুর গ্রামের নিকট ১৭৭৪ সালে যদিও কয়লা প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলেও ১৮৪৩ সালে 'কার, ট্যাগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠার আগে, কয়লাখনির ব্যবসা ঠিক মতো চালু হয় নাই। এই কোম্পানির প্রথম বাঙালী অংশীদার 'ট্যাগোর' হইলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। কেবল বাঙালীদের মধ্যে নহে, ভারতবাসীদের মধ্যে দ্বারকানাথই প্রথম উদ্‌যোগী কয়লাখনির ব্যবসায়ী। এই 'কার, ট্যাগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি' পরে 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি' হয়। গত একশত বৎসরের মধ্যে আরও অনেক কোম্পানি ও কয়লাখনি হইয়াছে এবং কয়লা তোলার পরিমাণও অনেক বাড়িয়াছে। এক প্রকারের কয়লা আছে, অ্যানথ্রাসাইট (Anthracite) বলে, তাহাতে কার্বনের ভাগ শতকরা ৯০এর উপর, জ্বালিলে খুব তাপ হয়, কিন্তু শিখা ও ধোঁয়া হয় না। এ কয়লা আমাদের দেশে নেই। রাণীগঞ্জের কয়লাকে 'bituminous coal' বলে, জ্বালিলে শিখা ও ধোঁয়া হয়। এই জাতের উৎকৃষ্ট কয়লায় ৫০-৬০ ভাগ কার্বন থাকে, নিকৃষ্ট কয়লায় মাটি-পাথর বেশী মিশ্রিত থাকে, কার্বন আরও কম এবং ছাই বেশী। ভাল কয়লা রেলওয়ে, লোহা-ইস্পাতের কারখানা ও অন্যান্য বড় কারখানায় ব্যবহার করা হয়। পাতনযন্ত্রে চোয়াইলে, তাহা হইতে আলকাতরা ও গ্যাস বাহির হয়। পাতনযন্ত্রে যে কয়লা পড়িয়া থাকে তাহাকে 'কোক' (Coke) বলে। কাঁচা কয়লা অল্প পুড়াইয়াও কোক তৈরী করা হয়।

কয়লাখনি নিজের চোখে না দেখিলে এবং কয়লার খাদে না নামিলে, খনির কথা লিখিয়া বুঝান যায় না। রানীগঞ্জ-আসানসোল বেশী দূর নহে, একদিনে সকালে যাইয়া, খনি ও কারখানা দেখিয়া, রাত্রে ফিরিয়া আসা চলে। এযুগের মানুষের অন্যতম বিস্ময়কর কীর্তি বলিয়াও খনি-কারখানা একবার চোখে দেখা উচিত। খনি বা খাদের রকমভেদ আছেঃ পোখ্‌রা খাদ (Quarry) পুকুরের মতো কাটা হয়, ইহার ছাদ নাই; হাঁটা খাদ (Inclined), বা শ্রমিকদের ভাষায় 'ইনক্লাইন' খাদ। ইনক্লাইনের দুই দিকের দুই মুখ হইতে সুড়ঙ্গের মতো পথ খাদের গভীরে চলিয়া যায়, মধ্যে (Pit-head বলে) ডুলিতে (Cage) উঠানামা করিবার গীয়ার থাকে, বহু দূর হইতে খনির এই ডুলি-নামার গীয়ারের মাথা দেখা যায়। ইহা ছাড়া, খনির উপরে আর দেখিবার মতো বিশেষ কিছু নাই। 'গুম্‌টিঘর' বা ইঞ্জিনঘর আছে, শ্রমিকদের বাতি রাখার 'তেলঘর' আছে, আর 'হাজ্‌রী অফিস' আছে। পাশে কুলিদের থাকিবার বাসা বা 'ধাওড়া' আছে, ডাক্তারখানা, স্টোর বা গুদামঘর এবং ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য বাবু-কর্মচারীদের আপিস আছে।

খাদের ভিতরে এক তাজ্জব রাজ্য। ভিতরে রাস্তা কাটার ফলে কয়লার বড় বড় 'কাঁথি' (Pillar) তৈরী হয়। বাহিরের ভূপৃষ্ঠের সহিত বড় পথের (Main Gallery বলে) সংযোগ থাকে। কয়লা-খনির অন্দরকে স্থানীয় ভাষায় বলে 'চৌখুপি'। বড় গ্যালারী হইতে চারিদিকে কয়লা কাটিয়া যাওয়ার ফলে বহু গলি (Tunnel) বাহির হইয়া যায়, তাহাকে 'সুঁদ' বলা হয়। প্রথমে কয়লার কাঁথির উপর মাথার উপরের ছাদের ভার রাখিয়া সুঁদ কাটিয়া যাওয়া হয়। ভিতরের একদিকের কয়লা এইভাবে কাটা হইলে, সেই দিকটাকে

দেখিতে একটি হলঘরের মতো লাগে। কয়লার পাতালপুরীর হলঘর, চারিদিকে কয়লার থাম বা কাঁথি, মাথার উপরেও কয়লা। কিন্তু বড়বড় কাঁথিতেও তো অনেক কয়লা থাকে, তাহাও ফেলিয়া আসা যায় না, কাটিয়া আনিতে হয়। কাঁথি চিরিয়া ফেলিয়া কাঠের খুঁটি (Prop) লাগানো হয়, উপরের কয়লা তখন শূন্যে ঝুলিতে থাকে। যখন কাঁথি-কাটা (Prop-drawing) হইয়া যায় তখন উপরের ছাদের কয়লা নিজের ভারে যেন আলগা হইয়া ঝুলিতে থাকে, তাড়াতাড়ি খুঁচাইয়া তাহা ফেলিয়া দিয়া সরাইয়া আনিতে হয়। বাহিরের কোন দর্শক যদি খাদে নামিয়া, ভিতরের এই দিকটায় যান, তাহা হইলে ভয়ে তাঁহার গা ছমছম্ করিবে। কথা বলা বন্ধ, যাহারা কয়লা কাটে তাহারাও প্রেতপুরীতে বোবা হইয়া কাজ করে। বেশী গোলমাল বা শব্দ হইলে তাহার আওয়াজে কয়লার চাঙ্গড় ধসিয়া পড়িয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। বিপদ ও দুর্ঘটনা এরকম হয়ও অনেক। চাপা পড়িয়া মরা, ভিতরে গ্যাস ও আগুন লাগিয়া যাওয়া, এরকম অনেক দুর্ঘটনা খনি অঞ্চলে ঘটিয়াছে। আগুন লাগিলে আর নিভিবে না, কারণ আগুনের ইন্ধন যে কয়লা তাহারই তো খনি, কয়লা ফুরায় না, আগুনও তাই নিভিয়া যায় না। বালি চাপা দিয়া তখন প্রজ্বলিত খনি-মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। আগুন জ্বলিতে থাকে ভিতরে। উপরেও তাহার হল্কা দেখা যায়। বৎসরের পর বৎসর অনির্বাণ এই আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে, দূর হইতে খনি-অঞ্চলে রাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ছাদের কয়লা কাটা শেষ হইলে কয়লা যখন নিঃশেষ হইয়া যায় তখন ছাদ ধসিয়া পড়ে, উপরের ভূপৃষ্ঠের জমিও ডুবিয়া বসিয়া যায়। খনি অঞ্চলে বাহিরে চলিবার সময় এরকম বসিয়া-যাওয়া জমি অনেক দেখা যায়। দেখিলে বুঝিতে হইবে,

নীচের কয়লার ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে, তাই উপরের ফাঁপা মাটি বসিয়া গিয়াছে।

খাদের ভিতরে যাহারা কয়লা কাটে (Coal-cutter), তাহাদের স্থানীয় ভাষায় 'মালকাটা' বলা হয়। কাটিবার হাতিয়ারকে 'গাঁয়তা' (Pick) বলে। গাঁয়তা দিয়া কাটিয়া, 'বেলচা' (Shovel) দিয়া ঝুড়িতে রাখা হয়। তারপর টবগাড়ীতে বোঝাই করিয়া উপরে তোলা হয়। মেয়ে-কুলিদের 'কুলিকামিন' বলে। কামিনদের ('কামিনী' কথা হইতে) আজকাল খাদের ভিতরে নামিতে দেওয়া হয় না, তাহারা উপরে কয়লা তোলা-ঝাড়া-বাছা ইত্যাদির কাজ করে। মালকাটাদের এক-একজন সর্দারও থাকে। টবগাড়ী চলাচলের ভার থাকে যাহাদের উপর, তাহাদের 'টালওয়ান' (Trolleyman) বলা হয়। সবই স্থানীয় ভাষা, কোন অভিধানে নাই, শ্রমিকরাই ইহার স্রষ্টা। অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে ম্যানেজারবাবু, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারবাবু, ওভারম্যান ও তাঁহার সহকারী, বড়বাবু, মুন্সীবাবু, খাজাঞ্চীবাবু, ইঞ্জিনিয়ারবাবু, বিজলীবাবু (Electrician), বড় ও ছোট কম্পাসবাবু (Surveyor), হাজরীবাবু, বড়াই (Carpenter), রাজ (Mason) ইত্যাদি আছেন। এই সব নানাশ্রেণীর বাবু-কর্মচারী ও শ্রমিকদের লইয়া খনি-অঞ্চলের স্থানীয় সমাজ গড়িয়া উঠে।

বাবুরা ও শ্রমিকরা সকলেই প্রায় বাহির হইতে কাজ করিতে আসেন বাবুদের কোয়ার্টার পদমর্যাদা ভেদে বড় বাংলো বাড়ী হইতে ছোট ছোট পাকা বাড়ী। কুলিদের আলাদা বস্তি বা ধাওড়া আছে। ছত্রিশগড়িয়া, ছোটনাগপুরী, বিলাসপুরী, রায়পুরী, ওরাঁও, সাঁওতাল, বাউরী, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি সকল জাতির লোক খনি-মজুরদের মধ্যে আছে। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংস্কারবোধ ও

স্বাতন্ত্র্যচেতনা খুব প্রবল। নিজেদের রীতিনীতিই তাহারা বাহিরের জীবনে মানিয়া চলে। বাবুরা ইনস্টিটিউটে ও ক্লাবে যান, কাছাকাছি রেলওয়ে ও অন্যান্য শিল্পকারখানার কর্মচারীদের ক্লাব-ইনস্টিটিউটের সহিত তাঁহাদেব যোগাযোগও থাকে। সব মিলিয়া এখানকার শিল্পাঞ্চলে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের বেশ বড় একটি স্থানীয় সমাজও গড়িয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু খনিমজুররা সাধারণতঃ ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যাহারা যে-অঞ্চল হইতে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। আমোদ-প্রমোদ, পূজা-পার্বণ, রীতিনীতি সবই তাহাদের আঞ্চলিক সংস্কার অনুযায়ী। বাবুরা দুর্গাপূজা করেন জাঁক করিয়া, খনিমজুররা কালীপূজা, ঈদ, ছট্, ভাদু প্রভৃতি উৎসব করে। বাবুদের উৎসবে মজুররা যায়, মজুরদের উৎসবে বাবুরাও আসেন। এইভাবে উৎসবের ভিতর দিয়া সকল শ্রেণীর মধ্যে মেলামেশাও খানিকটা হয়। কিন্তু মজুরদের মধ্যে নিজেদেব দেশের আঞ্চলিক রীতিনীতি সম্বন্ধে গোঁড়ামি অনেক বেশী। দুর্নীতি বা ব্যভিচারের প্রশ্রয় তাহারা দেয় না, কেহ ব্যভিচারী হইলে তাহাকে সমাজচ্যুত করা হয়। বাহিরের লোকের অনেকের মজুরদের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, তাহা ভুল। খনি-অঞ্চলে দুর্নীতি প্রবল ছিল সাহেব ও ট্যাস-ফিরিঙ্গিদের প্রভুত্বের আমলে। তাঁহারাই নিজেদের ভোগ-বিলাসিতার জন্য তাহার আস্কারা দিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে খনিমজুররা খাদের ভিতরে, সুঁদের অন্ধকারে অনেক অকাজ-কুকাজ করে। ইহা মিথ্যা গালগল্প ছাড়া কিছু নহে। যাঁহারা এই গল্প বানাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন না যে সকল জাতের মালকাটা ও কুলিকামিনরা, খাদের অন্দর ও গহ্বরকে 'মা কালীর পেট' বলিয়া মনে করে। মা-কালীর ধ্বনি

দিয়া তাহারা গহ্বরে প্রবেশ করে। তাহাদের বিশ্বাস, তাহারা মা-কালীর সন্তান, মায়ের পেটের ভিতর ঢুকিয়া কাজ করিতেছে। কোন অন্যায়, অসাধুতা, অকাজ-কুকাজ প্রাণ থাকিতেও তাহারা খাদের ভিতরে করিবে না।

এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গতিশক্তির আকর কয়লা যাহারা ভূগর্ভ হইতে এত মেহনত করিয়া তুলিয়া আনে, এবং যে-কয়লায় বাহিরের কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি; যানবাহন, সব কিছু চলে, সেই খনিমজুরদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের কথা চিন্তা করা এবং তাহার ব্যবস্থা করা, দেশেব প্রত্যেক মানুষেব ও দেশনায়কের প্রধান কর্তব্য। আমাদের স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়করা এবিষয়ে সজাগ হইয়াছেন, তাহাদের বসবাস, শিক্ষাদীক্ষা, আমোদপ্রমোদ, রোগচিকিৎসা ইত্যাদির জন্য তাহারা অনেক নূতন আইন ও ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু তাহাদের কল্যাণের জন্য করা হইবে এবং করা কর্তব্য।

বার্নপুর-কুলটি-হীরাপুর। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বৃহৎ লোহা-ইস্পাতের কারখানা বার্নপুর হীরাপুর ও কুলটিতে প্রতিষ্ঠিত। বিরাট একটি অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা আছে জে-কে-নগরে, আসানসোল ও রানীগঞ্জের মধ্যখানে। রানীগঞ্জে একটি কাগজ তৈরীর কারখানা আছে, 'দি বেঙ্গল পেপার মিল'। মৃৎশিল্প-কারখানা আছে ৬টি, টালি ও নানারকমের মাটির দ্রব্যাদি তৈরী হয়, ৩টি রানীগঞ্জে, একটি দুর্গাপুরে, একটি রূপনারায়ণপুরে, একটি জামগ্রামে। আসানসোলের নিকটে একটি সাইকেলের কারখানা আছে। ছোটবড় এত কারখানা এবং সেই সব কারখানায় এত যন্ত্র আছে যে রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলকে মনে হয় যেন বিশাল একটি যন্ত্রদৈত্যপুরী। উপরের এই যন্ত্রের দৈত্যপুরীর নীচে রহিয়াছে কয়লার বিশাল পাতালপুরী।

কুলটি ও হীরাপুরের 'ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর (IISCO) সহিত বার্নপুরের 'স্টীল কর্পোরেশন অফ্ বেঙ্গল' (SCOB) প্রতিষ্ঠানের মিলন ঘটে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ৯ ডিসেম্বর লোকসভায় 'আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীজ অ্যামাল-গামেশন অ্যাক্ট' নামে আইন পাশ করাইয়া এই মিলন ঘটান হয়। শ্রমশিল্পের ইতিহাসে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মিলনের ফলে লোহা-ইস্পাতের ও তাহার শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে, কারখানা পরিচালনার উন্নতি হইবে, মেহনত ও অর্থের অপব্যয় কমিবে। সেই উদ্দেশ্যেই ভারত সরকার এই মিলন ঘটাইয়াছেন। মিলনের পরে, ১৯৫৩ হইতে ১৯৫৬ সাল, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে শিল্পোন্নতির বিরাট পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ১৫ কোটি টাকা, ভারত সরকার ১০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য উপায়ে আরও ৬ কোটি টাকা, মোট ৩১ কোটি টাকা অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঠিক হইয়াছে যে ১৯৫২-৫৩ সালে উৎপন্ন বিক্রয়োপযোগী ইস্পাত ৩ লক্ষ টন ও ঢালা-লোহা (Pig Iron) ১ লক্ষ ৪০ হাজার টন, যথাক্রমে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ৭ লক্ষ টন ও ৪ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে। তাহার জন্য কারখানার যন্ত্রপাতি, চুল্লী ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম যাহা সংযোজন করা প্রয়োজন তাহা করা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।

বার্নপুর-কুলটি ও হীরাপুরের তিনটি কারখানাতে ১৯৫০ সালে প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক কাজ করিত। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কারখানার একীকরণ, বিভিন্ন অংশের প্রসার ও উন্নতির ফলে শ্রমিকের সংখ্যা ও কাজকর্ম অনেক বাড়িয়াছে। শ্রমিকদের

থাকিবার ঘরবাড়ী এখানে খনি-অঞ্চল অপেক্ষা অনেক ভাল, পথঘাট ও অন্যান্য কর্মচারীদের কোয়ার্টার অনেক পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। ভাল হাসপাতাল, ক্যান্টিন, ক্লাব, ইন্‌স্টিটিউট ও স্কুলও আছে। সারাদিন ও সারারাত কারখানায় 'শিফ্‌টে' কাজ চলে। বার্নপুর-কুলটিব শিল্প-নগরের একদল মানুষ কারখানা হইতে ভোঁ পড়িলে বাহির হইয়া আসিয়া ঘরমুখো চলিতে থাকে, আর একদল ঘর হইতে কারখানার দিকে যায়। যেন অনবরত এই চলাচল হইতে থাকে। ভিতরে কারখানায় কাজ থামে না, বাহিরে মানুষের যাতায়াতও থামে না। যান্ত্রিক গতির ছন্দ এই শিল্পনগরের মানুষের জীবনযাত্রায় প্রতিধ্বনিত হয়। ভিতরে যান্ত্রিক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিতে থাকে, নিদারুণ শব্দে ও গর্জনে। সমগ্র দেশ গড়িয়া-পিটিয়া তুলিতে যাহা যাহা লাগে, মনে হয় সবই যেন বিশ্বকর্মার এই বিরামহীন যন্ত্রশালায় নির্মাণ করা হইতেছে।

চিত্তরঞ্জন। 'চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভ ওআর্ক্‌স' কেবল আমাদের বাংলা-বিহারের বা ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র এশিয়ার একটি বিস্ময়কর শিল্পকীর্তি। পশ্চিমবঙ্গ-বিহারের সীমান্তের এই স্থানে দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জনের নামে রেল-ইঞ্জিন তৈরীর যে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী (ভারত রাষ্ট্রকে 'রিপাবলিক' বা প্রজাতন্ত্র-ঘোষণার দিনে), তাহা গত আট বৎসরের মধ্যে সারা এশিয়ার সর্ব-শ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকালে পরিকল্পনা ছিল বৎসরে ১২০টি সাধারণ আকারের লোকোমোটিভ এবং ৫০টি বয়েলার তৈরী করা হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের 'লোকোমোটিভ ম্যানুফ্যাক-চারার্স কোম্পানী'র সহিত চুক্তি হইয়াছিল যে তাঁহারা উপদেষ্টা, পরিচালক, টেকনিসিয়ান ইত্যাদি যোগাইয়া প্রথমদিকে সর্বপ্রকারে

সাহায্য করিবেন, কিন্তু ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিসিয়ান ও কর্মীরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করিয়া আত্মনির্ভর হইতে পারিলে তাঁহাদের চলিয়া যাইতে হইবে। প্রথমে বিদেশ হইতে বেশী টুক্‌রা কলকব্জা আনিয়া, এখানে জোড়া দিয়া ইঞ্জিন তৈরী করিতে হইত। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের ভারতীয় যন্ত্রবিদ্‌রা নিজেরা ইঞ্জিন ও তাহার টুক্‌রা কলকব্জা নির্মাণের যাবতীয় বিদ্যা ও কৌশল আয়ত্ত করিয়া স্বাবলম্বী হইয়াছেন।

১৯৫৪ সালের মে মাসের মধ্যে প্রতি মাসে ৮টি হারে বৃহৎ ইঞ্জিন (সাধারণ ১০টির সমান) তৈরী করিয়া (অর্থাৎ বৃহদাকারের ভারী ইঞ্জিন বৎসরে ৯৬টি, সাধারণ আকারের ১২০টি) পরিকল্পনার এক বৎসর আগেই সঙ্কল্প পালন করা সম্ভব হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে বৃহদাকার ইঞ্জিন-নির্মাণের মাসিক হার হয় ১০টি (সাধারণ আকার ১৫০টি বৎসরে) এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই হার বাড়িয়া মাসিক ১২টি হয়। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে মাসিক উৎপাদনের হার হয় ১৪টি ভারী ইঞ্জিন (বৎসরে ২১০টি সাধারণ ইঞ্জিন)। ছয় বৎসরের মধ্যেই পরিকল্পনার প্রায় দ্বিগুণ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। শুধু ইঞ্জিন নহে, ইঞ্জিনের যাবতীয় কল-কব্জা ও সরঞ্জামও চিত্তরঞ্জন কারখানায় তৈরী হয় এখন। সুযোগ পাইলে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিসিয়ান্‌রাও যে পৃথিবীর যে-কোন শিল্পোন্নত দেশের বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের মতো দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন, চিত্তরঞ্জনের কীর্তি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার, উভয় প্রদেশের সহিত চিত্তরঞ্জন সংযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চল চিত্তরঞ্জন হইতে ১০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। আসানসোল-রানীগঞ্জের শিল্পাঞ্চলের দূরত্বও বেশী নহে।

দামোদর উপত্যকার মাইথন বাঁধ হইতে মাত্র ৬ মাইল দূরে চিত্তরঞ্জন। বরাকর ও অজয় নদীও নিকটে। রেলপথ ও মোটরপথের যোগাযোগ প্রশস্ত। বিহারের সাঁওতাল পরগণা ও মানভূম এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, পুরুলিয়া অঞ্চলে শ্রমিকের অভাব নাই। স্থানও স্বাস্থ্যকর। সবদিক হইতে আদর্শ স্থান চিত্তরঞ্জন, ভারতের ও এশিয়ার শ্রেষ্ঠ লোকোমোটিভ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য মনোনয়ন করা হইয়াছে। সেখানে যে নূতন সর্বাঙ্গসুন্দর শিল্পনগর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আগেকার কোন পুরাতন অবিন্যস্ত শিল্পনগরের সহিত তুলনা করিলে (যেমন হাওড়া) আদর্শপুরী বলিয়া মনে হয়।

পুরাতন ও নূতন শিল্পনগর

কোন স্থানে যখন শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয় তখন সেখানে কাজকর্মের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোকজন আসিয়া জড়ো হয়। সেই স্থানের জনবসতির ঘনতা (density) ক্রমে বাড়িতে থাকে। সুতরাং কোন পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি সেখানে বসতি-বিন্যাস ও বসবাসের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাদি না করা যায়, তাহা হইলে সেই শিল্পাঞ্চলে অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল রূপে শিল্পনগর গড়িয়া উঠে। ভাগীরথীতীরে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে, কলিকাতার মধ্যে কোন-কোন অঞ্চলে এবং হাওড়ায় এই ধরনের অবিন্যস্ত জনবহুল শিল্পনগর ও উপশিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে, পূর্ব-পরিকল্পনার অভাবে। এইসব শিল্পনগর দেখিলে মনে হয়, মৌচাকের মতো যেন বহু লোক একত্রে একস্থানে জড়ো হইয়া আছে এবং মানুষের মতো বসবাসের অনেক সুযোগ-সুবিধা সেখানে নাই, পরিবেশও নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। বার্নপুর কুলটির শিল্পনগর, জে-কে-নগর,

দামোদর উপত্যকার বাঁধ নির্মাণকেন্দ্র এবং চিত্তরঞ্জনের শিল্পনগর পরবর্তীকালে অনেক উন্নত পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এইসব নূতন শিল্পনগরের সহিত পুরাতন শিল্পনগর হাওড়া, বরানগর, টিটাগড়-বারাকপুর, নৈহাটি-কাঁচরাপাড়া, টালিগঞ্জ-বেহালা-বেলিয়াঘাটা প্রভৃতির তুলনা করিলে মনে হয় দুইয়ের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্য পার্থক্য।

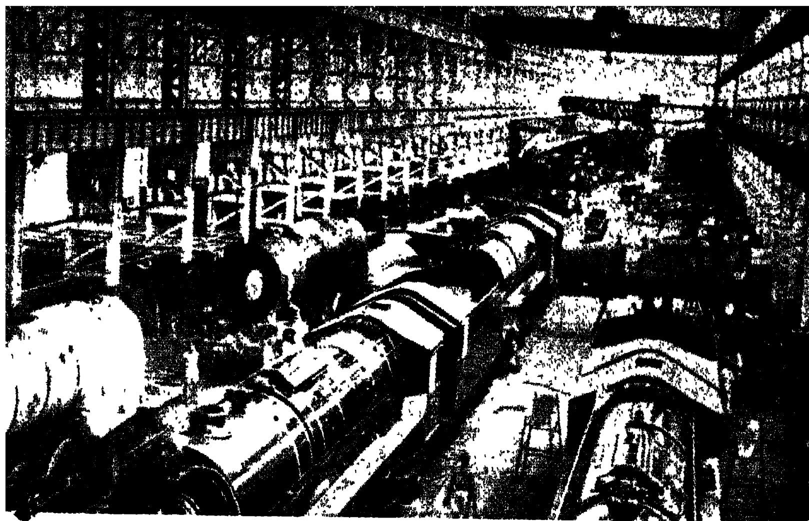
শিল্পনগর হাওড়া

হাওড়ার কথাই বলা যাক। হাওড়া ব্যাঁটরা গোলাবাড়ী শিবপুর (আংশিক) প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া হাওড়ায় একটি বৃহৎ শিল্পনগর গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে এইসব অঞ্চল এক-একটি গ্রাম ছিল। শিবপুর ব্যাঁটরা ইত্যাদি গ্রামের নাম, কয়েকটি বেশ প্রাচীন গ্রাম (যেমন শিবপুর)। শিল্পকারখানা এই অঞ্চলে, উনিশ শতকের শেষ পাদ হইতে (১৮৮০-৮৫ সাল), গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। গত কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে শিল্পকারখানা ও জনবসতি দুইয়েরই বৃদ্ধির হার, তাহার পূর্বের অর্ধশতাব্দীর তুলনায়, প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। প্রতি বর্গ-মাইলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় ;

	১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯০১	১৮৮১
হাওড়া মালিপাঁচঘরা ব্যাঁটরা গোলাবাড়ী শিবপুর (অংশ)	৪৩,৫৩৭	৩৮,০৮২	২২,৫৭৮	১৫,৭৯৫	৯,১০২

[সেন্সাস রিপোর্ট : পঞ্চম খণ্ড, প্রথম ভাগ (ক) : ১৯৫১]

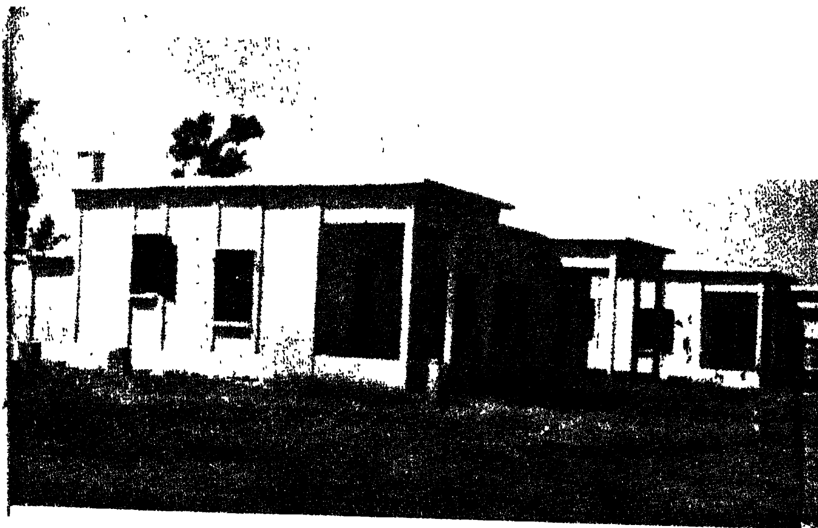
হাওড়ায় উপশিল্প প্রতিষ্ঠানের (Secondary industries) সংখ্যা সর্বাধিক। ছোট ছোট্ট যন্ত্রপাতি মেরামতের ও তৈরীর



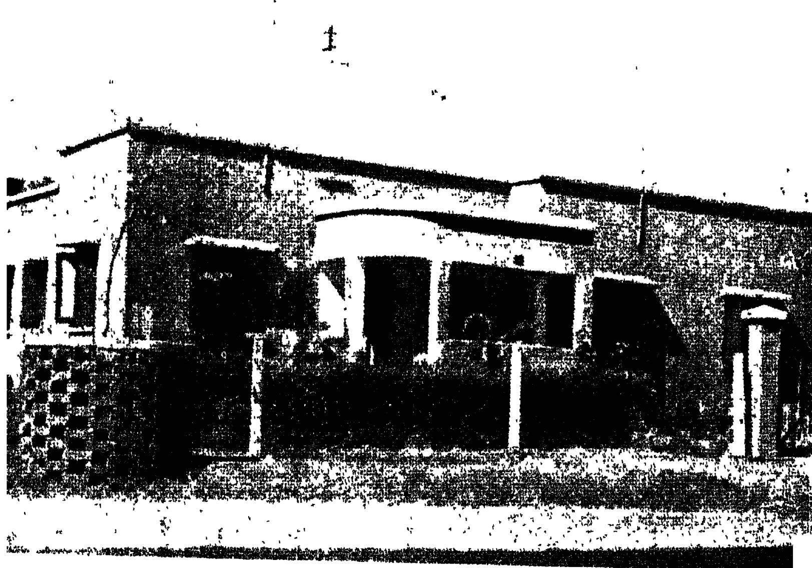
চিত্তরঞ্জনের কারখানা হইতে তৈরী ইঞ্জিন বাহির হইতেছে।



চা-বাগানে চা-পাতা তোলা হইতেছে।



চিত্তরঞ্জন নগরের সাধারণ স্টাফ-কোয়ার্টার



চিত্তরঞ্জন নগরের প্রথম শ্রেণীর স্টাফ-কোয়ার্টার

কারখানার সংখ্যাই বেশী, মনে হয় হাওড়া শিল্পনগর যেন একটি যান্ত্রিক কামারশালা। ৫-১০ জন হইতে ৪০-৫০ জন কর্মীর ওআর্কশপ হাওড়ার চারিদিকে যেন চাক বাঁধিয়া রহিয়াছে। মালিকরা অনেকে নিজেরাই মিস্ত্রী, অন্যান্য মিস্ত্রী ও শ্রমিকদের সহিত একত্রেই কাজ করেন। মোটর, কারখানার যন্ত্রপাতির কলকব্জা তৈরী করা, মেরামত করা, এইসব ওআর্কশপের প্রধান কাজ। ছোট-মাঝারি অন্যান্য শিল্প-কারখানাও আছে। কিন্তু অধিকাংশই হইতেছে উপশিল্প।

হাওড়া

হাওড়া জেলায় বর্তমানে ৪টি শহর ও নগর আছে—হাওড়া, বালি, উলুবেড়িয়া ও বাউড়িয়া। লক্ষাধিক লোকসংখ্যার দিক হইতে বিচার করিলে শহর (city) একটি, হাওড়া শহর। হাওড়া ব্যাটরা গোলাবাড়ি মালীপাঁচঘরা ও শিবপুর থানার একাংশ নিয়া হাওড়া শহর। হাওড়া শহরের লোকসংখ্যা ১৯৪১ সালে ছিল ৩,৭৯,২৯২, দশ বছরে বাড়িয়া ১৯৫১ সালে হইয়াছে ৪,৩৩,৬৩০। ইহার পরেই জনবহুল নগর হইল 'বালি', লোকসংখ্যা ১৯৫১ সালে ৬৩,১৩৮ ছিল। হাওড়া শহরের **বেলিলিয়াস অঞ্চলের** কারখানাগুলির জন্য ইহাকে Birmingham of India বলা হয়। হাওড়া শহরে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মাঝারি ও ছোট শিল্পকারখানার (medium and small industries) সংখ্যা বেশী। কয়েকটি শিল্পের কল-কারখানার মোট সংখ্যা এবং তাহাতে নিযুক্ত মোট কর্মী-সংখ্যা এখানে দেওয়া হইল। ইহা হইতে প্রতি কারখানার আয়তন, কর্মী-সংখ্যা এবং কলকারখানার উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ধারণা হইবে :

কলকারখানা ও তাহার সংখ্যা			মোট কর্মী-সংখ্যা
তুলার গাঁট বাঁধা কল	:	৯	২০৭
পাটের গাঁট বাঁধা কল	:	৪	২৯৩
ময়দার কল	:	৪	৬৯৯
ধানকল	:	৯	৫২৭
সোডা-ওয়াটার কল	:	২	৮৯
পশমের কারখানা	:	১	১৪৬
মোজা-গেঞ্জীর কল	:	১৫	৩৩৫
দড়ি ও সুতোর কল	:	৫	১,৬৩২
কাঠচেরাই কল	:	৫	১৯৫
রবারের জিনিসের কারখানা	:	৩	১,০৬১
রং বার্নিসের কারখানা	:	৮	১,০৫৩
কাঁচের কারখানা	:	৮	১,৯৮৯
চীনামাটি, মৃৎশিল্প	:	২	১১০
লোহা রোলিং কারখানা	:	**১৩**	**২,৯০৩**
লোহা ঢালাই কারখানা	:	**৮৭**	**৫,৭১১**
ধাতু গালাই ও শোধন	:	২	৩৭৫
ধাতুদ্রব্যের কারখানা	:	**১১২**	**২,৮১০**
ছোট যন্ত্রশিল্প	:	**১৩**	**৬,৭৯৫**
নাট বল্টু পেরেক ইত্যাদি	:	**২৬**	**৪,৫৭৪**
জাহাজ তৈরী, মেরামত	:	**১৪**	**৩,৫৮৩**
রেলের কারখানা	:	**৫**	**৭,৮১২**

হাওড়ায় এই উপশিল্পের প্রাধান্য কেন?

কলিকাতা শহরতলীর ও ভাগীরথীতীরের বড় বড় পাটশিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য কলকারখানার জন্য প্রধান মহানগরের

নিকটে এই উপশিল্প-নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। মোটরগাড়ীর সংখ্যাও কলিকাতাতে সর্বাধিক। সেইজন্য এইসব যন্ত্রপাতি মেরামত, ঢালাই ও নির্মাণের ছোট ছোট ওআর্কশপ কলিকাতায় ও হাওড়ায় এত বেশী। মেরামত ও টুক্‌রা কলকব্জা ঢালাই-নির্মাণের চাহিদা কলিকাতা ও তাহার পাশাপাশি অঞ্চলে অত্যধিক বলিয়া এইসব উপশিল্পের কাজের অভাব হয় না। কাজের 'অর্ডার' সংগ্রহ ও সরবরাহ করা মালিকদের পক্ষে সহজেই সম্ভব হয়। সেইজন্য কেবল হাওড়া 'টাউন' এলাকায় নয়, বালি, লিলুয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও অনেক শিল্প-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

রেলপথের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই হাওড়ার লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে, এবং উপশিল্পেরও বিস্তার হইতে থাকে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে (এখন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে), হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা ও হাওড়া-শিয়াখালা রেলপথ ১৮৯৭-৯৮ সালে খোলা হয়। ভিতরের গ্রামের সহিত শিল্পনগরের সংযোগ স্থাপিত হয় এইসব রেলপথ দ্বারা। লোকের যাতায়াত দ্রুত ও সহজ হইয়া যায়। ক্রমেই হাওড়ার জনসংখ্যা ও বসতি-ঘনতা বাড়িতে থাকে দ্রুতগতিতে। কলিকাতায় যেমন ময়লা-জল নিষ্কাশনের জন্য ভূগর্ভস্থ নালা আছে (sewerage system), হাওড়ায় তাহা নাই। পানীয় পরিস্রুত জলেরও অভাব খুব। ফলে জনবসতির বৃদ্ধির অনিবার্য পরিণাম হইয়াছে বস্তির প্রাচুর্য। কলিকাতা মহা-নগরের প্রাসাদ-অট্টালিকার মধ্যেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে, সুনির্দিষ্ট কোন নগর-পরিকল্পনার অভাবে, অনেক ঘিন্‌জি অস্বাস্থ্যকর বস্তি ক্ষতস্থানের মতো গজাইয়া উঠিয়াছে। এইসব বস্তির ও বস্তিবাসীর যে কি শোচনীয় অবস্থা তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বস্তি-তদন্ত

রিপোর্ট হইতে বুঝা যায় (*Report on a Sample Enquiry into the Living Conditions in the Bustees of Calcutta and Howrah, 1948-49*)

উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে এক-কামরাযুক্ত বস্তির সংখ্যা কলিকাতায় শতকরা প্রায় ৯৪, হাওড়ায় ৯৮। বস্তির ভাড়াটেদের মধ্যে কলিকাতায় শতকরা ৩২জন অবাঙালী, হাওড়ায় শতকরা প্রায় ৮০জন অবাঙালী। হাওড়ার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মতো। কলিকাতার ভাড়াটে বস্তিবাসীর মাসিক আয় হাওড়ার তুলনায় প্রায় দেড়গুণ বেশী। কলিকাতার বস্তির শতকরা ৭৫টি ঘরের মেঝে পাকা বা সিমেণ্ট করা, হাওড়ার শতকরা মাত্র ৩৭টি ঘরের মেঝে পাকা। কলিকাতার বস্তির শতকরা প্রায় ৬১টিতে এবং হাওড়ার প্রায় ৮৪টিতে কোন জল সরবরাহের ব্যবস্থা নাই। কলিকাতার এক-একটি বস্তিতে গড়ে ৬·৩৮ গৃহ আছে এবং কামরা বা ঘর আছে ৫২·১২টি ; হাওড়ায় আছে ৫·৫৮ গৃহ এবং ৪৮·৭৫টি ঘর। কলিকাতায় বস্তির ভাড়াটেদের মধ্যে শতকরা ৯২জন একখানি ঘরে বাস করে, হাওড়ায় বাস করে শতকরা ৯৮জন। কলিকাতার বস্তির শতকরা ১৫·৫টি গৃহে স্বতন্ত্র রান্নার স্থান বা ঘর আছে, বাকি গৃহে বারান্দায় ও একমাত্র শয়নকক্ষেই রান্না করিতে হয়। হাওড়ার বস্তিতে শতকরা ৭৫টি গৃহে শয়নকক্ষ ও বারান্দা ভিন্ন অন্য কোথাও রান্নার কোন ব্যবস্থাই নাই।

প্রধানতঃ ভাত-রুটির ধান্দায় সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে শিল্পনগরে ও মহানগরে আসিয়া অধিকাংশ শ্রমজীবীকে কি শোচনীয় অবস্থায় দিন যাপন করিতে হইতেছে, তাহা কলিকাতা ও হাওড়া শহরের বস্তি দেখিয়া বুঝা যায়। শিল্পনগর গড়িয়া তোলার কোন সুনির্দিষ্ট

পূর্ব-পরিকল্পনা না থাকিলে, জনবসতির রূপ কত অবিন্যস্ত ও কুৎসিত হইতে পারে, হাওড়া তাহার দৃষ্টান্ত। হাওড়ার পৌর-প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে সচেতন হইয়া নানা উপায়ে উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। পূর্বের পুরাতন শিল্পনগর ও শহর বলিয়া হঠাৎ বা দ্রুত পথঘাটের ও বসতির বিন্যাস বদলাইয়া ফেলা সম্ভব নহে। কলিকাতায় 'ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট' এই উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু হাওড়ার আর্থিক সামর্থ্য অল্প এবং নানাবিধ বাধা আছে বলিয়া বেশী দ্রুত নগরের রূপ পরিবর্তন করা সম্ভব হইতেছে না। তবু গত দশ বৎসরের মধ্যে হাওড়ার নাগরিক রূপ অনেক বদলাইয়াছে, অনেক অনুন্নত অঞ্চলের উন্নতি হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে পৌর-প্রতিষ্ঠান, সরকার ও নাগরিকদেব সমবেত চেষ্টায় আরও অনেক দ্রুতগতিতে উন্নতি হইবে আশা কবা যায়।

আদর্শ শিল্পনগর চিত্তরঞ্জন

'চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওআর্ক্স'-এ যে শিল্পনগর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা যেমন সুপরিকল্পিত, তেমনই সুবিন্যস্ত ও সুন্দর। শিল্পনগরে যাহারা বাস করিবে তাহারা যে মানুষ, তাহাদের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তির উপরেই যে ভারতের শ্রেষ্ঠ রেল-ইঞ্জিন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গৌরব নির্ভর করিতেছে, সেই কথা মনে রাখিয়াই 'চিত্তরঞ্জন টাউন' গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কারখানা ও নগরের আয়তন প্রায় ৭ বর্গমাইল হইবে।

সুদক্ষ শ্রমিক, টেকনিসিয়ান ও কর্মচারীদের সকলের জন্য এবং সাধারণ মজুরদের প্রায় অর্ধেকের জন্য, চিত্তরঞ্জনে বাসগৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে। মোট প্রায় ৫০০০ কর্মীর জন্য ৫০০০ গৃহ আছে

চিত্তরঞ্জনে। বিভিন্ন ধরনের গৃহ আছে, ছোট ও বড় এবং নগরের মধ্যে স্বতন্ত্র অঞ্চলে সেগুলি নির্মিত। রাস্তাগুলি সুবিন্যস্ত, গলি-ঘুপ্‌চির কোন চিহ্ন নাই কোথাও। এ-অঞ্চলের অসমতল তরঙ্গায়িত ভূপৃষ্ঠের জন্য নগরটিকে ছোট ছোট স্বতন্ত্র বসতিকেন্দ্রে ভাগ করা হইয়াছে। কোন একটি-মাত্র মধ্যকেন্দ্রের উপর সমগ্র নগরটি ঝুঁকিয়া পড়ে নাই। বসতিকেন্দ্রগুলি এক-একটি আত্মনির্ভর পল্লীর মতো। প্রত্যেক কেন্দ্রের নিজস্ব দোকান-পাট বিভাগ, মাতৃসদন, স্কুল, খেলার মাঠ, ডিস্‌পেন্‌সারী, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বিভাগ ও আমোদ-প্রমোদের ইনস্টিটিউট আছে। প্রত্যেকটি বাসগৃহের জন্য বিদ্যুৎ, পরিশ্রুত পানীয় জল, স্নানাগার, রান্নাঘর, নালা-নদমা ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত আছে। জল সরবরাহের জন্য একটি কৃত্রিম হ্রদও রচনা করা হইয়াছে। ইহার পাশে হাওড়ার বস্তির কথা মনে হয়। 'কমিউনিটি হল', স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পার্ক, হাই-স্কুল, প্রাইমারী-স্কুল, এককথায় মানুষের সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনযাত্রার জন্য যাহা প্রয়োজন, সবই আছে চিত্তরঞ্জনে।

দামোদর পরিকল্পনা নির্মাণকেন্দ্র

দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পনার বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণকেন্দ্রেও ছোট ছোট বসতিকেন্দ্র ও নগর গড়িয়া উঠিতেছে। বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণের জন্য ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিসিয়ান ও অন্যান্য কর্মীদের যথাস্থানে থাকার প্রয়োজন। সেইজন্য দামোদর উপত্যকায় যেখানে যেখানে বাঁধ (dam) ও ব্যারেজ নির্মাণ করা হইতেছে, সেইসব অঞ্চলে নূতন বসতিও গড়িয়া উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সমতলভূমির অসুবিধার জন্য, কোন বাঁধ নির্মাণ করা হইতেছে না। দুইটি বাঁধ,

মাইথন ও পাঞ্চেৎ পাহাড়ের, পশ্চিমবঙ্গের সীমানার নিকটে। বর্ধমানের দুর্গাপুরে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করিয়া নাব্য খাল ও সেচের খাল কাটা হইতেছে। এইসব নির্মাণকেন্দ্রের বসতি, ঘরবাড়ী, পথঘাট, সেচ-বিভাগের আপিস, বাঁধের আপিস, বিদ্যুৎ-যন্ত্র ইত্যাদি মিলিয়া মনোরম ও পরিচ্ছন্ন এক-একটি ছোট নগরতুল্য অঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে। আশপাশের গ্রামগুলিরও অনেক উন্নতি হইতেছে, পথঘাটের উন্নতিই তাহার মধ্যে প্রধান

আধুনিক সমাজবিদ্‌রা যাহাকে জীববিজ্ঞান-সম্মত টেকনিক্যাল পরিকল্পনা (bio-technic) বলেন, অনেকটা সেই ধরনের পরিকল্পনা অনুযায়ী চিত্তরঞ্জন ও অন্যান্য নূতন শিল্পনগর নির্মাণ করা হইয়াছে। যে-কোন শহর নগর বা আদর্শ গ্রামের পরিকল্পনাই হোক না কেন, সেখানে যেহেতু মানুষ বাস করিবে, সেইজন্য তাহা অন্য কোন ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান-সম্মত হইবার আগে প্রথমে জীববিজ্ঞান-সম্মত হওয়া প্রয়োজন। মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও স্ফূর্তি যে-নগরের বসতি-বিন্যাস ও প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে ব্যাহত হয়, তাহা যত অট্টালিকা-বহুল বিরাট নগর হোক না কেন, আদর্শ নগর বা শহর তাহাকে বলা যায় না। ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে চিত্তরঞ্জনে মানুষের এই স্বাচ্ছন্দ্য ও স্ফূর্তির দিকে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখিয়া একটি আদর্শ শিল্পনগর গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সমাজে শিল্প-নগরের পরিকল্পনা কি প্রকার হইবে, তাহার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় চিত্তরঞ্জনে। ইহাকেই অবশ্য আধুনিক নগর-পরিকল্পনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলা যায় না, দিগ্‌দর্শন বলা যাইতে পারে।



ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রাম ও নগর

গ্রাম ও নগর সম্বন্ধে পূর্বে নানাবিষয় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। এইবাব আমরা কেবল গ্রাম ও নগর সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে আলোচনা করিব। গ্রাম কিভাবে গড়িয়া উঠে, কত প্রকারের গ্রাম আছে, তাহাদের জনবিন্যাস কি রকম? নগব কত প্রকারের আছে, কিভাবে সেগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে? একটি ও একাধিক গ্রাম কিভাবে ধীবে ধীরে নগরে পবিণত হয়, এবং কি কারণে হয়? গ্রাম্যসমাজ ও নাগরিক সমাজে পার্থক্য কি? এইসব আমাদের আলোচ্য বিষয়।

গ্রাম ও জনপদ-নিবেশ

কয়েকটি 'পরিবার' মিলিয়া যে-স্থানে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া 'স্থায়ীভাবে' বসবাস ও কাজকর্ম কবে, তাহাকে 'গ্রাম' বলে। পৃথিবীর সকল দেশের সর্বজাতির মানুষের যত প্রকারের স্থায়ী বসতি আছে, তাহার মধ্যে গ্রাম সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এমন দেশ ও এমন জাতি নাই, যেখানে বা যাহাদের গ্রাম নাই। জীবিকার দায়ে যাহারা যাযাবর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও যে স্থায়ী জনপদ গড়িবার আগ্রহ কত প্রবল, তাহা আমরা আন্দামানীদের ক্ষেত্রেও দেখিয়াছি। স্ত্রীপুত্র

লইয়া পরিবারবদ্ধ মানুষ মাত্রেই স্থায়ী গৃহে, একস্থানে, নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বসবাস করিতে চায়। ইয়োরোপের ও এশিয়ার অনেক অঞ্চলে মাটির তলায়, ৫,০০০ হইতে ১০,০০০ বৎসরের প্রাচীন গ্রামের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও সিন্ধু ও বেলুচিস্থানে (এখন পাকিস্থানে) ৭,০০০ হইতে ৮,০০০ বৎসরের প্রাচীন গ্রামের বাস্তুভিটা ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা মাটি খুঁড়িয়া পাইয়াছেন। গ্রাম যে কতকালের প্রাচীন জনবসতি তাহা এইসব ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে বুঝা যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রযুগের আগে পর্যন্ত গ্রামের গড়নের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। আজও আমাদের দেশে যেসব গ্রাম আছে তাহাদের গড়ন দেখিলে গ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। সাধারণতঃ দুই প্রকারেরই গ্রাম দেখা যায়ঃ

১। **সুসংবদ্ধ গ্রাম** (**Compact Village**)

২। **অসংবদ্ধ গ্রাম** (**Dispersed Village**)

'সুসংবদ্ধ' গ্রামের গৃহ-নিবেশ ঘন, স্বল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ। তাহা বৃত্তাকার, অর্ধ-বৃত্তাকার, রৈখিক (linear) বা কোন বিশেষ আকার-হীন সন্নিবেশ (agglomeration) মাত্র হইতে পারে। গ্রামদেবতার মন্দির, চলাচলের কোন বড় পথ অথবা কোন নদীর তীর, মাঠের মধ্যে গাছপালা ইত্যাদি একটা-কিছু কেন্দ্র (nucleus) করিয়া তাহার চারিদিকে এই গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। 'অসংবদ্ধ' গ্রামের গৃহগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট নহে, বিক্ষিপ্ত ও ছড়ানো। এক পরিবারের গৃহ হইতে আর-এক পরিবারের গৃহ বেশ দূরে।

এই প্রকার জনপদ-নিবেশের পার্থক্যের সঠিক কারণ কি বলা

যায় না। মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে 'সুসংবদ্ধ' গ্রাম কতকগুলি সুবিধা লাভের জন্য মানুষ গড়িয়া তুলিয়াছে। যেমন :

১। একত্রে সংঘবদ্ধ হইয়া থাকিলে শত্রু, চোর-ডাকাত, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সুবিধা হয়।

২। গ্রামের অধিকাংশ পরিবার আত্মীয়-স্বজন।

৩। একই কুলবৃত্তিজীবী লোকের বাস বেশী।

৪। সকলে মিলিয়া জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম পত্তন করা হইয়াছে।

'অসংবদ্ধ' গ্রাম এইসব কারণের অভাবে হয়ত গড়িয়া উঠিয়াছে। সংঘবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার তেমন সমস্যা বা প্রয়োজন নাই, গ্রামস্থ পরিবারের মধ্যে স্বজন-সম্পর্ক নাই, এক বর্ণ বা বৃত্তিজীবীর বাস অল্প, প্রত্যেক পরিবারের স্বাতন্ত্র্যবোধ সজাগ, এইরকম এক বা একাধিক কারণের জন্য 'অসংবদ্ধ গ্রাম' গড়িয়া উঠা সম্ভব হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রাম সাধারণতঃ বিশেষ আকারহীন (amorphous) কতকগুলি পরিবার-গৃহের সন্নিবেশ (agglomerated type)। তাহার নিকটে কোন নদী, বড় রাস্তা, কিছু গাছপালা বা কোন দেবতার মন্দির আছে। পূর্ববঙ্গের গ্রামের গৃহগুলি মাঠের মধ্যে ছড়ানো। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চলে গৃহনিবেশ ঘন ও সারিবদ্ধ বা রৈখিক। সাধারণতঃ নদীতীরেই এই ধরনের গ্রাম বেশী দেখা যায়। শ্রীহট্ট, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ জেলার ভাটি অঞ্চলে এই রেখাকার গৃহনিবেশ অধিকাংশ গ্রামের বৈশিষ্ট্য। বন্যা হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাঁশের শক্ত বেড়া দিয়া গ্রামগুলি ঘেরা থাকে। নদীতীরের (River-side village) ও পথপার্শ্বের (Road-side village) গ্রামেই বেশী রেখাকার গৃহনিবেশ দেখা যায়।

উড়িষ্যার অধিকাংশ গ্রাম পশ্চিমবঙ্গের মতো, কিন্তু পুরী, কটক প্রভৃতি অঞ্চলে রেখাকার গৃহনিবেশ দেখা যায় গ্রামে। রাস্তার দুই পাশে ঘন-সন্নিবিষ্ট প্রায়-সংলগ্ন গৃহের সারি এইসব অঞ্চলের গ্রামের বৈশিষ্ট্য। পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে কেরল প্রদেশের গ্রামের গৃহনিবেশ বিক্ষিপ্ত, প্রত্যেকটি গৃহ নিজস্ব উদ্যানের গাছপালার অন্তরালে ঢাকা। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার অঞ্চলের গ্রাম সুসংবদ্ধ, গৃহগুলি গুচ্ছবদ্ধ কিন্তু কোন বিশেষ-আকার অনুযায়ী বিন্যস্ত নহে। পূর্ব-ভারতে কাছাড় অঞ্চলে দেখা যায়, কাছাড়ী ও বর্মণদের গৃহগুলি অবিন্যস্ত আকারে গুচ্ছবদ্ধ, কিন্তু মণিপুরীদের গৃহনিবেশ রেখাকার।

গ্রামের প্রকারভেদ

সাধারণতঃ কৃষক-বহুল গ্রামের সংখ্যাই বেশী। গ্রামের মধ্যভাগে বাস্তুভূমি, চারিদিকে চাষের জমি, তাহার পরে গোচারণভূমি। ইহাই কৃষকদের গ্রামের সাধারণ গড়ন। গ্রামের মধ্যে অন্যান্য বৃত্তি-জীবীরও বাস আছে, যেমন কর্মকার, জেলে, নাপিত, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বৈদ্য, বৈশ্য বা বণিক ইত্যাদি। কিন্তু কৃষকদের সংখ্যাই গ্রামে সাধারণতঃ বেশী হইয়া থাকে।

চাষবাস প্রধান জীবিকা নহে এরকম একবর্ণ ও একবৃত্তির লোকের সংখ্যাও অনেক গ্রামে বেশী দেখা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে, মৌর্য যুগের কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থে, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদিতে এই রকম একবর্ণবহুল ও একবৃত্তিবহুল গ্রামের প্রচুর উল্লেখ আছে। যেমন ব্রাহ্মণগ্রাম, বৈশ্যগ্রাম, বৈদ্যগ্রাম, কুম্ভকার-গ্রাম, কর্মকারগ্রাম, তন্তুবায়গ্রাম, সূত্রধরগ্রাম ইত্যাদি। একাধিক কারণে এই ধরনের বর্ণ-বৃত্তি-প্রধান গ্রামের বিকাশ হইতে পারে ঃ

১। একই বৃহৎ বা গণ্ডগ্রামের বিভিন্ন বর্ণের ও বৃত্তির লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, এই ধরনের স্বতন্ত্র বর্ণ-বৃত্তিবহুল ছোট ছোট গ্রামে সেগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে পারে। বড় বড় গণ্ডগ্রামে দেখা যায়, বিভিন্ন বর্ণের ও বৃত্তির লোক স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস করে। এই স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংখ্যাধিক্য দেখা দিলে, দূরে সরিয়া গিয়া পৃথক গ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইতে পারে।

২। সমাজে বর্ণভেদ ও বৃত্তিভেদ প্রকট হইলে, স্থানীয় রাজা বা জমিদারের পোষকতায় এই ধরনের বর্ণ-বৃত্তিপ্রধান গ্রাম প্রতিষ্ঠা প্রচলিত হইতে পারে।

৩। বিশেষ কোন বৃত্তিজীবী জনগোষ্ঠী, যেমন কর্মকার কুম্ভকার তন্তুবায়, কাজকর্মের ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কোন বিশেষ অঞ্চলে, নদীতীরে বা বড় রাস্তার ধারে, অথবা বড় হাট বাজারের কাছে, বসতি স্থাপন করিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া হুগলি বর্ধমান বীরভূম প্রভৃতি জেলায় এই ধরনের বর্ণ-বৃত্তিবহুল গ্রাম অনেক আছে। বর্ধমানে 'শ্রীখণ্ড' বহু প্রাচীন বৈদ্য-প্রধান গ্রাম, 'কাঞ্চন-নগর' পূর্বে কর্মকার-প্রধান গ্রাম ছিল; বীরভূমের 'তাঁতিপাড়া,' হুগলির ধনেখালি, রাজবলহাট প্রভৃতি বিখ্যাত তন্তুবায়-প্রধান গ্রাম; হুগলির জীরাট-বলাগড় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম, গুপ্তিপাড়া বৈদ্যপ্রধান। এরকম আরও অনেক গ্রামের নাম করা যাইতে পারে, যেখানে একবর্ণের ও একবৃত্তির লোকের বাস বেশী।

গ্রামের ঘরবাড়ী

গ্রামের সাধারণ লোকের অধিকাংশ ঘরবাড়ী স্থানীয় উপাদানে তৈরী। বাঁশ, খড়, তালপাতা, নারকেলপাতা, হোগলা, কাঠ, মাটি

যেখানে যাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, প্রধানতঃ তাহাই গৃহ-নির্মাণের উপাদান। ইট-পাথরের একতালা, দোতালা বাড়ীও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের আছে, কিন্তু সাধারণ কৃষিজীবীদের গ্রামে তাহার সংখ্যা অল্প। তিন-চারতলা বড় বাড়ী গ্রামাঞ্চলে কদাচিৎ দেখা যায়, নাই বলিলেই হয়। তাহার প্রধান কারণ, গ্রামে জায়গা-জমির অভাব নাই, বড় শহরের মতো দুই-চার কাঠা জায়গার উপর বাড়ী করিয়া, উপরে চার-পাঁচতলা পর্যন্ত ঠেলিয়া তুলিবার দরকার হয় না। যাঁহারা ধনিক তাঁহারাও তাই গ্রামে বহু-তলা উঁচু বাড়ী নির্মাণ করেন না। প্রধানতঃ স্থান-সঙ্কটের জন্য নগরে ও মহানগরে অনেক তলা উঁচু বড় বড় বাড়ী গড়িয়া উঠিয়াছে, গ্রামে তাহা উঠে নাই। মানুষ সেখানে মাটি-গাছ-পালার কাছাকাছি বাস করে, ইঁট-পাথরের শূন্যে ঝুলিয়া থাকে না।

স্থানভেদে ও জলবায়ুভেদে বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য গৃহের গড়নের ভিন্নতা দেখা যায়। যে অঞ্চলে বেশী বৃষ্টি হয় সেখানে ঘরের চাল ঢালু (sloped) ও চারকোণা (rectangular), কারণ তাহাতে সহজেই বৃষ্টির জল ঝরিয়া পড়িয়া যায়, উপরে জমিয়া চালের ক্ষতি করিতে পারে না। শুক্‌না খট্‌খটে অঞ্চলে ঘরের চাল সটান সমান্তরাল বা 'ফ্লাট' (flat-roofed) হইলে ক্ষতি নাই। আমাদের দেশের নানা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, স্থানীয় জলবায়ুভেদে, গৃহের নানা-প্রকারের গড়ন দেখা যায়। যেমন :

পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের গ্রাম্য গৃহের গড়ন সাধারণতঃ ঢালু চালবিশিষ্ট (sloped roof) চারকোণা (rectangular)। পূর্ববঙ্গে বাঁশ চিরিয়া পাটি করিয়া বা বাতা করিয়া ঘরের চারিদিকের দেওয়াল দেওয়া হয়, তাহার উপর কোথাও মাটি লেপা থাকে, কোথাও খড়পাতা দিয়া ঢাকা থাকে। পশ্চিমবঙ্গে পুরু

মাটির দেওয়াল-দেওয়া খড়ের চালের ঘরই বেশী। ঘরের চাল খড় হোগ্‌লা বা অন্য কোন পাতা ঘাস দিয়া ছাওয়া। কোথাও কোথাও টিন, টালি বা খোলার চালও থাকে। চাল সবই প্রায় ঢালু ও চারকোণা। একচালা, দোচালা, চারচালা, আটচালা সবরকমের ঘর আছে। একচালা ঘর ছোট দোকানের জন্য, কামারশালা বা গোয়াল-ঘরের জন্য ব্যবহার করা হয়। দোচালা ঘর সাধারণতঃ দরিদ্র চাষীদেরই বেশী। চারচালা ও আটচালা ঘর অবস্থাপন্ন কৃষক ও গৃহস্থের বাসগৃহ। দোতলা, তেতলা মাটির ঘরও পশ্চিমবঙ্গে অনেক দেখা যায়। বীরভূম বাঁকুড়া বর্ধমান হুগলি প্রভৃতি জেলায় চারচালা ঘরের এক বিশিষ্ট রূপ দেখা যায়, যাহা অন্যত্র বিশেষ দেখা যায় না। চারটি চালই সম্মুখে বৃত্তাকারে বাঁকানো, চালের কোণগুলি ছুঁচালো, দেখিতে খুব সুন্দর। চালগুলি যদি পুরু করিয়া খড় দিয়া ছাওয়া থাকে (পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকাংশই তাই থাকে), দেখিতে আরও সুন্দর লাগে। এই ধরনের বাঁকানো চারচালা ঘর (curvilinear huts) পশ্চিম-বঙ্গের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ভারতের আর কোন প্রদেশে দেখা যায় না। এই ধরনের সুদৃশ্য বাঁকা চারচালা ও আটচালা ঘরের মতো করিয়া বাংলাদেশের সূত্রধর ও ঘরামিরা দেবতার মন্দিরও নির্মাণ করিয়াছেন দেখা যায়। লোকালয়ের আকারে দেবালয়ও গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাও বাংলাদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এরকম আকারের মানবগৃহ ও দেবগৃহ, ঘর ও মন্দির ভারতের আর অন্য কোন প্রদেশে কোথাও দেখা যায় না।

উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার। টালি ও খোলার চালের ঘর, মাটির দেয়াল, কিন্তু চাল সবই ঢালু ও চারকোণা। উত্তর-

প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অল্প হয় বলিয়া ঘরের চাল 'ফ্ল্যাট' আকারের হইয়া থাকে।

পাঞ্জাব। কাঙড়া অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী হয় বলিয়া ঘরের চাল চারকোণা ও ঢালু। অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টি কম, সেখানে চাল সটান ও সমতল।

বোম্বাই। দক্ষিণ বোম্বাইতে, বেলগাঁও বিজাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বৃষ্টি কম, চাল ফ্ল্যাট আকারের, দেয়াল মাটির ও স্থানীয় পাথরের। গুজরাটের গৃহের চাল ঢালু ও চারকোণা, এবং টালির চালই বেশী।

দক্ষিণ ভারত। অন্ধ্র ও দ্রাবিড়দেশে ঘরের চাল ঢালু ও চারকোণা, দুইতিন থাক্ খোলা দিয়া ছাওয়া, চালের উপর মধ্যে মধ্যে সিমেণ্ট-করা নালি (spine) আছে। দেয়াল মাটির, কোথাও বাঁশ ও কাঠের বেড়ার উপর মাটি লেপা।

এইসব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামের ঘরবাড়ীর গড়ন অনেকটা আঞ্চলিক জলবায়ু এবং স্থানীয় উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে। বাংলাদেশে গ্রাম্য মাটির ঘরের যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহা আর কোন অঞ্চলে দেখা যায় না। চারকোণা ঢালু-চালের ঘরেরও স্থান-বিশেষে গড়নের পার্থক্য আছে, যেমন বীরভূম-বর্ধমানে একরকম, আবার মেদিনীপুর, নদীয়া-চব্বিশ-পরগণায় অন্যরকম। বাংলায় সূত্রধর ও ঘরামিরাই গ্রামের স্থপতি, তাঁহাদের শিল্পরুচিবোধও বেশ সজাগ।

গ্রাম্যসমাজের রূপ

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থে 'জনপদ-নিবেশ' অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে নূতন কোন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, অন্ততঃ ১০০

হইতে ৫০০ কৃষক-পরিবারের বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বুঝা যায়, কৃষকরাই গ্রাম্যসমাজের মেরুদণ্ড। কৃষকরা ছাড়া, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, কারুবর্গ, শিল্পী, পশুচিকিৎসক, গ্রামাধ্যক্ষ ও গ্রাম্য কর্মচারীরাও গ্রামে বাস করিতেন। 'গ্রামিক' ও অন্যান্য কর্মচারীদের জমি দেওয়া হইত, তাঁহারা যাবজ্জীবন তাহা ভোগ করিতেন। গ্রামবাসীরা গ্রামের কাজকর্ম নিজেরাই করিতেন। মন্দির দেবালয়, সাধারণের পূজাস্থান ও বৃক্ষাদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকিত গ্রামবাসীর উপর। বাস্তু জমির সীমা বা অন্য কোন কারণে বিবাদ হইলে গ্রামবৃদ্ধরা ও মণ্ডলরা তাহার বিচার করিতেন। নাবালকদের দেখাশুনার ভারও গ্রামবৃদ্ধদের উপর থাকিত। গ্রামের কৃষক ও কারুবর্গ ঠিকভাবে যে যাহার নির্দিষ্ট কাজ না করিলে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত এবং সেই টাকা গ্রামের হিসাবে জমা হইত। গ্রামে কোন দেবালয় নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, যাত্রা-থিয়েটার ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদ বা অন্য কোন জনকল্যাণকর কাজে প্রত্যেক গ্রামবাসীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইত। যদি কেহ তাহা করিতে অনিচ্ছুক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া হইত।

জনপদ-নিবেশ প্রসঙ্গে কৌটিল্য বলিয়াছেন যে গ্রামের জন-কল্যাণকর কাজে কেহ সাহায্য না করিলে, তাঁহাকে ভৃত্য গরুবলদ ইত্যাদি প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হইত। ব্যয়ের ভাগ তাঁহাকে বহন করিতে হইত, কিন্তু অসহযোগিতার শাস্তি স্বরূপ লাভের ভাগ তিনি পাইতেন না। আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে যিনি অসহযোগিতা করিতেন, তাঁহাকে তাহা দেখিতে বা শুনিতে দেওয়া হইত না এবং গোপনে যদি তিনি তাহা দেখিতেন বা শুনিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে দ্বিগুণ অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য করা হইত।

পরবর্তীকালে কিছুটা শিথিল হইয়া গেলেও, সেই মৌর্য যুগ ও তাহারও আগে হইতে, আমাদের দেশের গ্রাম্যসমাজের এই গড়ন ছিল এবং সমাজ-বন্ধনও অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তাহার প্রধান ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক সহযোগিতা (Economic co-operation)। বিভিন্ন বর্ণের লোক বিভিন্ন কর্ম করিত। কৃষকরা চাষবাস করিত, কারিগররা (তন্তুবায়, কর্মকার, সূত্রধর, কংসকার, চর্মকার প্রভৃতি) নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করিত। যাহারা খাদ্য বা পণ্য উৎপাদনে (Production) প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিত না, রজক-পরামাণিক হইতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বৈদ্য ও অন্যান্য গ্রাম্য কর্মচারী পর্যন্ত, তাহারা সকলে বৃত্তিরূপে জমি ভোগ করিত। বর্ণবিভাগ কতকটা শ্রম-বিভাগের (Division of Labour) মতো পরস্পরের সহযোগিতায় অর্থনৈতিক উৎপাদনে সাহায্য করিত। উৎপন্ন দ্রব্য আদান-প্রদান করিয়া সকলের প্রয়োজন মিটিত। সামাজিক কাজকর্ম (Social Service) যাঁহারা করিতেন, গুরু পুরোহিত, ডাক্তার বৈদ্য ইত্যাদি, তাঁহারা অধিকাংশই জমি বৃত্তি পাইতেন, অথবা উৎপন্ন ফসল ও অন্যান্য জিনিস দিয়া গ্রামবাসীরা তাঁহাদের কাজ আদায় করিতেন। পাঠশালার গুরুমহাশয় তাঁহার পড়ুয়াদের নিকট হইতে ধানচাল, আলু বেগুন, পূজাপার্বণে কাপড় চটি ইত্যাদি সবই পাইতেন। এরকম আরও যাঁহারা সামাজিক কাজকর্ম করিতেন, তাঁহারা কাজের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্র পাইতেন। যে যাহার নির্দিষ্ট কাজ করিত, সকলের সব প্রয়োজন মিটিত, কাহারও কোন অসুবিধা হইত না, গ্রাম্যসমাজের বাহিরে কোন প্রয়োজন মিটাইতে যাইতে হইত না, বা কাহারও উপর নির্ভর করিতে হইত না।

এই 'স্বয়ং-সম্পূর্ণতা' বা 'আত্মনির্ভরতা' (self-sufficiency) আমাদের গ্রাম্যসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য বাহিরের কোন আঘাত তাহার ভিত টলাইতে পারে নাই। দেশের রাজারা যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন, রাজসিংহাসন দখল করিয়াছেন, অত্যাচার অবিচারও কম করেন নাই, কিন্তু সমস্ত আঘাত সহ্য করিয়া গ্রাম্যসমাজ পর্বতের মতো অচল অটল রূপে দাঁড়াইয়া ছিল। এই স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দোষগুণ দুই-আছে। গুণের কথা বলা হইয়াছে। দোষের মধ্যে প্রধান হইল, এই ধরনের গ্রাম্যসমাজে দীর্ঘকাল বাস করিলে মানুষ কূপমণ্ডূক হইয়া উঠে, বাহিরের ভাল কোন কিছুর দিকে চাহিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং চরিত্রে গোঁড়ামি দেখা দেয়। নূতন কোন কাজ শিখিবার বা করিবার উৎসাহ থাকে না, এবং চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। পরিবর্তনবিমুখ এই ধরনের স্থিতিশীল গ্রাম্যসমাজের অগ্রগতির পথেও অনেক বাধা থাকে।

ব্রিটিশ আমলে নূতন ভূমিব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থার ফলে এই গ্রাম্যসমাজের গড়ন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। তাহার আত্মনির্ভরতা নষ্ট হইয়া যায়। রেলপথের যোগাযোগ স্থাপনের পর হইতে এই ভাঙ্গনের গতি আরও দ্রুত হইতে থাকে। বাহিরের নাগরিক সমাজের ও বৃহত্তর জন-সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া, গ্রাম্যসমাজের কূপমণ্ডূকতা কাটিয়া যাইতে থাকে। প্রথমে রেলপথের কাছাকাছি গ্রামগুলির পরিবর্তন হইতে থাকে, দূরের গ্রামের সহজে হয় না। দূর বলিতে পথের দূরত্ব নহে, যানবাহনের দূরত্ব বুঝিতে হইবে। কলিকাতা শহর হইতে ১০০ মাইল দূরে অনেক গ্রাম আছে যাহার উপর শহুরে সমাজের প্রবল প্রভাব পড়িয়াছে, কিন্তু কলিকাতার

২৫-৩০ মাইলের মধ্যে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে বিশেষ কোন প্রভাব পড়ে নাই। তাহার কারণ, একশত মাইল দূরের গ্রামে রেলপথের ও মোটরপথের পরিবহন-ব্যবস্থা আছে, শহরের কাছের গ্রামে তাহা হয়ত নাই। রেলপথ ছাড়াও, সম্প্রতি মোটরপথের যেভাবে বিস্তার হইতেছে, তাহাতে গ্রাম ও নগরের ব্যবধান খুব বেশী থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। গ্রামীণ সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতির উপর শহরের প্রভাব আরও দ্রুত ও অধিক পরিমাণে পড়িবে।

গ্রাম্য মেলা

গ্রাম্যসমাজে যে সব খাদ্যদ্রব্য বা জিনিসপত্র উৎপন্ন হয় তাহা সবই যে গ্রামের প্রয়োজনে লাগিবে এমন কোন কথা নাই। বিশেষ করিয়া থালা-বাসন, কাপড়-চোপড়, ঝুড়ি-ঝাঁপি, ছুরি-বটি, দা-কুড়াল, হাড়িকুঁড়ি, মাটির পুতুল খেলনা ইত্যাদি যাহা গ্রামের কারিগর-শিল্পীরা তৈরী করে, তাহা গ্রামের লোকের নিত্য প্রয়োজনে লাগে না এবং গ্রামে তাহা সম্পূর্ণ ব্যবহার করাও যায় না। উদ্বৃত্ত জিনিসপত্র বাহিরের লোকের নিকট বেচিবার প্রয়োজন হয়। গ্রামের তাঁতি কামার কুমার কাঁসারি, তাহাদের জিনিসপত্র মাথায় করিয়া গ্রামে গ্রামে ফিরি করিয়া বেড়ায় এবং নিজেদের গ্রামের হাট ছাড়াও, পাশাপাশি আরও অনেক গ্রামের হাটে যায়। ফিরি করা ও হাটে যাওয়া ছাড়াও আরও একটি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থা হইল মেলার (Fair) ব্যবস্থা।

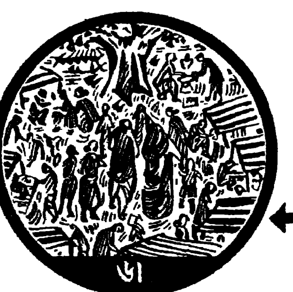
ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, প্রত্যেক প্রদেশে নানা স্থানে, কোন পূজাপার্বণ, শুভ দিনক্ষণ ও উৎসব উপলক্ষে মেলা বসার রীতি আছে। এইসব মেলায় বহু জিনিসপত্রের

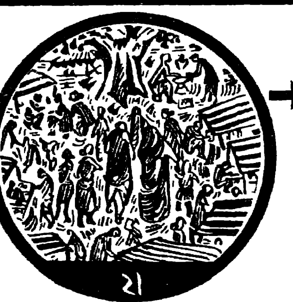
আমদানি হয় এবং তাহার আদান-প্রদান ও কেনাবেচাও হয়। ছোট বড় মাঝারি, জনসমাবেশ অনুপাতে, নানারকমের মেলা হয়। সব মেলাতে সকল রকমের জিনিসের আমদানি হয় না। কলিকাতা শহরের মধ্যেই রথযাত্রার সময় আষাঢ় মাসে যে বিরাট মেলা বসে, তাহাতে নানারকমের গাছপালা ও পাখির আমদানি হয়। কলিকাতাবাসী অনেকে তাঁহাদের বাড়ীর বাগানের জন্য গাছপালা কেনেন এবং সখ করিয়া পুষিবার জন্য পাখি কেনেন বলিয়া কলিকাতার মেলায় এত গাছ ও পাখির আমদানি হয়। বরিশাল জেলার বাউফল থানার অন্তর্গত কালিশুঁড়ির মেলায় ঘোড়া গরু মহিষ, নানা আকারের শত শত নৌকা বিক্রয়ের জন্য আমদানি হয়। বীরভূমের জয়দেব-কেঁদুলি গ্রামের মেলা বহুকালের প্রাচীন। পৌষ সংক্রান্তির দিন হইতে মেলা বসে, আশপাশের ও বহু দূরের গ্রাম হইতে মেলায় জিনিসপত্রের ও লোকজনের আমদানি হয়। কেঁদুলির মেলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল, বাংলাদেশের হাজার হাজার বৈষ্ণব ও বাউলদের সমাবেশ। মেলার দুইতিন দিন তাহারা দিনরাত বাউল গান গাহিয়া, একতারা বাজাইয়া, নৃত্য করিয়া কাটাইয়া দেয়। এরকম আরও অনেক মেলা বসে নানা অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে। মেলাগুলিতে যে কেবল জিনিসপত্র কেনাবেচা হয় তাহা নহে। সামাজিক মেলামেশা, সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানও মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এক-একটি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মেলাগুলি এমন সময়ে বসে যে এক মেলা হইতে অন্য মেলায় গ্রামের কারিগর-শিল্পীরা স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে এবং সেই অঞ্চলের একাধিক মেলায় ঘুরিয়া, জিনিসপত্র কেনাবেচা করিয়া, কিছুদিন পরে গৃহে ফিরিয়া যাইতে










মেলার আবর্তন
১। পৌষ-সংক্রান্তির মেলা ২। শ্রী পঞ্চমীর মেলা
৩। দোলের মেলা ৪। চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা
৫। রথের মেলা ৬। কালীপূজার মেলা
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

পারে। কোন অসুবিধা হয় না। আমাদের দেশে বার মাসে তের পার্বণ তো লাগিয়াই আছে, সুতরাং মেলা বসিবার উপলক্ষের অভাব হয় না। ছোট ছোট মেলার মধ্যে বড় উৎসব উপলক্ষে বড় বড় মেলা হয়। পৌষ-সংক্রান্তির মেলার পরে শ্রীপঞ্চমীর মেলা, তারপর ছোটখাট দুই একটি মেলা, তারপর আবার ফাল্গুনের দোলযাত্রার মেলার পরে কয়েকটি ছোট মেলা (কোন পরিবারের উৎসব উপলক্ষেও হইতে পারে), তারপর আবার চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা (কলিকাতাতেও পদ্মপুকুর অঞ্চলে হয়), এইভাবে যেন মেলার মালা গাঁথা থাকে। বিক্রেতাদের পক্ষে মেলা হইতে মেলান্তরে ভ্রমণের কোন অসুবিধা হয় না। মালপত্র লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া, বেচাকেনার পর্ব সারিয়া, নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরিয়া আসা যায়।

যানবাহনের ও পথঘাটের বিস্তারের জন্য, দোকানপাট ও হাট-বাজারের উন্নতির জন্য, মেলাগুলিও ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। বিক্রেতাদের পক্ষে মেলায় যাওয়া ক্রমেই ঝঞ্ঝাট ও লোকসানের ব্যপার হইয়া উঠিতেছে। ক্রেতারা বা সাধারণ লোক ক্রমেই যদি হাটবাজারের ও দোকানের কেনাকাটায় (shopping) অভ্যস্ত হইয়া উঠে, দোকানে বাজারে যদি সবরকমের জিনিসপত্র সর্বদাই পাওয়া যায়, তাহা হইলে মেলা বসার আর বিশেষ কোন সার্থকতা থাকে না। এসব ছাড়াও, ক্রমেই গ্রাম্য মেলার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে শহর-নগরের **প্রদর্শনী** (Exhibition)। গ্রামাঞ্চলেও সরকারী প্রচেষ্টায় মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীও এক-রকমের মেলা, কিন্তু তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বেশী। গ্রাম্য মেলার স্বাভাবিক উৎসাহ বা স্ফূর্তি তাহার মধ্যে থাকে না। কিন্তু ক্রমে যেরকম নাগরিক কায়দায় প্রদর্শনীর রেওয়াজ বাড়িতেছে, তাহাতে

মনে হয়, গ্রাম্য মেলার পরমায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। যন্ত্রোৎপন্ন নানাবিধ কৃত্রিম পণ্যের পসরায় যেভাবে গ্রাম্য মেলা ভরিয়া যায় আজকাল, তাহাতে গ্রাম্য কারিগর-শিল্পীদের হাতের তৈরী জিনিস-পত্রের কদর ও মূল্য কিছুই থাকে না। গ্রামের লোকও কৃত্রিম পণ্যের বাহিরের চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাই বেশী কেনাকাটা করে, মাটির পুতুল ছাড়িয়া প্ল্যাস্টিকের পুতুল, তাঁতের কাপড়ের বদলে মিলের কাপড়, কাঁসা-পিতল, কাঠ-মাটির বাসন-কোসন পাত্রের বদলে এনামেলের ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসন ইত্যাদি মেলায় বেশী বিক্রয় হয়। তাহাতে গ্রাম্য কারিগরদের ক্ষতি হইতেছে। মেলায় 'সিনেমা' পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং বাউল গান, পাঁচালি যাত্রা কবি-গান, এসব আর মেলায় চলিবে না। গ্রামের লোক ভিড় করিয়া সিনেমা দেখিতে যাইতেছে। মেলার এই অবনতির জন্য গ্রামীণ সমাজ ও গ্রামীণ সংস্কৃতি, দুইয়েরই ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে।

নগর কাহাকে বলে ?

নগর সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে তাহার সংজ্ঞা ঠিক করা উচিত। 'নগর' বা 'শহর' বলিতে প্রথমেই আমাদের মনে হয় লোক-সংখ্যার ও লোকবসতির আধিক্যের কথা। বহু লোকের ঘরবাড়ী যেখানে আছে এবং যেখানে ভিড় করিয়া তাহারা বাস করে, তাহাকে নগর ও শহর বলে। নগর সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে জাগে। নগরের লোক চাষবাস করিয়া জীবন ধারণ করে না। চাষবাস বা কৃষিকর্ম ছাড়া অন্যান্য বহু রকমের কাজকর্ম করিয়া, ব্যবসাবাণিজ্য চাকরি-বাকরি ইত্যাদি, নগরের অধিকাংশ লোক জীবন ধারণ করে। নগরের ইহাও প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'নগর' ও 'শহর' কথা দুইটি আমরা

অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু এখানে বৃহৎ নগর অর্থে 'মহানগর' বা 'শহর' (ইংরেজী City) এবং ছোট নগর অর্থে (ইংরেজী Town) কেবল 'নগর' কথা ব্যবহার করা হইবে।

লোকগণনা ও অন্যান্য সরকারী কাজকর্মের জন্য গবর্ণমেণ্ট নগর ও শহরের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন এইভাবে :

ক। লোকসংখ্যা যাই হোক, যেখানে স্বতন্ত্র 'মিউনিসিপ্যালিটি' বা 'পৌর-প্রতিষ্ঠান' আছে, তাহাকে 'নগর' বলা হয়।

খ। পৌর-প্রতিষ্ঠান না থাকিলে, নগরে অন্ততঃ ৫,০০০ লোকের বাস থাকিতে হইবে এবং বসতির ঘনতাও কমপক্ষে প্রতি বর্গমাইলে ১০০০ জন হইতে হইবে।

গ। রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য নগরের খানিকটা অন্ততঃ গুরুত্ব থাকা প্রয়োজন।

ঘ। নগরের পুরুষ অধিবাসীদের চারজনের মধ্যে অন্ততঃ তিনজনের কৃষি ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তিজীবী হইতে হইবে।

ঙ। এইসব বৈশিষ্ট্য-সহ লোকসংখ্যা কমপক্ষে ১,০০,০০০ হইলে, তবে তাহা 'মহানগর' বা 'শহর' হইবে।

এই সংজ্ঞা অনুসারে এবং লোকসংখ্যা অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গের শহর ও নগরগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে এইভাবে ভাগ করা হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণী	:	শহর	:	লোকসংখ্যা ১,০০,০০০+
দ্বিতীয় শ্রেণী	:	নগর	:	লোকসংখ্যা ৫০,০০০-১,০০,০০০
তৃতীয় শ্রেণী	:	নগর	:	লোকসংখ্যা ২০,০০০-৫০,০০০
চতুর্থ শ্রেণী	:	নগর	:	লোকসংখ্যা ১০,০০০-২০,০০০
পঞ্চম শ্রেণী	:	নগর	:	লোকসংখ্যা ৫,০০০-১০,০০০
ষষ্ঠ শ্রেণী	:	নগর	:	লোকসংখ্যা ৫,০০০+

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শহর ও নগরের সংখ্যাবৃদ্ধির হার এই ঃ

শহর ও নগর	১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১
প্রথম শ্রেণী	৭	৩	২	২	২	২
দ্বিতীয় শ্রেণী	১৪	১০	২	৪	২	×
তৃতীয় শ্রেণী	২৭	২৮	২১	২৩	১৯	১৫
চতুর্থ শ্রেণী	৪০	২৭	২৭	২১	২৫	২৮
পঞ্চম শ্রেণী	১৬	২১	২৪	২৭	২১	২১
ষষ্ঠ শ্রেণী	১১	১০	১৪	৮	৮	৮
মোট	১১৪	৯৯	৯০	৮৫	৭৭	৭৪

১৯৪১ সালে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি মাত্র শহর ছিল, তাহার আগে ছিল দুইটী। ১৯৪১ সালে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য 'ভাটপাড়া' তৃতীয় শহর বলিয়া গণ্য হয়। ১৯৫১ সালে টালিগঞ্জ, গার্ডেনরীচ, দক্ষিণ শহরতলী (২৪-পরগণা) ও খড়্গপুর (মেদিনীপুর) সংখ্যাধিক্যের জন্য শহর-শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। লক্ষণীয় হইল, শহর বলিয়া যে-সব অঞ্চল গণ্য হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ কলিকাতার শহরতলী অঞ্চল, বৃহত্তর কলিকাতার (Greater Calcutta) সীমানাভুক্ত। অর্থাৎ কলিকাতার কলেবর অত্যধিক স্ফীত হইতেছে এবং দ্রুত বর্ধমান জন-সংখ্যার চাপে চারিদিকে তাহা শাখাবিস্তার করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহাই নগর ও শহরের ক্রমবিকাশের ধারা।

নগর-শহরের প্রকারভেদ

জনসংখ্যানুপাতে নগরের শ্রেণীভেদ হয়। নগর-প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব অনুযায়ী নগরের প্রকারভেদ হইতে পারে।

সমাজবিদ্ ও ভূবিদ্‌রা নগরের প্রাকৃতিক কেন্দ্রভেদে এইভাবে তাহার প্রকার-ভেদ-করিয়াছেন :

১। **সমভূমির নগর** (Plain Town)। সমভূমিতে এইসব নগর নানা কারণে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য, রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার জন্য, শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য, অথবা অন্য যে-কোন সুযোগ-সুবিধার জন্য এই প্রকাব নগব গডিয়া উঠিতে পারে।

২। **নদীতীরের নগর** (River Town)। নদীতীরেও বন্দর-নগব (Port Town) গডিয়া উঠিতে পারে, সমুদ্র-তীরের বন্দর-নগরের মতো। ব্যবসা-বাণিজ্যের বড কেন্দ্র রূপে এইসব নগর গড়িয়া উঠে।

৩। **পার্বত্য নগর** (Hill Town)। পাহাড-পর্বতে নগর স্থাপিত হইতে পারে, ব্যবসায়েব জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য।

৪। **স্বাস্থ্য-নগর** (Resort Town)। স্বাস্থ্যকর স্থানে লোকে হাওয়া-বদলের জন্য মধ্যে মধ্যে যাইতে পাবে এবং এরকম স্থানে লোক-বসতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যেব বিস্তার হইলে একটি নগরও ধীরে ধীবে গড়িয়া উঠিতে পারে।

৫। **তীর্থ-নগর** (Religious Town)। কোন প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে জন-সমাগম হইতে থাকে, লোকবসতিও বাড়ে। দোকানপাট ব্যবসা-বাণিজ্যেরও বিস্তার হয় এবং ক্রমে সেখানে একটি নগর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে।

কাল-ভেদেও নগরের বিভাগ করা যাইতে পারে, যেমন ঃ

প্রাগৈতিহাসিক যুগের নগর :	মহেঞ্জদাডো, হডপ্পা।
প্রাচীন যুগের নগর :	তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, তাম্রলিপ্ত (তমলুক), গৌড় ইত্যাদি।
মধ্যযুগেব নগর :	দিল্লী, আগ্রা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, সপ্তগ্রাম ইত্যাদি।
আধুনিক যুগের নগর-শহর :	কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি।

কালভেদে নগর-নিবেশের (Town-planning) অনেক পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া, নগরের স্থান-বিভাগের মতো এই কাল-বিভাগেরও সার্থকতা আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগরে ঘরবাড়ী ও পথঘাটের বিন্যাস অন্যরকম ছিল, আধুনিক যুগের কোন নগরের সহিত তাহার তুলনা হয় না। নগরের মধ্যে রাজা-বাদ্‌শাহের প্রাসাদের প্রতিপত্তি ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী এবং পথঘাট অধিকাংশই ছিল সঙ্কীর্ণ ও আঁকাবাঁকা অলিগলির মতো। এক-এক শ্রেণীর কারিগর-শিল্পীরা নগরের এক-এক অঞ্চলে বাস করিত। ঘরবাড়ী অধিকাংশই ছিল প্রাচীরঘেরা এবং দরজা-জানালা ছিল নীচু ও ছোট ছোট। অর্থাৎ মধ্যযুগের সামাজিক জীবনের গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা, বর্ণ-জাতিভেদ ইত্যাদি নগর-নিবেশের মধ্যেও প্রতিফলিত হইত। পুরাতন দিল্লী, আগ্রা অথবা পশ্চিমবঙ্গের গৌড়, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের নগর দেখিলে আজও তাহার সমস্ত বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক যুগের নগর-শহরের ঘরবাড়ী ও পথ-ঘাটের বিন্যাস মুক্ত ও প্রশস্ত, নাগরিকদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার ব্যবস্থাদিও অনেক উন্নত। নবযুগের মানুষেব মুক্ত উদার মন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিচ্ছবি আধুনিক নগর ও শহর।

স্থান ও কালভেদে যেমন নগর-বিভাগ করা যায়, তেমনই নগরের প্রধান ক্রিয়াকর্ম (function) অনুযায়ীও নগব-বিভাগ করা যাইতে পারে। নগরবিদ্‌রা প্রধান কর্মভেদে মোটামুটি ছয়টি শ্রেণীতে নগর-বিভাগ করিয়াছেন :

১। শাসন-পরিচালনাকেন্দ্র (Administrative)
২। দেশরক্ষার হেড-কোয়ার্টার (Defence)
৩। সংস্কৃতিকেন্দ্র (Culture)

৪। উৎপাদনকেন্দ্র (Production)

৫। আরাম-বিরামকেন্দ্র (Recreation)

৬। যানবাহনকেন্দ্র (Communications)

দেশ-শাসনকেন্দ্রে, দেশরক্ষাকেন্দ্রে, শিক্ষা-সংস্কৃতিকেন্দ্রে, শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদনকেন্দ্রে, বিরামকেন্দ্রে ও যানবাহনকেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকারের নগরের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ হইতে পারে।

নগরের ক্রমবিকাশের-ধারা

একেবারে নূতন কোন স্থানে, কোন শিল্পকারখানা, বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগার ইত্যাদি কেন্দ্র করিয়া নগর গড়িয়া তোলা যায় এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহা নিখুঁতভাবেও গড়া যাইতে পারে। আধুনিক কালে নূতন শিল্পনগর বা শিক্ষানগর এইভাবেই গড়া হইয়া থাকে। এইসব স্থানে, বিভিন্ন পর্বে, ধীরে ধীরে নগরের বিকাশ হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে, সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে, যত দ্রুত সম্ভব, পরিপূর্ণ নগর গড়িয়া তোলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ নগর ও শহর যাহা আমরা দেখিতে পাই, তাহা বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সমাজবিদ্‌রা নগরের বিকাশের এই ধারা লক্ষ্য করিয়া তাহার ক্রম (sequence) নির্ণয় করিয়াছেন।

নগরের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার, জীব-জগতের ক্রমবিকাশের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। নগরের বিকাশ জৈবিক বা প্রাকৃতিক বিকাশ নহে, কৃত্রিম বিকাশ (artificial growth)। ক্রমে ডালপালা বিস্তার করিয়া বড় গাছের মতো নগরের বিকাশ হইতে থাকে। মানুষের মতো তাহার শৈশবকাল,

বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবনকাল থাকিতে পারে, কিন্তু কোন ঐতিহাসিক বা নৈসর্গিক বিপর্যয় ভিন্ন বৃদ্ধির দিক হইতে তাহার বাধক্য বা লয়-মৃত্যু হইতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে সমাজবিদ্‌রা নগরের বিকাশের ক্রম বা পর্ব এইভাবে নির্ণয় করিয়াছেন :

শিশু নগর (Infantile Town)। দোকানপাট, ঘরবাড়ী, পথঘাট সব অবিন্যস্ত থাকে। শিল্পবাণিজ্যেরও প্রতিষ্ঠা বিশেষ হয় না।

বালক নগর (Juvenile Town)। ঘরবাড়ী, দোকানপাটের প্রাথমিক বিন্যাস আরম্ভ হয়।

কিশোর নগর (Adolescent Town)। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিকাশ হয়, কিন্তু তাহা ছড়ানো থাকে। প্রথম শ্রেণীর ভাল ঘববাড়ীর আঞ্চলিক বিন্যাস তখনও হয় না।

যুবক নগর (Early Mature Town)। প্রথম শ্রেণীর ঘরবাড়ীর বিন্যাস হয় পৃথক অঞ্চলে।

পূর্ণযুবক নগর (Mature Town)। বাণিজ্য ও শিল্পের কেন্দ্র, চারি শ্রেণীর গৃহের বিন্যাস (প্রাসাদ-অট্টালিকা হইতে বস্তি পর্যন্ত), সব পৃথক অঞ্চলে গড়িয়া উঠে।

স্তর হিসাবে ভাগ করিলে বড় 'শহরে'র ক্রমবিকাশ সাতটি স্তরে এইভাবে ভাগ করা যায় ঃ

প্রথম স্তর। কয়েকটি গ্রাম আত্মসাৎ করিয়া শহরের গোড়াপত্তন হয়। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পথঘাটের পরিকল্পিত বিন্যাসও মোটামুটি হইয়া যায়।

দ্বিতীয় স্তর। যানবাহনের বিস্তার ও রেলপথের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে থাকে।

তৃতীয় স্তর। পাশাপাশি গ্রাম শহরের সীমানাভুক্ত হইতে থাকে; পৌর-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

চতুর্থ স্তর। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি-বিন্যাস আরম্ভ হয়। সুপরিচ্ছন্ন বসতিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে থাকে।

পঞ্চম স্তর। যানবাহন বা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তাঘাটে নূতন নিশানা, সেতু, বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়।

ষষ্ঠস্তর। পাশাপাশি গ্রামাঞ্চল আত্মসাৎ করিয়া শহর যত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকে, তত নাগরিক অঞ্চল ও ওআর্ডের সংখ্যা বাড়ে, পৌরপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বাড়ে এবং নূতন নূতন পৌরশাসনের আইনকানুন হয়।

সপ্তম স্তর। বিভিন্ন বড় নাগরিক জিলায় শহর ভাগ হইয়া যায়, পৌরশাসনের নানারকম জটিলতা ও সমস্যা দেখা দেয়। শহরের সুশাসন ও নাগরিক ব্যবস্থাদির সুপরিচালনা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে বলা যায়।

নগর ও শহরের ক্রমবিকাশের এই কাল-বিভাগ ও স্তর-বিভাগ সমাজবিদ্‌রা মোটামুটিভাবে করিয়াছেন। সাধারণতঃ এইভাবেই নগরের ও বড় শহরের বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়া থাকে। পর্ব হইতে পর্বান্তরে, অথবা স্তর হইতে স্তরান্তরে উন্নতি সব সময় এই লক্ষণ অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে না হইতেও পারে। দুই এক ধাপ অতিক্রম করিয়া, স্থানীয় বিশেষ কারণের জন্য, কোন নগরের বা শহরের দ্রুত উন্নতিও হইতে পারে। আবার কোন নগর একটি স্তরেই দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও, সাধারণতঃ নগর ও শহরের ক্রমবিকাশ এইভাবেই হইয়া থাকে। কলিকাতা শহরের ক্রমবিকাশের স্তরগুলির সহিত ইহার অনেকটা মিল আছে দেখা যায়। পরে তাহা আলোচনা করা হইয়াছে।

কলিকাতা শহরের ক্রমবিকাশ

কলিকাতা শহরের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বড় বই লেখা যায়। কলিকাতা শহরের বয়স ২৫০ বৎসরেরও বেশী। চারটি শতাব্দী ধরিয়া—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত—কলিকাতা মহানগর ধীরেসুস্থে বিকাশ লাভ করিয়াছে। সংক্ষেপে আমরা সেই বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিব। পূর্বে নগর-শহরের বৃদ্ধি ও বিকাশের যে বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সহিত কলিকাতা শহরের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্বের কতখানি মিল আছে, তাহাও এই ইতিহাস হইতে বুঝা যাইবে।

১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট, রবিবার, কলিকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা-দিবস বলিয়া ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন। কারণ, ঐদিন ইংরেজদের হুগলির বাণিজ্য-কুঠির প্রধান কর্মকর্তা জব চার্নক গঙ্গাতীরের সুতানুটি গ্রামে, অন্যান্য কর্মচারীদের লইয়া 'হল্ট' করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে সুতানুটিতেই নূতন কুঠি স্থাপন করিবেন। কলিকাতা শহরের পূর্বাংশে এখন যেখানে সবাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে তিনটি গ্রাম ছিল, গোবিন্দপুর, ডিহি কলিকাতা ও সুতানুটি। এইসব গ্রামের পশ্চিমে উত্তরে ও দক্ষিণে আরও অনেক গ্রাম ছিল। এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম; ডিহি কলিকাতার সীমানা ছিল বর্তমান এসপ্লানেড হইতে বড়বাজার পর্যন্ত, এবং তাহার পর হইতে উত্তরে বাগবাজার পর্যন্ত ছিল সুতানুটি গ্রাম। বাংলাদেশের অন্যান্য সব গ্রামেই যেমন থাকে, স্থানীয় জমিদার-জায়গীরদারদের অধীনে এইসব গ্রামেও তেমনই নানা জাতির ও

বর্ণের লোকের বাস ছিল, এবং পুকুর জলা খাল খানাডোবা, বাঁশবন, জঙ্গল ইত্যাদির মধ্যে মধ্যে ছিল গ্রামের মাটির ঘরবাড়ী ও চাষীদের ধানক্ষেত। আজিকার কলিকাতা দেখিয়া তাহা কল্পনাও করা যায় না।।

১৬৯৮ সালে বাংলার সুবাদার আজিমুশ্বানের নিকট হইতে ইংরেজরা এই তিনটি গ্রামের জমিদারী-স্বত্ব ক্রয় করেন, মাত্র ১৬,০০০ টাকা সুবাদারকে উপঢৌকন দিয়া এবং স্থানীয় জমিদার সাবর্ণ-চৌধুরীদের মাত্র ১,৩০০ টাকা নজর দিয়া। এই জমিদারী-স্বত্ব ক্রয়ের বায়নামা (Deed of Purchase) ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এখনও আছে। সাবর্ণচৌধুরীরা ছিলেন এই অঞ্চলের প্রধান জায়গীরদার। তাহাদের ঘরবাড়ী, বড় বড় অট্টালিকা দরদালান, কাছারীবাড়ী, পূজামণ্ডপ, দেওয়ানবাড়ী, দেবালয় ইত্যাদির বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ এখনও কলিকাতার উপকণ্ঠে বড়িশাতে (বেহালা-বড়িশা) আছে। এই বংশের জমিদার রামচাঁদ রায়, মনোহর রায় ও অন্যান্য অংশীদাররা বায়নামাটি স্বাক্ষর করিয়া, কলিকাতা সূতানুটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী-স্বত্ব ইংরেজদের দান করেন, সুবাদারের আদেশে। ইংরেজরা এদেশে কেবল বণিক হইয়া আসেন নাই। কলিকাতা শহরের বাল্যকালে, ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া কার্যতঃ রাজসিংহাসন দখলের পূর্বে, বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহারা কলিকাতা ও অন্যান্য অনেক গ্রামের জমিদারও ছিলেন। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরেজদের পরাজিত করেন, তখন কিছুদিনের জন্য তিনি কলিকাতার নামকরণ করেন **আলিনগর**। নবাবের প্রতিনিধি দক্ষিণাঞ্চলে যে স্থানে থাকিতেন, তাহার নাম হইয়াছে 'আলিপুর'। আলিপুর নাম এখনও



১৭৮০ ↑

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট

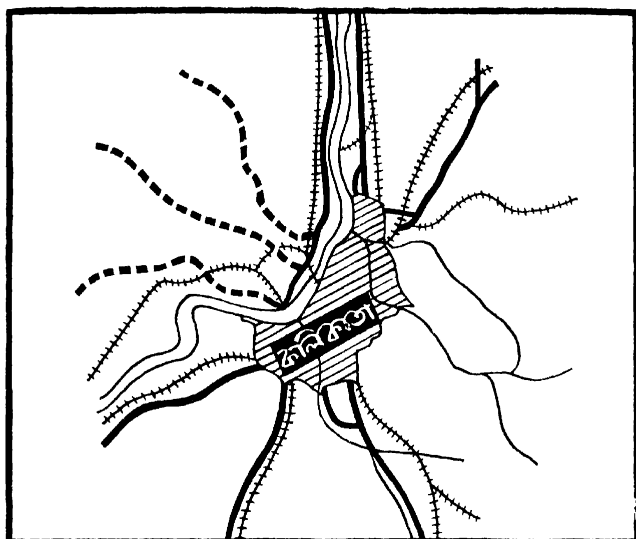
—> ১৯৫৮



কলিকাতা শহরের ক্রমবিকাশ



বিমান হইতে কলিকাতার বস্তি-চিত্র



——→

সবরকমের
যানবাহনের
টার্মিনাস
ও কেন্দ্র
কলিকাতা
শহর

প্রথম শ্রেণীর রাস্তা – রেলপথ

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাস্তা নদী ও খাল

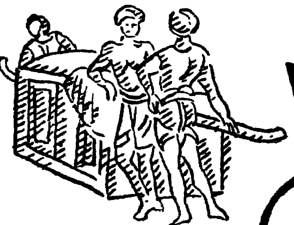
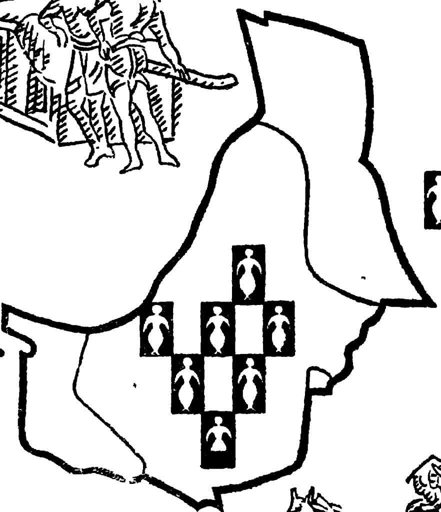
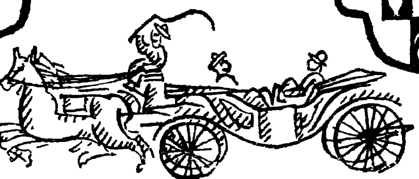
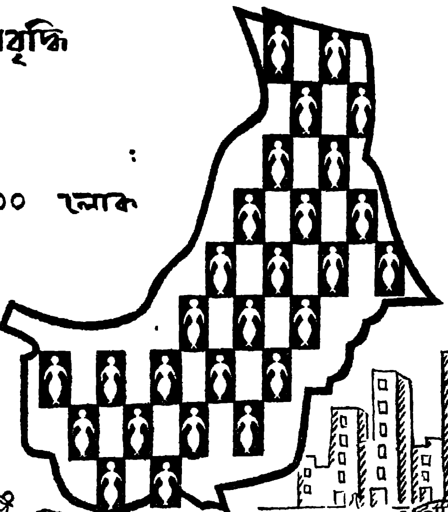
আছে, কিন্তু আলিনগরের বদলে ইংরেজরা অল্পদিন পরেই আবার শহরের নাম রাখিয়াছিলেন 'কলিকাতা'। পলাশীর যুদ্ধের পরে মীরজাফরের নিকট হইতে ইংরেজরা ২৪-পরগণা জেলার ও কলিকাতার চারিপাশের আরও বহু গ্রামের জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন। সেই সব গ্রামই ধীরে ধীরে গত ২৫০ বৎসরের মধ্যে, নগর হইতে আজিকার বৃহৎ কলিকাতা শহরে পরিণত হইয়াছে।

কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি হইতে কলিকাতা মহানগরের এই ক্রমপরিণতির স্তরগুলি বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতে, ১৭০৬ সালে, কলিকাতার ক্ষুদ্র নগর-এলাকায় মাত্র ২৪৮ বিঘা জমিতে ঘরবাড়ী ছিল, বাকি ৩৬৪ বিঘাতে ঘরবাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল মাত্র। বড়বাজারে তখনই অবশ্য বেশ বসতি হইয়াছিল দেখা যায়, ৪৮৮ বিঘা জমির মধ্যে ৪০০ বিঘা জমিতে বাড়ী তৈরী হইয়াছিল। ইহা ছাড়া 'ডিহি কলিকাতা'র ১৪৭০ বিঘা জমির মধ্যে কিছু জমিতে চাষ হইত, কিছু জমি পতিত ছিল; সূতানুটির মাত্র ১৩৪ বিঘা জমিতে ছিল বসতবাড়ী, বাকি ১৫৫৮ বিঘা জমিতে ছিল ধানক্ষেত, বাঁশঝাড় ও জঙ্গল; গোবিন্দপুরের মাত্র ৫৭ বিঘা জমিতে ছিল ঘরবাড়ী, বাকি ১১৭৮ বিঘা ছিল গভীর জঙ্গল। গোবিন্দপুর ও চেরাঙ্গী বা চৌরঙ্গী গ্রামের মধ্যবর্তী এই গভীর জঙ্গলে তখন বাঘও দেখা যাইত বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শীরা উল্লেখ করিয়াছেন। চৌরঙ্গীর দক্ষিণে ছিল 'ডিহি বিরজি' (ক্যামাক স্ট্রীট, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট অঞ্চল), 'ডিহি চক্রবেড়' (চক্রবেড়িয়া) প্রভৃতি গ্রাম। ক্যামাক নামে এক সাহেব কয়েকশত বিঘা জমির মালিক ছিলেন চৌরঙ্গীর পশ্চিমে এবং বড়লাট ওয়েলেসলির এক ভাই 'ডিহি বিরজি' গ্রামে সাত-আট শত বিঘা ভূসম্পত্তির জমিদার ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই কলিকাতার লোকসংখ্যা লক্ষাধিক হইয়া যাওয়ায়, উহা আমাদের সংজ্ঞা অনুসারে 'শহরে' পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বয়সের দিক হইতে উহার বাল্যকাল (Infantile Age) কাটে নাই এবং বিকাশের স্তরের দিক হইতে তখনও উহা প্রথম স্তরে (First Stage) পৌঁছায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্রে (Upjohn's Map of 1794) দেখা যায়, শিয়ালদহ এণ্টালি অঞ্চলে সাহেবদের বড় বড় বাগানবাড়ী হইয়াছে, সার্কুলার রোডের দুই ধারে পাকা বসতবাড়ী গড়িয়া উঠিয়াছে এবং চৌরঙ্গী অঞ্চলেও সাহেবরা বাড়ী ঘর করিয়া বাস করিতেছেন।

উনিশ শতকের গোড়া হইতে কলিকাতা শহরের দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে, এবং প্রথমার্ধের অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্ধে আরও বেশী দ্রুতগতিতে শহরের বিকাশ হয়। ১৮০৩ সালে 'টাউন ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটি', ১৮১৪ সালে 'লটারী কমিশনার্স', এবং ১৮১৭ সালে 'লটারী কমিটি' গঠিত হয় শহরের রাস্তাঘাট, ড্রেন, আলো, ঘরবাড়ী ইত্যাদির উন্নত পরিকল্পনার জন্য। ১৮০৫-১৭ সালের মধ্যে লটারী কমিশনাররা লটারী করিয়া টাকা তুলিয়া কলিকাতার 'টাউন হল' নির্মাণ করেন, বেলিয়াঘাটা খাল কাটেন এবং রাস্তাঘাটও অনেক তৈরী করেন। ১৮১৭-৩৬ সালের মধ্যে 'লটারী কমিটি' কলিকাতার অনেক বড় বড় রাস্তা তৈরী করেন, যেমন—স্ট্র্যাণ্ড রোড, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলেজ স্কয়ার ও স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্কয়ার ও স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্কয়ার ও স্ট্রীট ইত্যাদি। কলিকাতা শহর এই সময় নাগরিক ক্রমবিকাশের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া যায়।

তৃতীয় স্তর হইতে সপ্তম স্তরের বিকাশ হইয়াছে ১৮৫০ হইতে



১৮৯১


ষাট বৎসরে কলিকাতার
জনসংখ্যাবৃদ্ধি
= ১,০০০০০ লোক
১৯৫১


১৯৫০ সালের একশত বৎসরের মধ্যে। তখন কলিকাতার 'জাষ্টিসরা' (Justices of the Peace for the Town বলা হইত) নগর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিতেন এবং তাহার উন্নতি সাধনের ভারও ছিল তাঁহাদের উপর। ১৮৪৭ সালে প্রথম কলিকাতার কমিশনার নির্বাচন করিবার রীতি (election) প্রবর্তিত হয় এবং ৭ জন কমিশনার লইয়া একটি বোর্ড গঠন করা হয়। ১৮৫৬ সালে 'কর্পোরেশন' নাম দিয়া তিন জন কমিশনারের একটি বোর্ড গঠন করা হয় এবং ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত এই তিনজনের কর্পোরেশন অনেক কাজ করেন। ১৮৫৯ সালে কলিকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী স্থাপন ইহাদের দ্বারাই আরম্ভ হয়। ১৮৫৮ সালে চৌরঙ্গী অঞ্চলের খোলা ড্রেন বুজাইয়া প্রথম 'ফুটপাথ' তৈরী হয় কলিকাতায়। রাস্তায় গ্যাসের ও তেলের আলো জ্বালাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৭৬ সালে আবার যে নূতন কমিটি গঠিত হয়, তাঁহারাও কলিকাতার অনেক উন্নতি সাধন করেন। ১৮৭৬ সালে পুনরায় নূতন কর্পোরেশন গঠন করা হয়। পরে ১৮৯৯ সালে, ১৯২৩ সালে ও ১৯৫১ সালে আইন পাশ করিয়া এই কর্পোরেশনের অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে। কলিকাতা শহরের আয়তন ও ওআর্ড বা পল্লীসংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পৌরশাসনের ও নগর-পরিকল্পনার সমস্যাও ক্রমে জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ১৯১১ সালে নূতন আইন পাশ করা হয় কলিকাতার উন্নতি সাধনের জন্য (Calcutta Improvement Act of 1911) এবং 'ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট' গঠন করা হয়। এই 'ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট' পুরাতন কলিকাতার ঘরবাড়ী ও রাস্তাঘাটের বিন্যাস অনেক অঞ্চলে আমূল পরিবর্তন করিয়াছেন এবং বহু নূতন অঞ্চলে পরিচ্ছন্ন বসতি ও পথ ঘাট নির্মাণ

করিয়াছেন। ট্রাস্টের আমলে কলিকাতা শহরের নবরূপান্তর হইয়াছে বলা চলে। 'ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টে'র পূর্বে পর্যন্ত, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত, কলিকাতা শহর ক্রমবিকাশের তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল এবং পরে চতুর্থ হইতে সপ্তম স্তরে পৌঁছিয়াছে, গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে।

কলিকাতা শহরের এই ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে দেখা যায়, শহরের লোকসংখ্যা যত বাড়িয়াছে, সীমানা তত বাড়িয়াছে এবং ক্রমে পাশাপাশি গ্রাম ও গ্রামাঞ্চল, অথবা শহরতলী আত্মসাৎ করিয়া শহর তিন দিকে (পূর্ব দিকে নদীর সীমানা) ডালপালা বিস্তার করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কলিকাতার লোকসংখ্যা আনুমানিক ৬ লক্ষ ছিল, উনিশ শতকের শেষেও দেখা যায় খুব বেশী বাড়ে নাই, প্রায় ৭ লক্ষ হইয়াছে; ১৯২১ সালেও ৯ লক্ষের কোঠায় ছিল, কিন্তু ১৯৫১ সালে হইয়াছে প্রায় ২৭ লক্ষ (টালিগঞ্জ সহ)। ত্রিশ বৎসরে প্রায় তিনগুণ লোক বাড়িয়াছে। শহরের জীবনযাত্রা ও পৌর-ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। কেবল ওয়ার্ড বাড়াইয়া ও শহরতলী গ্রাস করিয়া তাহার সমাধান করা সম্ভব হইতেছে না। শহরতলীর ভিতর দিয়া শহর যত চারিদিকে বাড়িয়া যাইতেছে, তত তাহার কাছাকাছি গ্রামাঞ্চল শহরের সীমানার নিকটে আগাইয়া আসিতেছে। তাহার ফলে আর্থিক ও সামাজিক অনেক সমস্যাও দেখা দিতেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম শহরগুলিতে (সমাজবিদরা যাহাকে 'Primate city' ও 'Megalopolis' বলেন) এই সমস্যাই দেখা দিয়াছে এবং কলিকাতা শহরও কয়েকটি মাত্র গ্রাম হইতে, বর্তমানে সারা ভারতের অন্যতম 'প্রাইমেট সিটি' ও 'মেগালোপোলিস' হইয়া উঠিয়াছে।

শহুরে সমাজ

পূর্বে আমরা যে গ্রাম্যসমাজের (Rural Society) বিষয় আলোচনা করিয়াছি, তাহার সহিত শহুরে সমাজের (Urban Society) অনেক পার্থক্য আছে। পার্থক্যগুলি এবং শহুরে সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি. এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়ঃ

ক। গ্রাম্যসমাজ সঙ্কীর্ণ ও সরল, শহুরে সমাজ প্রশস্ত ও জটিল। গ্রাম্যসমাজে একজন অপর জনকে চেনে জানে, পরস্পরের মুখোমুখি পরিচয় আছে, কারণ তাহার পরিসর ক্ষুদ্র, মানুষের চলাফেরার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। শহুরে সমাজে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করে, কেহ কাহাকেও চেনে না, জানে না। বড় বাড়ীর পাশাপাশি 'ফ্ল্যাটে' বাস করিয়াও একজন অন্যজনকে চেনে না। এই নামগোত্রহীনতা (Anonymity) শহুরে সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

খ। গ্রাম্যসমাজের জাতিবর্ণের বিন্যাস পাকাপোক্ত, তাহার নড়চড় হয় না সহজে। যে যাহার কৌলিক কাজকর্ম বংশানুক্রমে করে। সমাজের উচ্চ বা নিম্ন স্তরে উঠা-নামার সম্ভাবনা কম। সেইজন্য গ্রাম্য-সমাজ স্থিতিশীল (Static)। শহুরে সমাজে 'টাকা' বা বিত্তের প্রাধান্য বেশী, কুলবর্ণের নহে। বিত্ত অনুপাতে সমাজ শ্রেণীবদ্ধ হইতে থাকে। পেশা ও কাজকর্মের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও থাকে মানুষের, বর্ণগত বাধ্যতা থাকে না। জীবন-সংগ্রামের সুযোগ এবং সেই সংগ্রামে সফল হইবার সম্ভাবনাও অনেক বেশী থাকে। সুতরাং সর্বদাই শহুরে সমাজের স্তরগুলি (Social Strata) পরিবর্তনশীল, একস্তর হইতে অন্যস্তরে মানুষের উঠা-নামা চলিতে থাকে। এইজন্য শহুরে সমাজ গতিশীল (Dynamic)। শহরের মানুষের আশাভরসা বেশী।

গ। গ্রাম্যসমাজে সামঞ্জস্য বেশী। মানুষের সহিত মানুষের আর্থিক ব্যবধান দুইতিনটি নির্দিষ্ট স্তরের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ। সকলেই তাহা মানিয়া লইয়াছে এবং তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না বলিয়া বিশ্বাস

করে। তাই সেখানে রেষারেষি, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কম। শহুরে সমাজে অসামঞ্জস্য বেশী, আর্থিক ব্যবধানও অনেক বেশী, এবং তাহা বহু স্তরে বিন্যস্ত। নিম্ন হইতে উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরে উঠিবার জন্য মানুষ প্রাণপণ করিয়া শহরে সংগ্রাম করে। সেইজন্য শহুরে সমাজে রেষারেষি, পাল্লাপাল্লি ও প্রতিযোগিতা (Competition) বেশী। ঠিক সেই কারণেই আবার শহুরে সমাজে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শক্তির পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা ও সুযোগ প্রচুর।

গ্রাম্যসমাজের সহিত শহুরে সমাজের পার্থক্য এই। দুই সমাজের এই বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের কথা মনে রাখা দরকার। গ্রাম্যসমাজ স্থিতিশীল বলিয়া মানুষের জীবন সেখানে প্রধানতঃ পরিবার-কেন্দ্রিক (Family-centric), কিন্তু শহুরে সমাজে পরিবার-বহির্ভূত কর্ম-জীবনের বৈচিত্র্য ও গতি বেশী বলিয়া, সমাজের ভিত্তি পরিবারের বন্ধন পর্যন্ত সেখানে শিথিল হইতে থাকে। শহরে মানুষ ক্রমেই আত্মকেন্দ্রিক (Ego-centric) হইয়া উঠে। ইহাও শহুরে সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।



সপ্তম অধ্যায়

বিদেশী জনগোষ্ঠী

নিজেদের দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জনসমাজ সম্বন্ধে আমরা যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহা অন্যান্য দেশের জনগোষ্ঠী সম্বন্ধেও অনেক-খানি প্রযোজ্য। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন জনসমাজের রূপ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করিবেই, একেবারে তাহার প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়া মানুষ ও সমাজের পক্ষে সম্ভব নহে। যেমন, শিল্পকারখানার জন্য মানুষ খনিজ কাচামাল উৎপাদন করিতে পারে না, যেখানে ইচ্ছা, কয়লাখনি বা লোহাপাথরের পাহাড় বসাইতে পারে না। নদনদী পাহাড়পর্বত মরুপ্রান্তর ইত্যাদির প্রাকৃতিক বিন্যাসও বদলানো সম্ভব নহে। হিমালয় পর্বত বা ছোটনাগপুরের পাহাড় দরকারের জন্য তুলিয়া লইয়া অন্যত্র বসানো যায় না। ঋতুচক্রের গতিও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্য নহে। সুতরাং কিছুটা প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতেই হয় এবং এই নির্ভরতার প্রভাবও আঞ্চলিক জনসমাজের উপর পড়িতে বাধ্য। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনেক কলাকৌশল ও হাতিয়ার মানুষ উদ্ভাবন করিয়াছে এবং সেই অনুপাতে সমাজের রূপও মানুষ অনেক বদলাইতে পারিয়াছে। প্রকৃতি ও জনকৃতি, দুইয়েরই প্রভাবে জনসমাজ গড়িয়া উঠে। শুধু আমাদের দেশে নহে, পৃথিবীর

সর্বত্র। এখানে কয়েকটি বিদেশী জনগোষ্ঠীর কথা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

সাইবেরিয়া। উরাল পর্বতমালা হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত সাইবেরিয়ার বনভূমি বিস্তৃত। বনভূমির উত্তর-পূর্ব সীমান্তকে ভূবিদরা 'শীতের উত্তর মেরু' (North Pole of Cold) বলেন। পৃথিবীর আর কোন অঞ্চলে এত ঠাণ্ডা পড়ে না। পৌষ মাসে সাধারণতঃ এখানকার মধ্য-তাপ হয় –৫৯° ডিগ্রী, অর্থাৎ হিমাঙ্কের ৫৯ ডিগ্রী নীচে তাপ নামিয়া যায়। দুধ মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য জমিয়া শক্ত হইয়া যায়, নদীর জল বরফে পরিণত হয় এবং তাহার উপর দিয়া বল্‌গা-হরিণের (Reindeer) চাকাবিহীন স্লেজ-গাড়ীতে চলাফেরা করিতে হয়। গ্রীষ্মকালের তাপ ৬০° ডিগ্রী পর্যন্ত উপরে উঠে, অর্থাৎ শীত-গ্রীষ্মের মধ্যে তাপের তারতম্য ঘটে –৫৯° ডিগ্রী হইতে +৬০° ডিগ্রী পর্যন্ত, প্রায় ১১৯° ডিগ্রী। তাপের এত তারতম্যও পৃথিবীর আর কোন অঞ্চলে ঘটে না। বর্ষা মাঝামাঝি ধরনের হয়। উত্তর প্রান্তে কোন কোন অঞ্চলে ৫-১০ ইঞ্চি হইতে ভ্ল্যাডিভস্টক অঞ্চলে ২২ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

মানুষের মতো এই অঞ্চলের গাছ-গাছড়াও বেশ বলিষ্ঠ না হইলে বাঁচিতে পারে না। এখানকার অরণ্যে একরকম দেবদারু-জাতীয় ছোট ছোট মোচাকার গাছ (Coniferous trees) জন্মায়। ইহা ছাড়া ফার, স্প্রুস, লার্চ, পাইন প্রভৃতি গাছও আছে। স্থানীয় সামোয়েদ, ইয়াকুট, চুকচি প্রভৃতি অধিবাসীরা শিকার ও পশুপালন করিয়া জীবনধারণ করে। পশুর মধ্যে প্রধান হইল বলগা-হরিণ।

শস্য-উৎপাদন করা এই অঞ্চলে অসাধ্য সাধন মনে করিয়া, স্থানীয় অধিবাসীরা বল্‌গা-হরিণ পালন করিত, অরণ্যের জন্তু শিকার করিত এবং নদনদীতে মাছ ধরিত। রুশ বিপ্লবের আগে, জারের আমলে, সাইবেরিয়ায় নানা শ্রেণীর অপরাধীদের দ্বীপান্তর দেওয়া হইত এব' সেইজন্যই তাহার কুখ্যাতি ছিল। বিপ্লবেব পরে সোভিয়েট রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়াবরা নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া সাইবেরিয়ার জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। যাহারা কেবল বল্‌গা-হরিণ পালন ও শিকার করিত, তাহারা এখন যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান (collective farm) গড়িয়া একরকমের সবতাপ-সহিষ্ণু গমেব চাষ করিতেছে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে পশুপালন করিতেছে। নূতন বন্দর ও নগরও গড়িয়া তোলা হইয়াছে সাইবেরিয়ায়। এই অঞ্চলের প্রতিকূল পরিবেশকে মানুষ নিজেদের সংঘবদ্ধ চেষ্টায় যতদূর সম্ভব আয়ত্তে আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

উত্তর চীন। উত্তর ও দক্ষিণ, এই দুই ভাগে চীন দেশকে ভাগ করিয়া আলোচনা করিলে ভুল হয় না, কারণ দুই অঞ্চলের প্রাকৃতিক জলবায়ু, ভূ-সংস্থান, এমন কি স্থানীয় অধিবাসীদের দৈহিক গড়নের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। উত্তরের তরঙ্গায়িত নিম্নভূমি হোয়াঙ-হো ও ইয়াঙ-সি নদীর পলিমাটিতে গঠিত। উত্তরে শীত অনেক বেশী, প্রায় অসহনীয় বলা চলে। দক্ষিণে গ্রীষ্মের তাপ খুব বেশী, শীত উপভোগ্য। উত্তর চীনের অধিবাসীরা পরবর্তী কালে আসিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের দক্ষিণে হটাইয়া দিয়াছে। উত্তর চীনের লোক অনেক বেশী কর্মঠ ও বলিষ্ঠ, আকারে ও কষ্টসহিষ্ণুতায় দক্ষিণ চীনবাসীদের সহিত তাহাদের পার্থক্য স্পষ্ট ধরা যায়। উত্তরের প্রধান শস্য ও খাদ্য গম। দক্ষিণের শস্য ধান। পাহাড়ের গায়ে ঢালু জমিতে

থাক-কাটিয়া চাষ এবং নদীতীরের সমতল ক্ষেতে চাষ, দুই উপায়েই এখানে ধান চাষ করা হয়। উত্তর চীনে গম ছাড়া ভুট্টা-জোয়ার, জই, মটর, বীন প্রভৃতির চাষ হয় বেশী, দক্ষিণে একরকমের মিষ্টি আলু ভাল জন্মায়। উত্তরের খনিজ সম্পদের মধ্যে শান্সী অঞ্চল কয়লা ও লোহার জন্য বিখ্যাত। অর্থকর শস্যের মধ্যে চীনের চা ও তূলা প্রধান। চা সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয় চীনে, কিন্তু ভারত ও সিংহলের চায়ের মতো তাহা বাহিরে বেশী চালান দেওয়া হয় না। মধ্য ও দক্ষিণ চীনেই চা বেশী হয়, উত্তরে হয় না। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তূলার চাষ হয় বেশী।

চৈনিক সমাজে, উত্তরে ও দক্ষিণে, পারিবারিক ভিত্তি খুব দৃঢ়। পরিবার হইল সমাজের মূল ভিত্তি এবং চীনের পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া, চৈনিক সমাজে বাহিরের প্রভাব সহজে প্রবেশ করিয়া ভাঙন ধরাইতে পারে নাই। চাষবাসের ক্ষেত পর্যন্ত পারিবারিক বাসগৃহ সংলগ্ন এবং বাগানের মতো যত্ন করিয়া তাহা বংশ-পরম্পরায় চাষ করা হয়। সেইজন্য চীনের কৃষিকর্মকে ক্ষেতচাষ (Agriculture) না বলিয়া, অনেকে বাগান-চাষ (Horticulture) বলিয়া থাকেন। চীন বিপ্লবের পরে সম্প্রতি চীনে দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ঘটিতেছে। উত্তরের লোহা-কয়লা কেন্দ্রে বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। নিজেদের সুপ্রাচীন সামাজিক ঐতিহ্যকে সমাদর করিয়াও, চীনারা যৌথ চাষবাস ও সংঘবদ্ধ কাজকর্মের মধ্য দিয়া নূতন এক জনসমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

মালয়। মালয় ও তাহার সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ (Archipelago) গভীর জঙ্গল ও জলাভূমি সমাকীর্ণ অঞ্চল। উদ্ভিদবিদ্‌রা বলেন, মালয়ে নাকি ৯,০০০ রকমের গাছপালা জন্মায়, তাহার মধ্যে ৩,০০০

রকমের গাছ বড় গাছ। ২০০-১৫০ ফুট হইতে ১০০ ফুট উঁচু অনেক রকমের গাছ আছে। মালয়ের পূর্ব উপকূলে বৃষ্টিপাত অল্প বলিয়া জঙ্গল তেমন নিবিড় নহে। ইহার মধ্যে মধ্যে জলাভূমি অনেক আছে। সমগ্র মালয় দেশের দশভাগের একভাগ প্রায় জলাভূমি।

মালয় ও সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ রবার (Rubber) ও রাং বা টিন (Tin) উৎপাদনের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। পৃথিবীর মোট রবার ও টিনের বেশীর ভাগ উৎপন্ন হয় মালয়ে। নদী মোহানার পাললিক স্তর খুঁড়িয়া মালিয়ে রাং-যুক্ত খনিজ সংগ্রহ করা হয়। রবার একরকমের গাছের আঠা বা কষ হইতে হয়। রবার-গাছের চাষ করিতে হয় বাগান করিয়া। গাছ বড় হইলে তাহার গা কাটিয়া মজুরেরা পাত্র ঝুলাইয়া দিয়া কষ সংগ্রহ করে। সারাদিনে যে কষ সংগ্রহ করা হয়, তাহা দিনের শেষে মাথায় করিয়া ফ্যাক্টরীতে লইয়া যাওয়া হয়। কষ শুকাইয়া রবারের চাদর (sheet) তৈরী করা হয় কারখানায়, এবং সেই চাদরই প্রধানতঃ বাহিরে চালান যায়।

মালয়ের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। পশ্চিম উপকূলের নিম্নভূমিতে ধানচাষ হয় বেশী, কিন্তু দ্বীপপুঞ্জের পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে থাক কাটিয়া চাষ হয়। নারিকেল গাছ মালয়ের আর একটি সম্পদ। নারিকেল হইতে হাইড্রলিক প্রেসে তেল বাহির করিয়া, টিনবন্দী করিয়া বাহিরে চালান দেওয়া হয়।

সিঙাপুর, পেনাঙ ও মালাক্কা, এই তিনটি হইল মালয়ের প্রধান বাণিজ্য-বন্দর ও বন্দর-নগর। কলম্বোর মতো সিঙ্গাপুরও নানা-দিকের সমুদ্র-পথের কেন্দ্রীয় বন্দর। চারিপাশের সব দ্বীপপুঞ্জ হইতে রপ্তানির মালপত্র সিঙ্গাপুরের বন্দরে আসে এবং সেখান হইতে

বিদেশে জাহাজে চালান যায়। দেশের অভ্যন্তরের সহিতও রেলওয়ে ও মোটরপথের যোগ আছে সিঙ্গাপুরের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান বন্দর হিসাবে তো বটেই, রাং-যুক্ত খনিজ গলাইয়া রাং উৎপাদনের এত বড় কেন্দ্র সিঙ্গাপুরের মতো সারা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। বর্মা, শ্যাম ও মালয়ের রাং সিঙ্গাপুরে আসিয়া জমা হয়। সিঙ্গাপুরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ, তাহাদের মধ্যে চারভাগের তিনভাগ চীনা। সমগ্র মালয়ের লোকসংখ্যার মধ্যে ৪০ শতাংশ মালয়ী, ১৫ শতাংশ ভারতীয় এবং বাকি ৪৫ শতাংশ চীনা।

মালয়ের অধিকাংশ ভারতীয় ও চীনা অধিবাসী রাং-এর খনি ও কারখানায় এবং রবার-বাগানে কুলির কাজ করিবার জন্য আসিয়াছিল। ঠিক যে তাহারা স্বেচ্ছায় আসিয়াছিল তাহা বলা যায় না। রবার-বাগানের বিদেশী মালিকেরা (বাংলাদেশের চা-বাগানের মালিকরা যেমন অধিকাংশই বিদেশী ছিলেন) ভারতীয় কুলিদের জোর করিয়া ধরিয়া ধরিয়া সেকালের দাসদের (slave) মতো বাহিরে চালান দিয়াছিলেন। চা-বাগানের কুলিদের যেমন নানা প্রদেশ হইতে 'আড়কাঠি'র সাহায্যে ধরিয়া আনা হইত, সাহেবরা তেমনই দরিদ্র ভারতীয়দের ধরিয়া আনিয়া মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের রবার-বাগানে কুলির কাজ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। এইসব ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে মালয়ের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গিয়া, বংশপরম্পরায় বসবাস করিতেছে। চীনাদের মধ্যেও অনেকে এখন মালয়ের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছে। এখন মালয়ের ব্যবসা-বাণিজ্যও অধিকাংশ চীনা ও ভারতীয়দের হাতে। মালয়ীরা প্রধানতঃ চাষবাস করে, খালে ও নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়। তাহারা অধিকাংশই চাষী। সেইজন্য মালয়ের গ্রামগুলিতে আসল মালয়ী

সমাজের রূপ দেখা যায়, বন্দরে ও নগরে দেখা যায় চীনা-ভারতীয়-ইয়োরোপীয়-প্রধান এক বিচিত্র মিশ্র-সমাজ। পূর্ব দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ নগরে ও বন্দরেই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

ডাচদের কথা। হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা, অর্থাৎ ডাচরা তাহাদের দেশকে বলে 'নেদারল্যাণ্ডস' (Netherlands)। ইংরেজী 'Nether' কথা এখন অপ্রচলিত হইলেও, ইহার অর্থ নিম্নস্থ বা নীচু, এবং 'land' কথাব অর্থ জমি বা ভূমি। 'নেদারল্যাণ্ড' কথার অর্থ হইল নিম্নভূমি। নিম্নভূমির অধিবাসী বলিয়া হল্যাণ্ডবাসী বা ডাচরা তাহাদের নেদারল্যাণ্ডবাসী বলিয়া পরিচয় দেয়।

হল্যাণ্ড খুবই ক্ষুদ্র দেশ, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও তাহার অধিবাসীদের কর্মশক্তি ও উৎসাহ অসাধারণ বলা চলে। হল্যাণ্ড হইতে পাড়ি দিয়া, সুদূর পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতবর্ষে তাহারা এক বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল এবং এই সাম্রাজ্য লইয়া এই অঞ্চলে ইংরেজদের সহিত তাহাদের বহুবার সংঘর্ষ হইয়াছে। সুতরাং ক্ষুদ্র দেশের অধিবাসী হইলেও, ডাচরা দৃঢ়চরিত্র ও সুদক্ষ ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের জন্যই তাহারা সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযানে ইংরেজ ও ফরাসীদের সহিত পাল্লা দিয়া লড়িয়াছে। কিন্তু ডাচদের মধ্যে সকলেই বণিক নহে, কৃষিজীবীর সংখ্যাই বেশী। অনেক মেহনত করিয়া, নিম্নভূমির বহু বাধা অতিক্রম করিয়া, তবে তাহাদের ফসল-ফল-ফুল ফলাইতে হয়। ডাচদের ডেয়ারী প্রতিষ্ঠান, চীজ মাখন ইত্যাদির ব্যবসা প্রধান এবং সারা পৃথিবীর বাজারে তাহার চাহিদা ও সরবরাহ আছে।

সমুদ্র ও নদীর 'লেবেল্' বা সমতলতা হইতে হল্যাণ্ড অনেক নীচু। নীচু বলিয়াই তাহার নাম নেদারল্যাণ্ড্স। এইসব নিম্নভূমি নালা-ডোবায় পরিবেষ্টিত ও বহু টুকরায় খণ্ডিত। ইহার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড-

গুলিকে 'পোল্ডার' (Polder) বলে। বায়ু-চালিত কল ও বাষ্পীয় পাম্প দিয়া নালা হইতে জল তুলিয়া নদীতে ফেলা হয় এবং সমুদ্র-কূলের বাঁধের উপরেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় সব সময়। এইভাবে পাথর ও ঘাসের চাপড়া ডুবাইয়া বাঁধ দিয়া, খাল নালা কাটিয়া, ডাচরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সমুদ্র হইতে ভূমি উদ্ধার করিতেছে। এই প্রকারে উদ্ধৃত ভূখণ্ডকে 'পোল্ডার' বলে। তাহাদের বর্তমান পরিকল্পনা হইতেছে 'জুইডার জি' (Zuider Zee বা Southern Sea) বা দক্ষিণ সমুদ্রের জল নিষ্কাশন করা। প্রথমে সমুদ্রের মুখে একটি ২০ মাইল লম্বা বাঁধ তাহারা এইজন্য নির্মাণ করিয়াছে। পরবর্তী কাজ হইতেছে, ভিতরের অংশগুলিকে ঘিরিয়া ফেলিয়া জল পাম্প করিয়া দেওয়া। মধ্যভাগ হ্রদের মতো থাকিবে, এবং সেই হ্রদের জলের লবণাংশ কিছু দিন পরে কমিয়া গেলে তাহা দিয়া সেচের কাজও (irrigation) চলিবে। এই ভূখণ্ড সম্পূর্ণ উদ্ধার করা হইলে ইহাতে প্রায় ৫ লক্ষ লোক স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ যে বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন কতখানি নিয়ন্ত্রণ করে, ডাচদের 'জুইডার জি' হইতে ভূমি উদ্ধারের পরিকল্পনা তাহার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। প্রকৃতির সহিত এই সংগ্রামই মানুষকে শক্তিশালী ও উন্নত সমাজ-সভ্যতার অধিকারী করিয়া তোলে। ডাচরা যদি প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে শক্তিশালী জাতি হিসাবে তো দূরের কথা, সামান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হিসাবেও এতদিন তাহাদের অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ।

রাইনের শিল্পাঞ্চল। ইয়োরোপের নদনদীর মধ্যে রাইন নদী

বিখ্যাত। সুইজারল্যাণ্ডের এক হিমবাহ হইতে রাইন নদীর উৎপত্তি। উৎস হইতে অনেক দূর পর্যন্ত রাইন পাহাড়ী নদীর মতো প্রবল বেগে বহিয়া গিয়া, ধীরে ধীরে বেস্‌লের (Basle) কাছে পৌঁছিয়াছে। এই পর্যন্ত রাইনের উত্তর ভাগ। এইখান হইতে উত্তর দিকে, জার্মানি ও ফ্রান্সকে ভাগ করিয়া, একটি প্রায় ২০ মাইল প্রশস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া রাইন বহিয়া গিয়াছে। ইহা রাইনের মধ্যভাগ। তাহার পর, গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া রাইন বহিয়া গিয়াছে হল্যাণ্ড বেলজিয়ামের ব-দ্বীপ ও সমভূমির দিকে এবং গতিও তাহার ক্রমে ধীর হইয়াছে।

রাইনের এই প্রবাহপথের পাশে বড় বড় শিল্পনগর ও কল-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। রাইনের উৎপত্তি-স্থল সুইজারল্যাণ্ডকেই মধ্য-ইয়োরোপের ওয়ার্ক্‌শপ বলা হয়। সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ী নদী হইতে যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাতে সেখানকার বড় বড় শিল্পনগরের কলকারখানা চলে, এবং কয়লাখনির নগর অপেক্ষা সুইস শিল্পনগর অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। রাইনের মধ্য-উপত্যকায় প্রথমে নেকার (Neckar) ও পরে মেন (Main) নদী আসিয়া মিশিয়াছে। মেন ও রাইনের সঙ্গম-মুখে বিখ্যাত শিল্প-শহর ফ্র্যাঙ্ক-ফুর্ট (সেইজন্য Frankfurt-on-Main বলে)। ফ্র্যাঙ্কফুর্ট প্রাচীন শহর, এখন ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। কয়লা ও লোহা নদীপথে ফ্রাঙ্কফুর্টের কারখানায় আনা হয়।

কলোনের (Cologne) কাছে রাইন সমভূমিতে নামিয়াছে মন্থর গতিতে। বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে এইখানে। কলোন বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র, এসেন (Essen) ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র এবং ডুইসবার্গ এই অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ নদী-বন্দর। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম নদী-বন্দর ছিল গত মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত। ডুইস-

বার্গে রুর (Ruhr) নদী আসিয়া রাইনের সহিত মিশিয়াছে। কয়লা ও ইস্পাতশিল্পের এত বড় বিস্তৃত কেন্দ্র ইয়োরোপে আর নাই। কয়লা ও লোহার খনি এখানকার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বর্তমান যুগে পৃথিবীর যেখানে এই দুই খনিজের, কয়লার ও লোহার, মিলন হইয়াছে সেইখানেই বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র, শিল্প-শহর ও নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে এই মিলন ঘটিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্তে এবং সেইজন্য রাণীগঞ্জ-আসানসোল-চিত্তরঞ্জন হইতে জামসেদপুর-টাটানগর পর্যন্ত বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে।

বিদেশী জনগোষ্ঠী

সাইবেরিয়া, উত্তর-চীন, রাইনল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও মালয় অঞ্চলের কয়েকটি বিদেশী জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হইল। এখানে আরও কয়েকটি বিদেশী জনগোষ্ঠীর কথা বলা হইবে। ভৌগোলিক পরিবেশের সহিত মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রা ও বিশেষ শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনের সম্পর্ক কতখানি, তাহা এইসব জনগোষ্ঠীর বিবরণ হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে। যেমন, **রাইনল্যাণ্ড**। রাইনল্যাণ্ডের বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল ইয়োরোপে গড়িয়া উঠিয়াছে রাইন-তীরবর্তী স্থানগুলিতে, কয়লা ও লোহা-যুক্ত খনিজের সরবরাহের সুবিধার জন্য। ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের সহিত এই শিল্পাঞ্চল সংযুক্ত বলিয়া, সকলে মিলিয়া ইহারকায পরিচালনার একটি চুক্তিবদ্ধ ব্যবস্থাও হইয়াছে। আমাদের এইখানে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানায় সম্মিলিত পরিচালনায় এই ধরনের শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ভালভাবে গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

আমেরিকার 'প্রেয়ারি' অঞ্চল। ভৌগোলিকরা উত্তর-আমেরিকাকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলে (Natural Regions) ভাগ করেন। অরণ্য-অঞ্চল, মরু-অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল তৃণভূমি-অঞ্চল, সমভূমি-অঞ্চল ইত্যাদি। তৃণভূমি (Grassland বা Prairie) অঞ্চল দুই ভাগে ভাগ করা যায়—গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় (Tropical) তৃণভূমি এবং নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি (Temperate Grassland)। এই নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির অঞ্চলকেই 'প্রেয়ারী' অঞ্চল বলা হয়। প্রধানতঃ দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকাই এই প্রেয়ারী অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। উনিপেগ হ্রদের (Lake Winnipeg) নিকট হইতে পাহাড়ের পাদদেশের উচ্চভূমি (High Plains) পর্যন্ত এই তরঙ্গায়িত তৃণভূমি বিস্তৃত। ইহাই আমেরিকার গম-শস্য উৎপাদনের বৃহৎ অঞ্চল। গম ছাড়াও এখানে ভুট্টা ও তুলারও চাষ হইয়া থাকে। বৃষ্টি বেশী হয় না বলিয়া এখানে গাছপালা বেশী নাই। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড ঝড়-শিলাবৃষ্টি মধ্যে মধ্যে হঠাৎ হইলেও, তাহাতে শস্যের ক্ষতি হয়। শীতের সময় হিমাঙ্কের নীচে তাপ নামিয়া যায়। বাহিরের ক্ষেত-খামারে এই সময় কাজ করা যায় না। গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে যখন তুষার গলিতে আরম্ভ করে, তখনই কৃষকদের কাজ আরম্ভ হয়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তখন তাহারা ক্ষেতে মেহনত করিয়া শস্য ফলায়। প্রেয়ারী অঞ্চলে চাষবাস করা (prairie farming) খুবই কঠিন। ক্ষেতের আয়তন খুব বড় হয় এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যেই চাষ করিতে হয়। লাঙলের বদলে ট্র্যাক্টর (tractor) দিয়া জমি চষিতে হয় এবং তুষার গলিয়া জমি একটু ভিজিলে তাহাতে ড্রিল (drill) দিয়া বীজ বপন করিতে হয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফসল কাটার সময় আসে। 'কম্বাইন' (combine) যন্ত্রের সাহায্যে ফসল কাটা ও ঝাড়া হইয়া

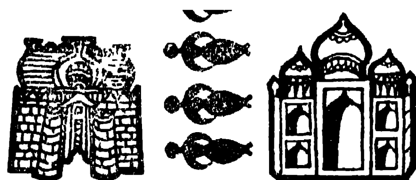
থাকে। ক্ষেত হইতে বস্তা-বোঝাই গম আড়তে পাঠানো হয়। খড় কাহারও কাজে লাগে না বলিয়া তাহা ক্ষেতেই পুড়াইয়া ফেলা হয়। তাহাতে কিছুটা সারের কাজ করে। ক্ষেত হইতে গম লরীতে করিয়া রেল-স্টেশনের বা নদীর বন্দরের কাছে বড় বড় শস্যাগারে (elevator বলে) নিয়া মজুত করা হয়। সেখান হইতে রেলগাড়ীতে কলকারখানায় বা জাহাজে বিদেশে চালান দেওয়া হইয়া থাকে।

সেণ্ট লরেন্স। কানাডার প্রধান নদী সেণ্ট লরেন্স। আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে যে পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত, তাহার উত্তর প্রান্তকে 'Height of Land' বলে। এখান হইতে সেণ্ট লরেন্স নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। তারপর বড় বড় হ্রদের ভিতর দিয়া (ওণ্টারিও, হুরন, মিশিগান, সুপিরিয়ার প্রভৃতি বিখ্যাত হ্রদ) সেণ্ট লরেন্স সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। লরেন্সের দুই তীরে ও অববাহিকা অঞ্চলে এখানকার সুসমৃদ্ধ জনপদ ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। বড় হ্রদগুলির আশেপাশে কয়লা, লোহা, তেল, সোনা, তামা, রূপা ও নিকেল প্রভৃতি খনিজ সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার। কৃষি ও 'ডেয়ারী'ও এখানকার অধিবাসীদের অন্যতম জীবিকা। খনিজ অঞ্চলে কল-কারখানা ও উন্নত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। মাছের ব্যবসা করিয়াও এখানে অনেকে জীবনধারণ করে। লরেন্সের তীরবর্তী কানাডার দুটি বিখ্যাত শহর হইল কুইবেক (Quebec) ও মনট্রিয়েল (Montreal)। নদী ও সমুদ্র দুইয়েরই বন্দর-শহর দুইটি, মনট্রিয়েল কানাডার বৃহত্তম শহর।

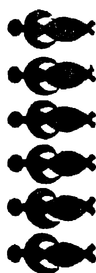
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগে নিম্নভূমি এবং পূর্বে ও পশ্চিমে দুইদিকে উচ্চভূমি। পশ্চিম-অস্ট্রেলিয়ায় উপকূলবর্তী

ভূমি ক্রমে খাড়া হইয়া উঁচু দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার খানিকটা অংশ শুষ্ক ও অনুর্বর, কিছুটা অরণ্য ও আবাদী ভূমি এবং কিছুটা তৃণভূমি। পশ্চিম-অস্ট্রেলিয়া খনিজ সম্পদে বেশ সমৃদ্ধ। এখানকার কুলগার্ডি (Coolgardie) অঞ্চলে **সোনা**, বানবেরি (Bunbury) অঞ্চলে **কয়লা** এবং প্রচুর **রাং-যুক্ত** (tin) খনিজ পাওয়া যায়। স্বভাবতঃই তাই এইসব অঞ্চলে খনি ও কলকারখানা কেন্দ্র করিয়া পশ্চিম-অস্ট্রেলিয়ায় সুসমৃদ্ধ জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

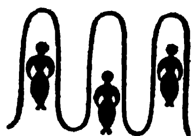
দ্বিতীয় ভাগ



ইতিহাসের ধারা



প্রাচীন যুগের ভারত



প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের প্রকৃতি

ইতিহাস পড়িবার আগে, 'ইতিহাস' কাহাকে বলে, ইতিহাসের প্রকৃতি বা স্বরূপ কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। ইতিহাসের নাম করিলে সাধারণ লোকের মনে, বিশেষ করিয়া ছাত্রদের মনে, আতঙ্কের সঞ্চার হয়। তাহারা মনে করে, অসংখ্য সন-তারিখ, যুদ্ধবিগ্রহ চক্রান্ত ও রাজা-রাজড়ার নামের নীরস তালিকা আলোচনাই ইতিহাস এবং তাহা আয়ত্ত করিতে গলদঘর্ম হইয়া মুখস্থ করা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু বাস্তবিকই ইতিহাস তাহা নহে। একালে বা সেকালে. কোনকালেই ইতিহাস বলিতে তাহা বুঝাইত না। ইতিহাস লেখার ও আলোচনার দোষেই সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদের কাছে তাহা বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস মানুষের ইতিহাস, মানুষের বিচিত্র কাজকর্মের, সুখদুঃখময় জীবনযাত্রার ও চিন্তাধারার ইতিহাস, মানুষের নানারকমের সমাজ গঠনের ও সংস্কৃতি রচনাব ইতিহাস। মানুষ হিসাবে মানুষ তাহা পড়িতে ও শুনিতে ভালবাসিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। তাহা না হইলে বুঝিতে হইবে. ইতিহাস যাঁহারা রচনা করেন, দোষ তাঁহাদের, ইতিহাসের নহে। সুতরাং ইতিহাসেব স্বরূপ কি এবং সমাজ ও সমাজবিদ্যার সহিত তাহার সম্পর্ক কি, তাহা সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন।

ইতিহাসের লক্ষ্য

মানুষের কথা, মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী মানুষ চিরদিনই শুনিতে ভালবাসে। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ বা আধুনিক যুগ, যে যুগেরই কথা হোক না কেন, মানুষেব তাহা ভাল লাগিবে। অতীতের কথা বা বিগত দিনের কথা হইল ইতিহাস। আজিকার কথা যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাও আগামী কালের ইতিহাস রচনার উপকরণ হইয়া থাকিতেছে। পুরাতন সংবাদপত্র হইতে আমরা গত ১৫০-২০০ বৎসরেব ইতিহাস বচনাব অনেক উপকরণ পাইতে পাবি। অতীতের কথাও শুনিতে গল্পেব মতো মনে হয়। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে লেখক অনেকটা কল্পনাব ও মিথ্যার রঙিন প্রলেপ দিতে পারেন, ইতিহাস-লেখক তাহা পারেন না। তাহার কাজ হইতেছে, নানা উৎস হইতে সংগৃহীত তথ্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই করিয়া বাছিয়া ইতিহাস রচনা করা। ইতিহাস তাই গল্প হইলেও, সত্য গল্প। মিথ্যাব খাদ ও কল্পনার রঙ-মুক্ত গল্প। সত্য গল্প মিথ্যা কাহিনীব তুলনায় বেশী ছাড়া কম আকর্ষণীয় নহে। কিন্তু কেবল সত্য গল্প বলাই ইতিহাসের লক্ষ্য নহে, উপায় মাত্র। ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হইতেছে, অতীতের আলোকে বর্তমানের পথ দেখানো, জন-সমাজ ও জনগোষ্ঠীর চলাচলের পথ ও বিপথ দুইই দেখাইয়া দেওয়া। সমাজ ও সভ্যতার উত্থান-পতনের আঁকাবাঁকা বন্ধুর পথে মানুষের যাত্রারম্ভেব, অগ্রগতির ও যাত্রাশেষের দিগ্‌দর্শন হইতেছে ইতিহাস। ইতিহাস শুধু সত্য কাহিনী নহে, নীতিকথাও।

ইতিহাসের এই নৈতিক প্রকৃতি অনেক কাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' সামবেদ ঋগ্‌বেদ ও যজুর্বেদের বাহিরে অথর্ববেদের সহিত ইতিহাসকেও বেদ বলা হইয়াছে; 'অথর্ব-

বেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ'। নানা বিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যাপক অর্থে 'বেদ' শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হইয়াছে। রাজার নানা বিদ্যার চর্চা প্রসঙ্গে কৌটিল্য নিজেই তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দিনের পূর্ব ভাগে রাজা যুদ্ধবিদ্যার নানা অঙ্গ শিক্ষা করিবেন। দিনের পশ্চিম ভাগে ইতিহাস শুনিয়া শিক্ষালাভ করিবেন। এই ইতিহাস কি? কৌটিল্য বলিয়াছেন: 'পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্র-মর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ'। পুরাণ ইতিবৃত্ত আখ্যায়িকা উদাহরণ ধর্ম-শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইহাদের বলে 'ইতিহাস'। এইসব বিদ্যা হইতে শিক্ষালাভ করাকেই ইতিহাস শিক্ষা বলে। ইতিহাসের লক্ষ্য যে কেবল সত্য কাহিনী বর্ণনা করা নহে, তাহার বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়া ও মানুষকে পথ দেখানো, একথা কৌটিল্য বহু প্রাচীন কালে বলিয়া গিয়াছেন।

ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা

ইতিহাসের সহিত সমাজবিদ্যার সম্পর্ক যে কত গভীর তাহা কৌটিল্যের এই উক্তি হইতেও আমরা বুঝিতে পারি। পুরাণ ইতিবৃত্ত আখ্যায়িকা ও উদাহরণ তো বটেই, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রও ইতিহাস। অর্থাৎ সকল বিদ্যার সারকথা ইতিহাসে আছে। ইতিহাসে ধর্মের কথা আছে, অর্থনীতির কথা আছে, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানের কথা আছে, রাষ্ট্রনীতির কথাও আছে। সব মিলাইয়া ইতিহাস। পৃথক করিয়া বিশদ জ্ঞানের জন্য প্রত্যেক বিদ্যার অনুশীলন করা যায় এবং তাহার স্বতন্ত্র নামও দেওয়া যায়। কিন্তু যে-কোন বিদ্যাই হোক, মানুষের জীবন ও সমাজের সহিত যে-বিদ্যার সম্পর্ক আছে, ইতিহাসের বাহিরে তাহাকে গণ্য করা যায় না। সমাজবিদ্যারও আলোচ্য বিষয়

মানুষের জীবন ও সমাজ। ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা তাই অঙ্গাঙ্গি জড়িত। ইতিহাস বাদ দিয়া সমাজবিদ্যার অনুশীলন করা সম্ভব নহে। সমাজবিদ্‌ও ইতিহাস হইতে অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিতে পারেন এবং আধুনিক সমাজেব আলোচনায় সেই শিক্ষা নানা দিক হইতে আলোকপাত করিতে পারে। সেইজন্যই সমাজবিদ্যার চর্চায় ইতিহাস আলোচনার সার্থকতা আছে।

ইতিহাস ও ভূগোল

ভূগোলের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক যে কত গভীর তাহা আমরা সমাজবিদ্যার 'প্রথম ভাগে' আলোচনা করিয়াছি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ যে সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তোলে, তাহার উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট থাকে। সমতলভূমি, উপত্যকা, পাহাড়, অরণ্য, সমুদ্র-নদীর তীর, সর্বত্র মানুষের একরকমের জীবন-ধারা নহে, সমাজ-জীবনের সমস্যাও একরকমের নহে। শীতপ্রধান, গ্রীষ্মপ্রধান, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির অঞ্চলেও জনসমাজের রূপ এক নহে। মানুষ ও সমাজের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক যখন এত প্রত্যক্ষ, তখন ইতিহাসের সহিত প্রাকৃতিক ভূগোলের সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ হওয়া স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষকে মোটামুটি তিনটি ভৌগোলিক বিভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। বিভাগগুলি এই :

আর্যাবর্ত। মধ্যভাগের বিন্ধ্যাচল হইতে হিমালয়ের সানুদেশ পর্যন্ত উত্তরাঞ্চল 'আর্যাবর্ত'।

দাক্ষিণাত্য। বিন্ধ্যাচলের সীমানা হইতে কৃষ্ণা নদীর তীর পর্যন্ত উপদ্বীপের কটিদেশ 'দক্ষিণাপথ' বা 'দাক্ষিণাত্য'।

তামিলভূমি। কৃষ্ণা নদীর পরপারে উপদ্বীপের ক্রম-সংকীর্ণ ভূখণ্ড 'তামিলভূমি'।

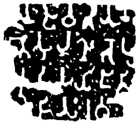
ভূপ্রকৃতি অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইলেও সাধারণতঃ ভারতবর্ষকে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ, অর্থাৎ আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুই ভাগেই ভাগ করা হয়।

প্রাচীন ভারতের ঋষি ও জ্যোতিষীরা ভারতবর্ষকে 'নবখণ্ডে' বা 'নবভেদে' ভাগ করিতেন। প্রাচীন মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে ভারতের পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও জাতি-উপজাতির যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, তাহা কোন আধুনিক ভূগোলের বইতেও পাওয়া যায় না। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষের সমগ্র ভৌগোলিক চিত্র এই বিবরণের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। পুরাণে ভারতের সাতটি পবতকে **কুলাচল** বলা হইয়াছে। হিমবত, হিমাদ্রি বা হিমালয় ভারতের একমাত্র **বর্ষপর্বত**। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিপাত্র, এই সাতটি কুলাচল। বিভিন্ন 'কুল' বা জাতির লোক এই সব পাহাড়ের অঞ্চলে বাস করে বলিয়া ইহাদের 'কুলাচল' বলা হয়। কুলাচলের নিকটে, পুরাণকরা বলিয়াছেন, হাজার হাজার ছোট পাহাড় আছে। মহানদী ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী পর্বতমালাকে 'মহেন্দ্রগিরি' বলা হইত। গঞ্জামের কাছে পূর্বঘাট পর্বতমালার একাংশের নাম এখনও মহেন্দ্রগিরি। 'মলয়গিরি' মালয়লম্ দেশের নামে হইয়াছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার নীলগিরি হইতে কুমারিকা পর্যন্ত অংশকে মলয়কূট বা মলয় বলা হইত। নীলগিরি হইতে পশ্চিমঘাটের উত্তরাংশকে বলা হইত 'সহ্যগিরি'। শুক্তিমান বা শুক্তিমৎ পর্বত কাহাকে বলা হইত, সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন সুলেমান পর্বতমালা, কেহ বলেন মধ্যপ্রদেশের রায়গড়ের

'শক্তি' হইতে মানভূমের দল্‌মা পাহাড় পর্যন্ত পর্বতশ্রেণীকে 'শুক্তিমান' পর্বত বলা হইত। 'ঋক্ষ' ও 'বিন্ধ্য' দুই নামেই বিন্ধ্যাচল পরিচিত ছিল। গুজরাট হইতে গয়া জেলা পর্যন্ত পর্বতমালাকে সাধারণভাবে 'বিন্ধ্য' বলিলে, নর্মদার মধ্যাঞ্চলকে 'ঋক্ষ' বলা যায়। বিন্ধ্য পর্বতমালার যে অংশ ভূপালের পশ্চিমে প্রসারিত, আরাবল্লী পাহাড়-সহ তাহাকে 'পারিপাত্র' বলা হইত।

এইসব পাহাড়-পর্বত হইতে শত শত নদ-নদী বিচিত্র ধারায় ভারতভূমির মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। তাহাদের সুন্দর সুন্দর নামের শ্লোকবদ্ধ বর্ণনা আছে পুরাণে। বিভিন্ন অঞ্চলবাসী নানা জাতি-উপজাতির বিবরণও আছে। তাহাদের নামের তালিকা দিতে হইলেই একটি ছোটখাট বই হইয়া যাইবে। তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সমাজ ধর্ম ইত্যাদির বৈচিত্র্যেরও শেষ নাই, উত্তরের সহিত দক্ষিণের মিল নাই, প্রাচ্যের সহিত অপরান্তের বা পশ্চিমের মিল নাই। এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও ধীরে ধীরে বহু যুগ ধরিয়া ভারতবাসীর মনে এক ঐক্যবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। উত্তরাপথ বা আর্যাবর্ত হইতে আর্যরা ধীরে ধীরে প্রাচ্যে ও দক্ষিণাপথে তাহাদের সমাজ ও সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই অগ্রগতির পথে স্থানীয় বহু জাতি উপজাতির সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, তাহাদের প্রভাব শেষ পর্যন্ত ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের বহু জাতির মধ্যে এক অভিন্ন সমাজচেতনা ও ঐতিহ্যের ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগে এই ঐক্যবোধ আরও গভীর হইয়াছে। শক হূন পাঠান মোগল ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতির আক্রমণে এই ঐক্যের ভিত্তিতে সাময়িক ভাঙন ধরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক

অগ্রগতি ও যানবাহনের বিস্তারের ফলে এই সর্বভারতীয় ঐক্যবোধের পথ আরও প্রশস্ত হইয়াছে। অতীতে ভারতের খণ্ডরাজ্যের রাজারা অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন, এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাহিয়াছেন। তাহাতে ভারতের ঐক্যবোধ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির মহান্ আদর্শ ও ঐতিহ্য সেই ঐক্যবোধ আবার জাগাইয়া তুলিয়াছে। ভারতের ধর্মপ্রবর্তকরা যুগে যুগে এই ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন। আজও আমরা বাঙালী, বিহারী, আসামী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠি প্রভৃতি জাতি প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও সাংস্কৃতিক মর্যাদার জন্য সংগ্রাম করিতেছি, কিন্তু তাহা ভারতকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বিচ্ছিন্ন করিবার সংগ্রাম কখনই নহে, ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রত্যেকের পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মবিকাশের সংগ্রাম মাত্র। এই আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিকাশের ফলে ভারতের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী হইবে এবং তাহাতে ভারতের ঐক্যবদ্ধ শক্তি আরও বাড়িবে। একই পিতা মাতার শিশুসন্তানরা যখন বয়স্ক হয়, তখন তাহারা প্রত্যেকে স্বাতন্ত্র্য দাবী করে, পৃথক পরিবারেও বাস করিতে চায়। তাহা করিলে, পিতামাতার সহিত, অথবা সহোদরদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হয় না, বরং সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন আরও স্থায়ী ও দৃঢ় হয়। ভারতের সাম্প্রতিক প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের নানারকম দাবীও সেইরকম। এই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলে ভারতের সংঘবদ্ধ শক্তি ও ঐক্যবন্ধন অনেক বেশী দৃঢ় হইবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধনার যে সুপ্রাচীন আদর্শ ভারতের গৌরবের বস্তু, তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইবে।



দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় ইতিহাসের আকর ও উপাদান

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে থুকিডিডেস যে পেলপনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।(তিনি তাঁহার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ; "এই যুদ্ধে যেসব ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা কেবল লোকের মুখে গল্প শুনিয়া, বা অনুমানে নির্ভর করিয়া লিখি নাই। যে ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, নিজের জ্ঞান হইতে তাহাই লিখিয়াছি। যেখানে তাহা সম্ভব হয় নাই সেখানে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বহু পরীক্ষার পর গ্রহণ করিয়াছি। এ কাজ কঠিন, কারণ একই ঘটনা যাহারা দেখে তাহাদের বিবরণের মধ্যে, দৃষ্টিভঙ্গি ও স্মৃতিশক্তির তারতম্যের জন্য, অনেক অসঙ্গতি থাকে।" নিজে স্বচক্ষে যাহা দেখেন নাই, অন্যের বিবরণ হইতে তাহার সত্যতা যাচাই করিয়া থুকিডিডেস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সামান্য এই কাজটুকুই যে কত কঠিন, তাহাও তিনি উল্লেখ করিতে ভোলেন নাই। যে কাজ থুকিডিডেস কঠিন বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক কঠিন কাজ এ যুগের ঐতিহাসিকদের নিত্য করিতে হয়। কেবল বিবরণের সত্যমিথ্যা যাচাই নহে, তাহার লিপি কতকালের প্রাচীন, ভাষা কোন্ কালের, অপ্রচলিত লিপির ও ভাষার পাঠোদ্ধার, মাটির নীচে সমাধিস্থ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খুঁড়িয়া বাহির করিয়া, ভূ-স্তর ও নানাবিধ নিদর্শন হইতে তাহার কাল নির্ণয়, মনে হয় যেন অসাধ্য সাধন। প্রাচীনকালের ইতিহাস-লেখকেরা ইতিহাসের নানাবিধ আকরের সন্ধান জানিতেন না এবং জানিলেও সন্ধানের বা উপাদান যাচাইয়ের কলাকৌশল তাঁহাদের

আয়ত্তে ছিল না। থুকিডিডেস আধুনিক ইতিহাসকারদের আকরের বৈচিত্র্য, অনুসন্ধানের ও উপকরণ পরীক্ষার কলাকৌশল দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন।

ঐতিহাসিক উপাদানের আকর

যে সমস্ত আকর (Source) হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা হয়, তাহাদের মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে :

১। প্রত্নতাত্ত্বিক (Archaeological)।

২। প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্য-গ্রন্থ, অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র, পুঁথি-পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি।

৩। সমকালীন ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্মৃতিকথা, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র।

প্রথম শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীর, অর্থাৎ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের আকর নানা রকমের আছে। প্রাচীন যুগের সভ্যতার অনেক নিদর্শন মাটির নীচে চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি নানা কারণে ভূগর্ভে তাহা বসিয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে উপরে তাহা উঁচু ঢিবির মতো হইয়া থাকে, দুই-একটি টুকরা নিদর্শনও উপরে পড়িয়া থাকিতে পারে, যেমন ভাঙা মাটির পাত্রের টুকরা, ভাঙা মূর্তি, মুদ্রা ইত্যাদি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা তাহা দেখিয়া সেই স্থানের গুরুত্ব বুঝিয়া, তাহা ভাল করিয়া জরিপ করিয়া, খুঁড়িতে আরম্ভ করিতে পারেন। এইভাবে উপরের সঙ্কেত পাইয়া, মাটির তলা হইতে মহেঞ্জদাড়ো হড়প্পা ও অন্যান্য অনেক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা হইয়াছে।

এই শ্রেণীর নিদর্শনের মধ্যে শিলানুশাসন বা শিলালেখও

(Inscription) উল্লেখযোগ্য। সেকালের রাজা-রাজড়ারা শিলাফলকে, তাম্রফলকে (Copper-plate Inscription), শিলাস্তম্ভে (Pillar Inscription), গুহাগাত্রে (Cave Inscription) তাঁহাদের ধর্ম, নীতি, রাজ্যশাসনের নির্দেশ ইত্যাদি খোদাই করিয়া লিখিয়া দিতেন। তখন ছাপাখানা বা সংবাদপত্র ছিল না, তাই দেশের লোকদের এইভাবে রাজ-আদেশ জানানো হইত। আমাদের ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের শিলালেখগুলি ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এইসব শিলালিপি ও তাম্রলিপি হইতে সেকালের ইতিহাসের অনেক উপাদান সংগ্রহ করা যায়। প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক উপাদান শিলা-তাম্রলিপি হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

প্রাচীন লেখমালার মতো প্রাচীন মুদ্রাও (Coins) ইতিহাসের অন্যতম প্রাথমিক আকর। মুদ্রাতে রাজার নাম, সন-তারিখ, তাঁহার চিত্র ও আরাধ্য দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি খোদাই করা থাকে। সন-তারিখ ও রাজার নাম হইতে তো বটেই, মুদ্রাঙ্কিত সাঙ্কেতিক চিত্র ও মূর্তি হইতেও সেকালের কথা অনেক জানা যায়। যেমন সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় ঘোড়ার চিত্র হইতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ইঙ্গিত, সাতবাহন মুদ্রায় সমুদ্রগামী জাহাজের ছবি হইতে সমুদ্রযাত্রার আভাস পাওয়া যায়। মুদ্রার ধাতু-পরিমাণ বা ওজন, ধাতুর বিশুদ্ধতা ও খাদ ইত্যাদি দেখিয়া তখনকার রাজ্যের আর্থিক অবস্থাও খানিকটা অনুমান করা যায়। প্রাচীন বিদেশী মুদ্রা কোন অঞ্চলে পাওয়া যাইলে বুঝিতে পারা যায়, সেই দেশের সহিত আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্বন্ধ ছিল। দাক্ষিণাত্যের বহু স্থান হইতে প্রাচীন রোমান মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে তাম্রলিপ্ত-তমলুকের কাছাকাছি অঞ্চল হইতেও পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে

বুঝা যায় যে প্রাচীন কালে ভারত ও রোমের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। প্রাচীন মুদ্রা হইতে এইভাবে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত কথা ঐতিহাসিকেরা জানিতে পারিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধারে প্রাচীন মুদ্রার একটি স্মরণীয় দান আছে, যাহা সকলেরই জানা উচিত। অধুনা অপ্রচলিত ভারতের দুইটি লিপি হইল, **খরোষ্ঠী** ও **ব্রাহ্মী**। খরোষ্ঠী লিপি উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ছিল এবং ব্রাহ্মী লিপি পরবর্তী কালের যাবতীয় ভারতীয় লিপির জননী বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। অশোকের লিপিগুলির মধ্যে দুই-একটি খরোষ্ঠীতে ছাড়া বাকি সব ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। এই লিপির পাঠোদ্ধার করিতে না পারিলে প্রাচীন ভারতের অনেক কথা আমরা জানিতে পারিতাম না। অপ্রত্যাশিত উপায়ে প্রাচীন মুদ্রা হইতে এই লিপির রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতের গ্রীক রাজারা (আনুমানিক ২০০-২৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) এক প্রকারের দ্বি-ভাষিক (bilingual coins) মুদ্রার প্রচার করিয়াছিলেন। মুদ্রার একদিকে গ্রীক অক্ষরে, অপরদিকে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী অক্ষরে রাজাদের নাম-উপাধি লেখা থাকিত। এই মুদ্রা আবিষ্কারের পর, গ্রীক রাজাদের ভারতীয় নাম মিলাইয়া, আবার তাহার সহিত খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীর পাঠ যাচাই করিয়া, অনেক কষ্টে প্রাচীন লিপি দুইটির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়। পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা এইভাবে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া এই দুই প্রাচীন ঐতিহাসিক ভারতীয় বর্ণমালার পাঠোদ্ধার করেন, জেম্‌স প্রিনসেপ (James Prinsep) তাঁহাদের অন্যতম। প্রাচীন মুদ্রা হইতে লিপির রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয় এবং তাহার পর প্রাচীন শিলালেখের পাঠোদ্ধার করিয়া অশোকের যুগের অনেক কথা ঐতিহাসিকেরা

জানিতে পারেন। সুতরাং শিলালেখ ও মুদ্রা দুইই প্রাচীন ইতিহাসের আকর হিসাবে সমান মূল্যবান।

(শিলালেখ ও মুদ্রা ছাড়াও, প্রাচীন স্তম্ভ স্তূপ গুহা মন্দির ইত্যাদির স্থাপত্য (Architecture) ও ভাস্কর্য (Sculpture) হইতে সেকালের সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। যেমন হায়দ্রাবাদে অজন্তা গুহার গায়ে জীবজন্তু, প্রাকৃতিক দৃশ্য, দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবন, গ্রাম নগর রাজসভা ইত্যাদির যেসব চিত্র আছে, তাহা হইতে গুপ্তযুগের ভারতের সমাজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুন্দর ধারণা করা যায়। প্রাচীন স্তূপ, চৈত্য গুহা, দেবালয়, মসজিদ ইত্যাদির গড়ন ও কারুকার্য হইতেও তখনকার শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।)

প্রথম শ্রেণীর প্রত্নতাত্ত্বিক আকরের মধ্যে এইগুলি প্রধান এবং এই ভূগর্ভস্থ ধ্বংসাবশেষ, শিলালেখ, তাম্রলিপি, মুদ্রা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য হইতেই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সর্বাধিক পরিমাণে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণীর আকর দুইভাগে ভাগ করা যায়: (১) প্রাচীন শাস্ত্র, পুঁথি ও সাহিত্য-গ্রন্থ; (২) পুরাতন সরকারী দলিল-দস্তাবেজ ও নথিপত্র। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতিশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত, জৈন বৌদ্ধ গ্রন্থ, অর্থশাস্ত্র, মনুস্মৃতি ইত্যাদি প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে ইতিহাসের উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা যায় এবং ভারতীয় ইতিহাস-কারেরা করিয়াছেন। প্রাচীন কালে, এমনকি মধ্যযুগেও, সরকারী দলিল-দস্তাবেজ রক্ষা করার রীতি ছিল না। আধুনিক কালে, আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমল হইতেই উহা প্রচলিত হইয়াছে।

ইংরেজদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁহারা লিখিয়া রাজ্য চালাইতেন এবং লেখার আধিক্যের জন্য তাঁহাদের আমল হইতে 'ফাইল্ম ও লাল ফিতা'র (File-Red tape) শাসনের প্রবাদ রটিয়াছে। ব্রিটিশ আমলের ইতিহাস রচনার জন্য দলিল-দস্তাবেজ হইতে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও কমনওয়েল্থ রিলেশান্স আপিসের লাইব্রেরীতে, এবং ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় (National Archives) ও প্রাদেশিক সরকারের 'রেকর্ডস-গৃহে' এই শ্রেণীর প্রচুর উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণী। ইতিহাসের উপাদানের তৃতীয় শ্রেণীর আকরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে, সমকালীন ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্মৃতিকথা ইত্যাদি। সেকালেও সমকালীন ইতিহাস লেখার কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছে, যেমন বিহ্লনের বিক্রমাঙ্কচরিত, বাণভট্টের হর্ষচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, মুসলমান যুগের আইন-ই আকবরী, রিয়াজ-উস-সলাতিন, তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, তবকাত-ই-নাসিরী ইত্যাদি। এইসব ইতিহাস-গ্রন্থ রাজপ্রশস্তি বা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট হইলেও, ইতিহাসের অনেক উপাদান সাবধানে বিচার করিয়া ইহা হইতে সংগ্রহ করা যায়।

বিদেশীরা দীর্ঘকাল হইতে ভারতের ধর্ম, অর্থ, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এদেশে আসা-যাওয়া করিতেছেন। এই পর্যটকদের মধ্যে অনেকে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ভূগোল, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস ও টলেমির বিবরণ, 'পেরিপ্লাসে'র বাণিজ্য ও বন্দরের বিবরণ, চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ, ইৎ-সিঙ প্রভৃতির বিবরণ হইতে আমরা অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি। মুসলমান যুগে অল-বিরুনি, ইবন

বতুতা, রুশ নিকিটিন, ইটালিয়ান নিকলো কোন্তি, আরব রজ্জাক, ফরাসী বার্নিয়ের, তাভার্নিয়ের, ইংরেজ টমাস রো, র‍্যালফ ফিচ্ ও অন্যান্য পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে ইতিহাসের অনেক উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে। বিশপ হেবরের ভ্রমণকাহিনী, উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথা, হেজেসের দিনপঞ্জী ইত্যাদিতে ইংরেজ আমলের অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়।

বিভিন্ন যুগের ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন আকরের গুরুত্বের তারতম্য আছে। প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে প্রথম শ্রেণীর প্রত্নতাত্ত্বিক আকরের উপর নির্ভর করিতে হয় বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য-শাস্ত্রগ্রন্থের আকর হইতেও প্রাচীন কালের উপাদান পাওয়া যায়। মধ্য যুগের ইতিহাস রচনায় শিলালিপি ও মুদ্রা ছাড়াও, সমকালীন ইতিহাস, সাহিত্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত ইত্যাদির উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়। আধুনিক যুগের প্রধান আকর সরকারী প্রকাশিত-অপ্রকাশিত দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র, সমকালীন সংবাদ-পত্র, স্মৃতিকথা ইত্যাদি। এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর আকর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন যুগের ইতিহাস রচনা করা হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে।



তৃতীয় অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক ভারত

প্রাগৈতিহাসিক ভারতের ইতিহাস রূপকথার মতো রোমাঞ্চকর। কিন্তু তাহা রূপকথা নহে, ইতিহাস। সেই ইতিহাস গত প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া ভূতত্ত্ববিদ্ (Geologist), নৃতত্ত্ববিদ্ (Anthropologist) ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা (Archaeologist) অসীম ধৈর্য সহকারে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কঠোর সাধনার ফলে ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস আজ প্রস্তর-যুগের (Stone Age) দূর দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে।

প্রস্তর-যুগের ভারত

প্রস্তর-যুগকে পণ্ডিতেরা প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করেন, প্রত্ন-প্রস্তর যুগ (Paleo-lithic Age) ও নব্য-প্রস্তর যুগ (Neo-lithic Age)। প্রত্ন-প্রস্তর যুগে মানুষ নানারকমের পাথরের মুষল ও পাশ-ছিলা হাতিয়ার দিয়া জীবজন্তু শিকার করিত। প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এইভাবে শিকারী যাযাবরের জীবন মানুষ যাপন করিয়াছে। আন্দামানীদের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তখন খাদ্য-সংগ্রহ করা ছাড়া মানুষ খাদ্য উৎপাদন করিতে পারিত না। স্থায়ী বসতি ও সমাজ তাই প্রত্ন-প্রস্তর যুগে মানুষ গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। মানুষ যখন মাটিতে নিজে ফসল ফলাইতে শিখিল, তখন হইতে নব্য-প্রস্তর যুগের সূচনা। প্রায় দশ-বারো হাজার বৎসর আগেকার কথা। প্রাচীন ইতিহাসবিদ্‌রা বলেন, নব্য-প্রস্তর যুগের

এই কৃষিকর্মের (Agriculture) আবিষ্কারের মতো যুগান্তকারী ঘটনা, বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্বে, আর কখন ঘটে নাই।

১৮৬৩ সালে ব্রুস ফুট (Bruce Foote) প্রথমে দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজের নিকট পল্লবরম্ স্থানে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার কুড়াইয়া পান। তাহার পর হইতে প্রস্তর-যুগের উপকরণ অনুসন্ধান ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম অঞ্চলের নানা স্থান হইতে প্রস্তর-যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের চক্রধরপুর, সিঙ্গনপুর, মির্জাপুর, হোসাঙ্গাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে, ইয়োরোপ ও আফ্রিকার মতো, গুহাগাত্রে প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলার নিদর্শনও অনেক দেখা যায়। এইসব প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন হইতে বুঝা যায়, প্রত্ন-প্রস্তর যুগ হইতেই উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে মানুষ চলাফেরা করিতেছে। সমাজের কোন স্থায়ীরূপ তাহারা বিশেষ দিতে পারে নাই। কিন্তু নব্য-প্রস্তর যুগে ভারতে বেশ সুবিস্তৃত সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রধানতঃ তাহা ছিল কৃষিজীবী ও পশুপালকদের সমাজ ও সভ্যতা। স্থায়ী গ্রাম ও জনবসতি সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

সিন্ধু উপত্যকায় নব্য-প্রস্তর যুগের বসতির চিহ্ন মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। তাহার ফলে একটি অঞ্চলেই নব্য-প্রস্তর যুগের গ্রাম্য সভ্যতা হইতে পরবর্তী তাম্র-প্রস্তর যুগের মহেঞ্জদাড়ো-হড়প্পার উন্নত নগরসভ্যতা পর্যন্ত অগ্রগতির ধারা অনুসরণ করা যায়। সিমলা পাহাড়ের পাদদেশ হইতে আরব সাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধু উপত্যকার প্রায় ৬০টি বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা

সিন্ধু - উপত্যকা ও বৈদিক - ভারত

গান্ধার
কুরু
হরাপ্পা
ভরত
কুরু
হিমালয়
হস্তিনাপুর
শ্রাবস্তী
সিন্ধু নদ
ইন্দ্রপ্রস্থ
পাঞ্চাল
কোশল
শাক্য
মহেঞ্জোদড়ো
মথুরা
যমুনা নঃ
গঙ্গা নঃ
অঙ্গ
অবন্তী
মগধ
দ্বারকা
বিন্ধ্য পর্বত
কলিঙ্গ
তাপ্তি নঃ

এক বিরাট সুসমৃদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন মাটি খুঁড়িয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। পাঞ্জাবের হড়প্পা ও সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জদাড়ো এই সভ্যতার দুইটি প্রধান কেন্দ্র, এবং দুইটিই বেশ সমৃদ্ধ নগর। হড়প্পা হইতে মহেঞ্জদাড়োর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মাইল। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার এই বিস্তার দেখিয়া মনে হয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০-১৫০০ বৎসর আগে, এই বিশাল অঞ্চল জুড়িয়া এক বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহার দুইটি রাজধানী ছিল, হড়প্পায় ও মহেঞ্জদাড়োতে। ইহার পূর্বদিকে সমতল অঞ্চলের গ্রাম, পশ্চিম-দিকে পার্বত্য গ্রাম। তাহার মধ্যে এত বড় নগর-প্রধান সভ্যতার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া কোন কেন্দ্রীয় শাসনের সুব্যবস্থা ভিন্ন কখনই সম্ভব হইত না। হুইলার (Mortimer Wheeler), পিগট (Stuart Piggott) প্রমুখ অভিজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা সিন্ধু-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

নগর-পরিকল্পনা। প্রথমে হড়প্পা-মহেঞ্জদাড়োর নগর-পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিতে হয়। নগরের পথঘাট, ঘরবাড়ী ও বসতির বিন্যাস দেখিয়া মনে হয়, পূবনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নগর গড়িয়া তোলা হইয়াছে। উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে সোজাসুজি নগরের পথগুলি বিন্যস্ত। বড় রাস্তা ৩০ ফুটের বেশী প্রশস্ত নহে এবং তাহার সংখ্যা অল্প। অলিগলির সংখ্যাই বেশী। ঘরবাড়ী পাকা, দোতলাই বেশী, সারিবদ্ধ 'ব্লকে'র মতো, পোড়ানো ইটের তৈরী। বড় রাস্তার দিকে জানলা দরজা নাই, পাশের সরু গলির দিকেই জানালা-দরজা। দরজা দিয়া ঢুকিলে ভিতরের উঠানে যাওয়া যায়। প্রায় একই ধরনের গড়ন সব বাড়ীর, আকারে ছোট বড় আছে। ছাদ সমতল, কাঠের কড়ি-বরগার উপর ঘাস-বাতার পাটি করিয়া মাটি

দিয়া লেপা। ইঁট বা কাঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠা যায়। ভিতরের উঠানমুখী সব ঘর ও বারান্দা। ব্যারাকের মতো (মার্টিমার হুইলার বলিয়াছেন 'মজুরদের বাসগৃহ') ছোট ছোট ঘরের সারিবদ্ধ গৃহও আছে। রাস্তায় ময়লা নিষ্কাশনের নর্দমা আছে, এমন কি অধিকাংশ গৃহের বাহিরের দেয়ালে নালি আছে। নালি দিয়া গৃহের ময়লা আসিয়া বাহিরে রাস্তার ধারে চৌবাচ্চায় বা টবে জমা হয়। বেশীর ভাগ গৃহে পাতকুয়ার ব্যবস্থা আছে।

ইহা ছাড়াও নগরের মধ্যে দুর্গ, সাধারণের ব্যবহারের জন্য বৃহৎ স্নানাগার, শস্যাগার, স্তম্ভবিশিষ্ট বড় হলঘর, সভাগৃহ ইত্যাদিও আছে দেখা যায়। কোন কেন্দ্রীয় শাসন-পরিচালনার ব্যবস্থা ভিন্ন যে রাস্তার নালা-নর্দমা, সাধারণের স্নানাগার, শস্যাগার, হলঘর ইত্যাদি করা সম্ভব হইত না, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

জীবনযাত্রা। নগরের রূপ হইতেই সিন্ধু উপত্যকার নাগরিকদের জীবনযাত্রার আভাস পাওয়া যায়। বড় রাস্তার উপর দিয়া গরু-মহিষের গাড়ী ছাড়া আর কোন গাড়ী চলিত না। পাঞ্জাব অঞ্চলে আজও যে-রকম নীরেট ভারী চাকার গরুর গাড়ী দেখা যায়, সিন্ধু অঞ্চলে ঠিক সেই ধরনের পোড়ামাটির চাকাওয়ালা গাড়ী (খেল্না) পাওয়া গিয়াছে। এই গরুর গাড়ীতে নগরের জিনিসপত্র বহনের কাজ চলিত। পোশাক-পরিচ্ছদ পাঞ্জাব-সিন্ধু অঞ্চলের গ্রাম্য লোকের পোশাকের মতোই ছিল, তবে আরও সাদাসিধা ছিল, ছাঁটকাটের বাহুল্য ছিল না। অলঙ্কারের নানারকমের যেসব নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, মেয়েরা তখন গহনাগাটি যথেষ্ট ব্যবহার করিত। যেসব পোড়ামাটির মূর্তি ও পুতুল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায়, নানা প্রকারের কেশবিন্যাসও মেয়েরা করিত।

সারাদিন কাজকর্ম করিয়া, গ্রীষ্মের দিনে সাধারণ স্নানাগারে স্নান করা নগরবাসীদের কাছে নিশ্চয় আনন্দের ব্যাপার মনে হইত। ছুরি, ভোজালি, কুঠার ইত্যাদি যেসব তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপযোগিতা দেখিয়া মনে হয় না যে সিন্ধু উপত্যকার নগরবাসীরা যুদ্ধবিদ্যার চর্চা করিত। তাহারা শান্তিপ্রিয় নাগরিক ছিল, এবং প্রধানতঃ ব্যবসাবাণিজ্য কাজকর্ম করিয়াই শান্তিতে দিন কাটাইত।

সমাজের গড়ন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০-১৫০০ অব্দে, অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় চার-পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এরকম সমৃদ্ধ নগর-সভ্যতা, ধনসম্পদের সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য ভিন্ন গড়িয়া তোলা কখনই সম্ভব হইত না। কোথা হইতে এই ধনসম্পদ আসিত? প্রধানতঃ বাণিজ্য হইতে। বেলুচিস্থান ও রাজপুতানা হইতে তামাযুক্ত খনিজ আনিতে হইত এবং সেই খনিজ হইতে নগরের কারিগররা তামা গালাইয়া নানারকমের পাত্র ও হাতিয়ার নির্মাণ করিত। টিন বোধ হয় আরও দূর হইতে সংগ্রহ করিতে হইত, কারণ তাহা না হইলে তামার সহিত টিন মিশাইয়া ব্রোঞ্জের পাত্র-হাতিয়ার গড়া সম্ভব হইত না। অন্যান্য আরও দ্রব্য, পাথর মার্বেল ইত্যাদিও বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করা হইত। এইসব বাণিজ্যের উপাদান ও জিনিসপত্র দেখিয়া হড়প্পা-মহেঞ্জদাড়োর বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সীমানা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান, পারস্য, মেসোপোতামিয়া, দক্ষিণ-ভারত ও পশ্চিম-ভারত পর্যন্ত বাণিজ্যের যোগ ছিল। স্থলপথে ও নদী-সমুদ্রপথে বাণিজ্যের লেনদেন হইত। নদীপথে সিন্ধুর সহিত সাগরের যোগ ছিল, এবং আরব সাগর হইতে বহু দূর দেশেও বাণিজ্যের জন্য পাড়ি দেওয়ার অসুবিধা

ছিল না। মাস্তুল, দাঁড়, মাঝিদের বা নাবিকদের কেবিন-সহ বড় বড় নৌকা বোধ হয় কারখানায় তৈরী হইত। সীলমোহর ও মাটির পাত্রের গায়ে এই ধরনের নৌকার চিত্র অঙ্কিত আছে দেখা যায়। স্থলপথে উট, ঘোড়া, হাতি ও গাধার পিঠে জিনিস চালান যাইত। নানারকমের ওজন-বাটখারা এই অঞ্চলে অনেক পাওয়া গিয়াছে এবং দাঁড়িপাল্লা অল্প হইলেও, একেবারে যে পাওয়া যায় নাই তাহা নহে। তূলার কাপড়ও সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে, মধ্যপ্রাচ্য ও মিশরের সমকালীন নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া যায় নাই।

এসব সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির নিদর্শন। নগরের মধ্যে বণিক ও কারিগরশ্রেণীই বেশী বাস করিত। নগরের বাহিরে ছিল কৃষিপ্রধান গ্রাম্যসমাজ। গ্রামাঞ্চলে গম বার্লি প্রভৃতির চাষ হইত। গম পিষিবার পাথরের যাঁতাও সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে। প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন না হইলে, এত বড় বাণিজ্য-প্রধান নগর চার-পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে গড়িয়া উঠিতে পারিত না। কৃষকদের সহিত কারিগরদের শস্য ও পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান চলিত। সাধারণ সমাজের ভিত্তি ছিল কৃষিপ্রধান গ্রাম এবং তাহার উপর বণিক ও কারিগর-প্রধান নাগরিক সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মর্টিমার হুইলার বলিয়াছেন যে যাবতীয় নিদর্শন বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে মধ্যপ্রাচ্য ও মিশরের প্রাগৈতিহাসিক নগর-রাষ্ট্রের (city-state) গড়নের সহিত মহেঞ্জদাড়ো হড়প্পার নাগরিক সমাজের সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুমেরের নগর-রাষ্ট্রের প্রধান অভিভাবক ছিলেন প্রধান দেবতা, বা পুরোহিত-সম্রাট। নগরের মধ্যে ছিল বিরাট দেবালয়, তাহার চারিদিকে ছিল শস্যাগার, কারিগরদের কারখানা ইত্যাদি। তাহাদের বিন্যাস ও শৃঙ্খলা দেখিয়া নগর-রাষ্ট্রের

কঠোর শাসন-ব্যবস্থার কথাই মনে হয়। সিন্ধু উপত্যকার নগর-সভ্যতার মধ্যেও এই সামাজিক চিত্র ফুটিয়া উঠে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নদীতীরবর্তী বড় বড় সভ্যতার যে বৈশিষ্ট্য ছিল, সিন্ধু উপত্যকায় তাহার ব্যতিক্রম বিশেষ হয় নাই। সীলমোহর ইত্যাদিতে দেবদেবীর মূর্তির বাহুল্য দেখিয়া বুঝা যায়, পুরোহিতশ্রেণীর বেশ আধিপত্য ছিল। রাজ্য ও নগর পরিচালনায় সম্রাটের প্রধান সহায় তাঁহারাই ছিলেন। বণিকদের বাণিজ্যের অধিকার থাকিলেও, সর্ব ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। কারিগররা অনেকটা দাস-ভৃত্যের মতো জীবন কাটাইত।

ভারতবর্ষে প্রায় মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত, সিন্ধু-উপত্যকার নাগরিক সমাজের এই শ্রেণীগত গড়নের এবং নগরের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী ইত্যাদির বিন্যাস ও পরিকল্পনার মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় নাই দেখা যায়। ভারতের ইতিহাসে কেবল গ্রাম্যসমাজের নহে, নাগরিক সমাজের ঐতিহ্যও খুব প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মধ্য-যুগের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই দুই সমাজের মৌলিক গড়ন প্রায় এক-ধরনের ছিল। মাটির উপরে আজও যেসব প্রাচীন মধ্যযুগের নগর ভারতবর্ষে আছে, তাহাদের সহিত মাটির নীচের হড়প্পা-মহেঞ্জদাড়োর নগরের অনেক দিক হইতে সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।



চতুর্থ অধ্যায়

বৈদিক সমাজ ও সভ্যতা

'আর্য' বা 'দ্রাবিড়' কোন জাতির নাম নহে, ভাষার নাম। বাংলা ভাষাভাষীদের যেমন 'বাঙালী' বলা হয়, আর্য ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের তেমনই আর্য বা দ্রাবিড় বলা হয়। ভাষাবিদ্‌রা মনে করেন, সংস্কৃত গ্রীক লাটিন পারসীক প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলি কোন একটি মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ এইসব ভাষার অনেক শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এই মূল ভাষায় যাঁহারা ভাবের আদান-প্রদান করিতেন, তাঁহাদেরই পণ্ডিতেরা 'আর্য' বলেন। জাতি হিসাবে তাঁহারা মূলতঃ শ্বেতকায় (Caucasoid) হইলেও, তাঁহাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার একাধিক নৃতাত্ত্বিক নাম আছে। এককালে বা একসঙ্গে আর্যরা ভারতে আসেন নাই, বিভিন্ন সময়ে তাঁহাদের নানা শাখা-প্রশাখা দলে দলে আসিয়াছেন। কোথা হইতে এবং কোন্ সময় হইতে তাঁহারা আসিতে আরম্ভ করেন?

পণ্ডিতদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই প্রশ্নের উত্তর লইয়া তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে। কেহ বলেন পূর্ব-ইয়োরোপ হইতে, কেহ বলেন দক্ষিণ রাশিয়া বা উত্তর মেরু হইতে, আর্যরা আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে আর্যরা এদেশেরই লোক, বাহির হইতে আসেন নাই। এইসব মতামতের মধ্যে একটি মত এই যে পূর্ব-ইয়োরোপের কোন স্থান হইতে আর্যরা প্রথমে মেসোপোতামিয়ায় আসেন। সেখানে বাবিল, আসুরীয় ও অন্যান্য সুসভ্য জাতির সহিত তাঁহাদের সান্নিধ্য ঘটে। পরে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-র দিকে তাঁহাদের কতকগুলি

দল পূর্বে পারস্য দেশে ও ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে তাঁহারা যে বৈদিক ধর্ম মন্ত্র সূক্ত ইত্যাদি লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে বাবিল আসুরীয় ও পশ্চিম-এশিয়ার অন্য সভ্য জাতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

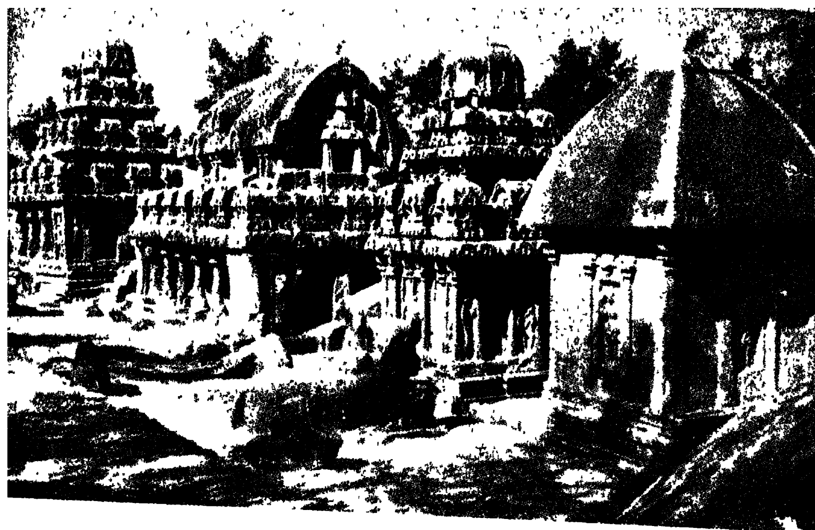
সিন্ধু সভ্যতার পতন ও আর্যদের আগমন

প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দিয়া এখন আর্যদের ভারত আগমন সম্পর্কে বিতর্কের অবসান করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মার্টিমার হুইলার সিন্ধু সভ্যতার পতন এবং আর্যদের অভিযান, ভারতীয় ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণের এই দুই ঘটনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছেন। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে (পাঞ্জাব ও তাহার পরিপার্শ্ব) আর্যরা আসিয়া স্থানীয় অনার্যদের সুরক্ষিত নগরে বারংবার হানা দিয়াছিলেন, ঋগ্বেদে তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব নগরকে ঋগ্বেদে 'পুর' বা দুর্গ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র তাঁহার ভক্ত আর্যদের এইসব 'পুর' ধ্বংস করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে 'পুরন্দর' (যিনি 'পুর' ধ্বংস করেন) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্র-ভক্ত আর্য দলপতি দিবোদাসের জন্য দেবতা ইন্দ্র ৯০-টি 'পুর' ধ্বংস করিয়াছিলেন। স্থানীয় অনার্য দলপতি শম্বরের শত দুর্গ তিনি চূর্ণ করিয়া আর্যদের জয়যাত্রায় সহায় হইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতেছে, এইসব 'পুর' তাঁহারা সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে কোথায় পাইলেন? স্বভাবতঃই আজ হড়প্পা মহেঞ্জদাড়ো ইত্যাদি নগরের কথা মনে হয়। নগরগুলিও দেখা যায় সুরক্ষিত, দুর্গের মতো, সুতরাং ঋগ্বেদের বিবরণের সহিত মিলিয়া যায়। হড়প্পা সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের পর্বও খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০-১৫০০এর মধ্যে



হোসাঙ্গাবাদের প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র





মহাবলীপুরমের মন্দির (পল্লব স্থাপত্য)

বুদ্ধপূজা : গান্ধার রীতির ভাস্কর্য : গ্রীক প্রভাব লক্ষণীয়

বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাহার পরে অবনতি ও ধ্বংসের চিহ্ন ভূগর্ভে ছড়ানো রহিয়াছে দেখা যায়। মৃত মানুষের স্তূপাকার কঙ্কালও পাওয়া গিয়াছে। এগুলি যুদ্ধ ও সংঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন। অন্য কোন বিপর্যয়েও সিন্ধু সভ্যতা এইভাবে ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু নীরেট নিদর্শনের সহিত আর্যদের নিজেদের বর্ণনা যখন মিলিয়া যাইতেছে, একই অঞ্চলে ও একই কালে, তখন অন্য সম্ভাবনার কথা না ভাবিলেও অন্যায় হয় না।

বৈদিক যুগ

আর্যরা ভারতে আসিয়া প্রথমে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন (পূর্ব-আফগানিস্থান হইতে গঙ্গার উত্তর উপত্যকা পর্যন্ত)। তারপর ধীরে ধীরে আরও পূর্বে ও দক্ষিণে তাঁহারা অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা হইতে আর্যদের এই স্থিতি গতি বসতি এবং সমাজ-সভ্যতার প্রসারের পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিভাগ এইঃ

বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণ আরণ্যক, উপনিষদ	}	(আনুমানিক) ২৫০০-১০০০	খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
শ্রৌতসূত্র	ঃ	৮০০-৪০০	খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
ধর্মসূত্র	ঃ	৬০০-৩০০	খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

বেদ-সংহিতা হইতে উপনিষদের কাল পর্যন্ত বৈদিক যুগের প্রথম পর্ব এবং সূত্র-সাহিত্যের কাল শেষ পর্ব বলা হয়। কেহ কেহ বেদ-সংহিতার কালকেই কেবল আদিপর্ব বলেন। 'সংহিতা' কথার অর্থ সংগ্রহ (collection)। ঋক্‌মন্ত্র, গীতমন্ত্র ও যাগযজ্ঞের মন্ত্রের সংগ্রহ বলিয়া ঋগ্বেদ-সংহিতা, সামবেদ-সংহিতা ও যজুর্বেদ-সংহিতা বলা হয়।

এই তিনটিই প্রধান বেদ। পরে জাদুবিদ্যা ইত্যাদির স্তব-মন্ত্রের সংগ্রহ 'অথর্ববেদ-সংহিতা'কেও বেদের মধ্যে গণ্য করিয়া 'চারি বেদ' করা হইয়াছে। 'ব্রাহ্মণ', 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ' প্রথম তিনটি বেদের পরে রচিত ও সংকলিত, 'সূত্র' রচনার কাল আরও পরে। বৈদিক সাহিত্যের এই বিভিন্ন শাখার ভিতর দিয়া আর্য সমাজ-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এবং তাহার ক্রমবিস্তার সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়।

বৈদিক সমাজ ও ধর্ম

ঋগ্বেদের যুগে আর্যরা সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন গ্রামে বাস করিতেন। কাঠ ও গাছের লতাপাতা বাতা দিয়া সম্ভবতঃ তাঁহারা বাসের গৃহ নির্মাণ করিতেন এবং প্রত্যেক গৃহে রন্ধনাদির জন্য 'অগ্নিশাল' থাকিত। 'কৃষ্টি' বা কৃষিকাজই তাঁহাদের প্রধান জীবিকা ছিল এবং তাঁহারা ধান ও যবের চাষ করিতেন। পশুপালনও তাঁহাদের অন্যতম বৃত্তি ছিল। ইহা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যও তাঁহারা করিতেন বলিয়া মনে হয়। আর্যদের সমাজ ছিল পিতৃপ্রধান ও পরিবারকেন্দ্রিক। পরিবার-গ্রাম-বিশ-জন, এই ছিল আর্যসমাজের গোষ্ঠী ও বসতি-বিন্যাস। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন করিয়া কর্তা বা অভিভাবক থাকিতেন, যেমন :

পরিবার : গৃহপতি ॥ গ্রাম : গ্রামণী
বিশ : বিশপতি ॥ জন : গোপা (জনপতি), রাজা

কয়েকটি পরিবার লইয়া গ্রাম, কয়েকটি গ্রাম লইয়া বিশ্, কয়েকটি বিশ্ লইয়া জন, মনে হয় আর্যসমাজের এই ধরনের একটা গড়ন ছিল। জনের সকলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল রাজার। 'সমিতি'তে রাজা জন-প্রতিনিধিদের সহিত, অর্থাৎ গ্রামণী, বিশ্পতি ও অন্যান্য

গোষ্ঠীপতিদের সহিত মিলিত হইয়া, রাজ্যের নানা বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। গ্রামের পাঁচ-দশজন, অথবা এক-একটি জনের প্রবীণ ব্যক্তিরা মধ্যে মধ্যে একটি 'সভা'তে মিলিত হইয়া প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করিতেন।

বৈদিক যুগের প্রথম পর্বে আর্য সমাজের গড়ন বিশেষ জটিল ছিল না দেখা যায়। তাহার বিস্তারও ছিল না বেশী। পরবর্তী পর্বে আর্যদের প্রধান বসতিকেন্দ্র হয় 'মধ্যদেশ'। 'ধ্রুব মধ্যদেশ' বলিত—'ধ্রুবা মধ্যমা দিশ।' সরস্বতী নদীর তীর হইতে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ পর্যন্ত অঞ্চলকে তাঁহারা মধ্যদেশ বলিতেন। ইহার মধ্যে আর্যদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উত্থান-পতনও হইয়াছিল দেখা যায়। ভারত, ত্রিৎসু, পুরু প্রভৃতি জনের (tribe) আর নাম শোনা যায় না, কুরু ও পঞ্চাল জনেরাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাই মধ্যদেশের অধিপতি। ভারতদের মহিমা ও কীর্তি স্মরণ করিয়া গাথা রচিত ও গীত হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের কর্তৃত্ব আর তখনই নাই দেখা যায়। এই ভারত-গাথা কেন্দ্র করিয়া, আরও অনেক বীরগাথা, কাহিনী, আখ্যায়িকা, ইতিবৃত্ত সংযোজন করিয়া, পরবর্তীকালে আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় মহাকাব্য 'মহাভারত' রচিত হইয়াছে, এবং এই ভারতদের নামেই আমাদের দেশের নাম হইয়াছে 'ভারতবর্ষ'। কুরু ও পঞ্চাল জনদের এই মধ্যদেশ হইতে আর্য সভ্যতা পরে কোশল কাশী ও গণ্ডকের পূর্বে বিদেহদের দেশে, অঙ্গ জন (পূর্ব বিহারে), মগধ জন (দক্ষিণ বিহারে), পুণ্ড্র জন (উত্তর বঙ্গে), পুলিন্দ ও শবর জন (বিন্ধ্যারণ্যে) এবং গোদাবরী উপত্যকায় অন্ধ্র জনদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এই সময় হইতে মধ্যদেশ আর্যসভ্যতার মধ্যকেন্দ্র হইয়া উঠে।

বৈদিক যুগের এই শেষ পর্বে আর্যদের আর্থিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন আরও উন্নত ও জটিল হইয়া উঠে। চাষের জমির মালিক কৃষকদের বদলে বড় বড় ভূসম্পত্তির মালিক জমিদারগোষ্ঠীর বিকাশ হয়। কৃষি সাধারণ লোকের প্রধান জীবিকা হইলেও, ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও স্বতন্ত্র বণিকগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। কারুকর্ম বংশানুক্রমিক পেশারূপে বিভক্ত হইতে থাকে এবং অনেকটা তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া জাতিবর্ণভেদ দেখা দেয় সমাজে। বণিক ও কারুজীবীরা 'গণ' (guild) হিসাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া যায়। আগের দিনের জনপতি গোষ্ঠীপতি ও দলপতির বদলে বড় বড় 'রাজারা' দেখা দেন এবং তাঁহাদের কর্তৃত্বও বাড়িয়া যায়। রাজকীয় যাগযজ্ঞের প্রচলন হয়, যেমন রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই চারিটি বর্ণে সমাজ আগেই বিভক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৈদিক যুগের গোড়াতে বর্ণবন্ধন ও গোঁড়ামি দৃঢ় ছিল না। পরবর্তীকালে এই বন্ধন ক্রমেই দৃঢ় হইতে থাকে এবং উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতাও দেখা দেয়। অনার্যদের সহিত পদে পদে সংঘাত হয় এবং ক্রমে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিলে শূদ্রবর্ণের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। এইভাবে আর্যরা মধ্যদেশ হইতে ক্রমে পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতের দিকে আধিপত্য বিস্তারের জন্য অগ্রসর হইতে থাকেন।

এই সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ বেদ-সংহিতার যুগ হইতে উপনিষদ-ব্রাহ্মণ-সূত্র সাহিত্যের যুগ পর্যন্ত (খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০-৩০০) আর্যদের সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থার যেমন পরিবর্তন হয়, ধর্মচিন্তা ও ধ্যানধারণারও তেমনিই রূপান্তর ঘটে। ঋগ্বেদের দেবতারা অধিকাংশই প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিমূর্তি ছিলেন, ইন্দ্র ঊষা বরুণ অগ্নি মরুৎ সকলে। সরল

মানুষের স্বতঃ-উৎসারিত স্তবস্তুতি-মন্ত্রে তাঁহাদের আরাধনা করা হইত এবং দেবতারা তখন মানুষের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য পূজিত হইতেন। পরে উপনিষদ-ব্রাহ্মণের যুগে আর্যরা আরও উন্নত ও সংযত চিন্তায় অভ্যস্ত হইলেন এবং বহুদেবতার বদলে একদেবতার (ব্রহ্ম) কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাহার সহিত আরও একটী ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিল। অনার্যদের সহিত সংঘাত ও সান্নিধ্যের ফলে, বড় বড় জনপ্রিয় অনার্য দেবতাবা আর্যদের দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে **শিব** বা **মহাদেব** প্রধান। আর্যদের প্রাচীন দলে **ব্রহ্মা** রহিলেন, তাঁহার চারি মুখ চারি বেদ, এবং তিনি ধ্যানরত ও স্থির। নব্যদলের নূতন দেবতা হইলেন **বিষ্ণু**, তাঁহার চারি হাত সতত কর্মরত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের সাহায্যে তিনি সর্বদা কল্যাণ ঘোষণা করিতেছেন, অন্যায়ের শাসন করিতেছেন, ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতেছেন এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করিতেছেন। সমকালীন আর্য রাজার দেবরূপ হইলেন বিষ্ণু।

রামায়ণ-মহাভারতের সমাজচিত্র

আর্য-অনার্যদের এই ঘাত-প্রতিঘাত, মিলন-মিশ্রণ, আর্যসমাজের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বড় বড় আর্য-জনের মিলন (coalition) ও মৈত্রীবন্ধন (alliance), ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করিয়া পূর্বে ও দক্ষিণে আর্যসভ্যতার প্রসার ইত্যাদি বহু ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া আমাদের দুইটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' রচিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক বিষয় রূপক ও গল্পাকারে বর্ণনা করিতে হইলে কবি-শিল্পীদের কিছুটা কল্পনার রঙ মিশাইতে হয়।

ইহা কেবল সেকালের বৈশিষ্ট্য নহে, একালের সাহিত্যেরও বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাহাতে কাহিনীর অন্তরালের ইতিহাস বিকৃত বা লুপ্ত হইয়া যায় না, যদি অবশ্য স্বেচ্ছায় তাহা না করা হয়। বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসদেবের মহাভারত প্রথমে যে-ভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহা পরবর্তীকালে যুগে যুগে বিভিন্ন কবি ও শাস্ত্রবিদ্ অনেক অদল-বদল করিয়াছেন। সমাজের প্রয়োজনে, তখনকার আদর্শ ও নীতিকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার জন্য, তাঁহারা দুই মহাকাব্যকে আশ্রয় করিয়া তাহার কোন-কোন কাহিনীর নূতন রূপ দিয়াছেন। বাংলাদেশে যেমন কাশীরাম দাস 'মহাভারত' এবং কৃত্তিবাস 'রামায়ণ' রচনা করিয়াছেন। মূল মহাকাব্যের সহিত তাহার পার্থক্য আছে। তাহা থাকিলেও, মূল রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের প্রাচীন যুগের সামাজিক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থ এবং মোটামুটি বলা যায়, আর্যযুগের পরিপূর্ণ সমাজচিত্র এই দুই মহাকাব্যে যেমন প্রতিফলিত হইয়াছে, তেমন আর কোন গ্রন্থে হয় নাই।

রামায়ণের চিত্র। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নারদ মহাকবি বাল্মীকির নিকট অযোধ্যার ইক্ষাকুবংশের রাজা দশরথের পুত্র যুবরাজ রামচন্দ্রের অভিষেকের আয়োজন, দশরথের মৃত্যু, রামের দণ্ডকারণ্যে (দাক্ষিণাত্যে) বাস, লঙ্কার (সিংহল) রাজা রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণ, রামের সহিত কিষ্কিন্ধ্যার (দক্ষিণ-ভারতের বেল্লারী জেলায়) বানরপতি সুগ্রীব ও হনুমানের মিলন, বালিবধ, সীতার অন্বেষণে বানরগণের-চতুর্দিকে যাত্রা, সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন, রামের সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ ও রাবণবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামের অযোধ্যা প্রত্যাগমন ও রাজ্যভার গ্রহণ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে রামরাজ্যে লোকে আনন্দিত, ধর্মপরায়ণ, নীরোগ ও দুর্ভিক্ষ-

ভয়শূন্য হইবে, রামচন্দ্র অনেক রাজবংশ স্থাপন করিবেন এবং চতুঃবর্ণের প্রজাদের নিজ নিজ ধর্মে ও কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন।

রামায়ণের এই কাহিনী হইতেই বুঝা যায়, আর্য বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র প্রধানতঃ দক্ষিণ-ভারতে আর্যসভ্যতার প্রসারে উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়া, তাহা না হইলে প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা তিনি অনার্যদের জয় করিয়াছিলেন। অনার্যদেরই ব্যঙ্গ করিয়া বানর বলা হইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণের বানরপতি হনুমান রামের ভক্ত ছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের অনার্যদের প্রধান উপাস্য দেবতা শিবের 'হরধনু' ভঙ্গ করিয়াছিলেন রামচন্দ্র এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপ অনার্য রাজা রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। অথচ ক্ষত্রিয় রাজকুমার রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই এবং তিনি বিভীষণেব বন্ধু ও বানবদের পূজ্য দেবতাও হইয়াছিলেন। অনার্যদের সহিত আযদের মিলনে এবং আর্য সভ্যতার প্রসারে রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রেব ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই অনার্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন নাই। দক্ষিণে তিনি কৃষিস্থিতি-মূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সেই-যে বীজ রোপণ করিয়া আসিয়াছিলেন বহু শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষ তাহাব ফল লাভ করিয়াছিল।" রামচন্দ্র আরও একটি কাজ করিয়াছিলেন। নারদের ভাষায়, তিনি চতুর্বর্ণের প্রজাদের নিজ নিজ ধর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই যে চারিবর্ণের ভিত্তির উপর আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা—তাহাও রামচন্দ্র দৃঢ় করিয়াছিলেন।

মহাভারতের সমাজ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেনঃ "মহাভারত আলোচনা করিলে **স্পষ্টই** দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল।" রামায়ণের মতো মহাভারতেও আর্য-অনার্যের এই বিরোধ-মিলনের চিত্র তো আছেই, তাহা ছাড়াও আর্যদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি বিষয়ের ঐতিহাসিক তথ্যে মহাভারত এত সমৃদ্ধ যে তাহাকে ভারত-ইতিহাসের সামাজিক উপকরণের অফুরন্ত আকর বলা যায়।

মহাভারতে দেখা যায়, 'বর্ণাশ্রমিসমাজ' দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। বর্ণভেদ ও বিচার কর্মগত না হইয়া ক্রমেই জন্মগত হইয়া উঠিয়াছে। কর্মগুণ দ্বারা বর্ণ-বিচারের দৃষ্টান্ত মহাভারতে অবশ্য অনেক আছে। যক্ষের এক প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন যে কুল, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কিছুই দ্বিজত্বের কারণ নহে, একমাত্র বৃত্তই (চরিত্র) দ্বিজত্বের হেতু (বনপর্ব)। কুরুপাণ্ডবের শস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষার সময় কর্ণ সভাস্থলে উপস্থিত হইলে ভীম তাহাকে সূতপুত্র বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। উত্তরে দুর্যোধন ভীমকে বলিয়াছিলেন: "মানুষকে তাহার কর্ম দ্বারা বিচার করিতে হইবে, জন্মের দ্বারা নহে" (আদিপর্ব)। এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু তাহা হইলেও, জন্মগত বর্ণবিচারের চিত্রই প্রধান সামাজিক সত্য বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মণ জন্ম হইতেই অন্যান্য বর্ণের গুরু (অনুশাসনপর্ব); ব্রাহ্মণবংশে জাত দশ বৎসরের শিশুও শতায়ু ক্ষত্রিয়ের পিতৃতুল্য গুরু (ঐ); অগ্নি যেমন শ্মশানে থাকিলেও তাহার মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না, ব্রাহ্মণও যে অবস্থায় থাকুন না কেন তাহার জন্মগত মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না (ঐ)। শ্রীমদ্ভবদ্গীতাতেও দেখা যায়, অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণাশ্রমতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। বর্ণাশ্রমিসমাজের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার পরিচয়ই

মহাভারতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কৃষি পশুপালন গো-সেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজধর্ম, শিক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্পকলা ইত্যাদির সমকালীন পরিচয়ও যথেষ্ট পাওয়া যায় মহাভারত হইতে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ একটি বৃহৎ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হইতে পারে।

সংক্ষেপে বলা যায়, মহাভারত হইতে প্রাচীন ভারতের যে সমাজচিত্র আমরা পাই, তাহাতে দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত চতুর্বর্ণ-বিন্যাসই আর্যসমাজের ভিত্তি ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠে। গুণগত ও কর্মগত বর্ণবিভাগ ক্রমে জন্মগত হয় এবং সমাজের বর্ণকেন্দ্রিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে সচলতাও স্বভাবতঃই নষ্ট হইতে থাকে। নিম্ন-বর্ণের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার অবিচারও চলিতে থাকে। তাহার ফলে ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের মনোভাব জাগিতে থাকে।



পঞ্চম অধ্যায়

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

আর্যদের সহিত অনার্যদের বিরোধ ও মিলন-মিশ্রণ দুইয়ের পরিচয় পাওয়া যায় রামায়ণ-মহাভারত হইতে। এই মিলন-মিশ্রণের ফলে ক্রমেই সমাজে বর্ণসংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হইতে থাকিল। শাস্ত্র-কাররা নীতির বাঁধ দিয়া উচ্চ-নীচ বর্ণের ব্যবধান রক্ষা করিতে তৎপর হইলেন। প্রসারণের সহিত সমাজে সঙ্কোচন দেখা দিতে লাগিল।

সাধারণ মানুষ বেদ-উপনিষদের ধর্মতত্ত্বও বুঝিতে পারিল না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন : "একদিন ইহারই একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের দুই ক্ষত্রিয় রাজসন্ন্যাসীকে আশ্রয় করিয়া প্রচণ্ড শক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে—সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ্য প্রথাপালনের দ্বারা নহে—এই ধর্মনীতি যে মানুষের সহিত মানুষের কোনো ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারে না, ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন।"

জৈন-বৌদ্ধ যুগের তাৎপর্য

জৈন-বৌদ্ধ যুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহাকে আর্য-ভারত ও হিন্দু-ভারতের মধ্যকার যুগ বলা যায়। ইহার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন : "আর্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধযুগে সেইসকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি এক ধর্মবন্যায় ভাঙিয়াছিল—শুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল। তার পরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিক যুগ ও হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ।"

আর্য-ভারত ও হিন্দু-ভারত, এই দুইয়ের মধ্যকার সেতু হইল জৈন ও বৌদ্ধযুগ। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় একসময়ে প্রচারিত

হইয়াছে, এবং দুই ধর্ম কোন কোন রাজা রাজধর্ম রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও পোষকতার জন্য তাহার যে-রকম প্রসার ও প্রভাব বাড়িয়াছিল, তাহাতে ভারত-ইতিহাসের এই সন্ধিকালকে সাধারণভাবে কেবল 'বৌদ্ধযুগ' বলিলেও ভুল হয় না।

মহাবীর ও বুদ্ধ

মহাবীর ও বুদ্ধদেবের জন্ম ও নির্বাণের (মৃত্যু) কাল লইয়া মতভেদ আছে। মহাবীর বয়সে গৌতম বুদ্ধের চেয়ে কিছু বড় ছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্ম ৫৬৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলিয়া এখন অনেকে মানিয়া লইয়াছেন। ৮০-৮২ বৎসর বয়সে তিনি নির্বাণলাভ করেন। অর্থাৎ মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়া. প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত ধর্মপ্রচার করেন।

জৈনদের বিশ্বাস মহাবীরের পূর্বে ২৩ জন তীর্থংকর জৈনধর্ম প্রচার করেন এবং মহাবীর ২৪-তম তীর্থংকর। মহাবীরের পূর্ব-তীর্থংকর পার্শ্বনাথ।✓ খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকের গোড়ায় কাশী নগরের ক্ষত্রিয় রাজবংশে পার্শ্বনাথের জন্ম হয়। জৈনধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা পার্শ্বনাথই প্রতিষ্ঠা করেন এবং মহাবীব পরে তাহার প্রসারে ও প্রচারে সাহায্য করেন। মহাবীরের জন্ম হয় বৈশালী নগরে, উত্তর বিহারে। নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নগরে ক্ষত্রিয় শাক্য-বংশে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। তাঁহার প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মই বৌদ্ধধর্ম। পার্শ্বনাথ, মহাবীর, বুদ্ধদেব, তিনজনেই ক্ষত্রিয় রাজবংশ-জাত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৈদিক ধর্মের সংস্কার করিবার জন্য, তাহার সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের

বাহুল্যের বিরুদ্ধে, যাঁহারা বিদ্রোহ করিয়া ভারতে নূতন ধর্মের ভিত্তি স্থাপন কবিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অব্রাহ্মণ ছিলেন।

জৈনধর্মের সারকথা

জৈনধর্মের প্রবর্তক পার্শ্বনাথ চারিটি 'ব্রত' পালনের কথা বলিয়া গিয়াছেন ঃ ১। জীবহত্যা না করা বা অহিংসা : ২। মিথ্যা না বলা, বা সত্য ; ৩। চুরি না করা, বা অচৌর্য ; ৪। বিষয়সম্পত্তির প্রতি আসক্ত না হওয়া, বা অপরিগ্রহ। মহাবীর পরে এই চারিটি ব্রতের সহিত পঞ্চম একটি ব্রত যোগ করেন, ব্রহ্মচর্য। এই পাঁচটি ব্রত পালনই জৈনধর্মেব সারকথা।) জৈনদের 'নিগ্রন্থ' বলা হয়। যাঁহার কোন গ্রন্থি নাই বা বন্ধন নাই, তিনি নিগ্রন্থ। এই পাঁচটি ব্রত পরিপূর্ণরূপে পালন করিবার জন্য মহাবীর নিজে নগ্নতা অবলম্বন করেন। নগ্নতার ব্যাপারে পার্শ্বনাথপন্থী ও মহাবীরপন্থী জৈনদের মধ্যে পবে মতভেদ হওয়াতেই 'শ্বেতাম্বর' ও 'দিগম্বর' এই দুই সম্প্রদায়ে জৈনরা ভাগ হইয়া যান। অন্যান্য বিষয়েও এই দুই জৈন দলের মধ্যে মতভেদ ছিল। যেমন, দিগম্বর-মতে মহাবীরের মূর্তি নির্মাণ করিতে হইলে তাহা নগ্ন হইবে, স্ত্রীলোকের মোক্ষের অধিকার নাই, কেবল পুরুষের আছে।

পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে নদীতীরে একটি সালগাছের তলায় তপস্যা করিয়া পার্শ্বনাথ ধর্মজ্ঞান লাভ করেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি 'জিন' হন। 'জি' ধাতু হইতে 'জৈন' হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি সমস্ত প্রবৃত্তিকে জয় করিয়াছেন, তিনিই 'জৈন'। আধুনিক উত্তর ও দক্ষিণ-বিহার এবং পশ্চিমে কৌশাম্বী পর্য্যন্ত অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া মহাবীর নিজে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান

কর্মক্ষেত্র ছিল রাজগৃহ-নালন্দা অঞ্চল। রাজগৃহ তখন সমৃদ্ধ নগর ছিল এবং পূর্ব-ভারতের জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্বাধীন ও নূতন ধর্ম-দার্শনিক চিন্তা বা মতামত প্রচারের অনুকূল ক্ষেত্র বলিয়া বুদ্ধদেবও রাজগৃহকে তাঁহার প্রধান প্রচারক্ষেত্র করিয়াছিলেন। মানভূম-বিহার-ছোটনাগপুর অঞ্চল জৈন-বৌদ্ধধর্মের প্রধান প্রচার-কেন্দ্র ছিল, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই অঞ্চলে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম দৃঢ়মূল হয় নাই বলিয়া, ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, মহাবীর ও বুদ্ধ তাঁহাদের জাতি-বর্ণ-নিরপেক্ষ ধর্ম প্রচারের কেন্দ্ররূপে স্থানটিকে নির্বাচন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের সারকথা

রাজপুত্র হইয়াও গৌতম বুদ্ধ বাল্যকাল হইতেই ভাবুক ও সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। পথে পঙ্গু, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত ও মৃত লোক দেখিয়া তিনি মানুষের রোগ, দুঃখ জরা ও মরণের চিন্তায় কাতর হইয়া পড়েন। এ-সব হইতে কি মানুষের মুক্তি নাই? মুক্তি কিসে? শান্তি কিসে? এই চিন্তাতেই তিনি ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং রাজৈশ্বর্য, সংসার সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন। ছয় বৎসর তিনি রাজগৃহ, উরুবিল্ব (গয়া জেলায়) অঞ্চলে ঘুরিলেন, তপস্যা করিলেন। অবশেষে বোধগয়ার বিখ্যাত বোধি-বৃক্ষের তলায় ধ্যানস্থ হইলেন এবং গভীর সাধনার পর সত্য-জ্ঞান লাভ করিলেন।

অহিংসা, শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী, বৌদ্ধধর্মের সার কথা। কি উপায়ে এই ধর্মের সাধনা করিতে হইবে? অসংযত সুখভোগ, অথবা অত্যধিক সংযত কঠোর তপস্যা, কোনটাই বুদ্ধদেব ভাল

বলিতেন না। অর্থাৎ ভোগের পথ, বা তপস্যার পথ, কোন দিকেই বাড়াবাড়ি করা ঠিক নহে, এই ছিল তাঁহার মত। দুইয়ের মাঝামাঝি পথই ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। ইহাই বৌদ্ধ সাধনার 'মধ্যপন্থা'। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, 'শীল' গ্রহণ করাই মুক্তিলাভের উপায়। 'চরিত্র' শব্দের অর্থ-ই এই, যাহাতে করিয়া চলা যায়। শীলের দ্বারা এই চরিত্র গড়িয়া উঠে। শীল কাহাকে বলে? 'শীল' আমাদের চলিবার সম্বল বা নীতি। এইগুলি প্রত্যেকটি এক-একটি শীল :

পাণং না হানে—প্রাণীকে হত্যা করিবে না।

ন চ দিন্নমাদিয়ে—যাহা তোমাকে দেওয়া হয় নাই, তাহা লইবে না।

মুসা না ভাসে—মিথ্যা কথা বলিবে না। ইত্যাদি—

এই শীলগুলিই হইতেছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই মুক্তির সোপান। মঙ্গললাভ করিতে হইলে 'মেত্তিভাবনা' বা মৈত্রীভাবনার প্রয়োজন। প্রতিদিন ভাবিতে হইবে যে সকল প্রাণী সুখী হোক (সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু), শত্রুহীন হোক (অবেরা হোন্তু), অহিংস হোক (অব্যাপজ্ঝা হোন্তু)। এই মৈত্রীভাবনা দ্বারা সকল মানুষের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করিতে হইবে।

বৌদ্ধধর্ম কোন বিশেষ জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীর জন্য নয়। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, সকলেই তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার ছিলেন, ব্রাহ্মণ সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়ন ছিলেন, শাক্যপুত্র আনন্দ ছিলেন, বণিক অনাথপিণ্ডদ ছিলেন, পরামাণিক উপালী ছিলেন এবং পতিতা অম্বাপলীও ছিলেন। এই-ভাবে ধর্মপ্রচার করিয়া বুদ্ধদেব ৮০-৮২ বৎসর বয়সে কুশীনগরে (উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলায়) নির্বাণলাভ করেন।

বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার

বৌদ্ধধর্মের এই সাম্য মৈত্রী ও অহিংসার বাণী দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। মানুষের অন্তরের গভীরে নাড়া দিয়াছিল বলিয়া তাহার বাঁধভাঙা বন্যায় ভারতের ভৌগোলিক সীমা ভাসিয়া গেল। এবং বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশ চীন জাপান, শ্যাম জাভা মঙ্গোলিয়া তিব্বত, সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় :

"মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করেনি, এই জন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন ব্রহ্মদেশ জাপান, এল তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দুস্তর গিরি-সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবার্তার কাছে।"

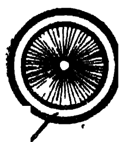
শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, পর্বতগুহায়, এশিয়া মহাদেশের মানুষ যেন জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তলোয়ার কামান-বন্দুক লইয়া বৌদ্ধধর্মের প্রচার করিতে হয় নাই। মানুষের অন্তরে যাহার স্থান, অন্তরের টানে তাহা প্রসারিত হইয়াছে। পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসে এ-দৃষ্টান্তও বিরল।

আধুনিক যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

বৌদ্ধধর্মীরা পরে 'হীনযান' ও 'মহাযান' দুই সম্প্রদায়ে ভাগ হইয়া গিয়াছেন। মূর্তিপূজা প্রচলন ও বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়া মহাযান বৌদ্ধরা হিন্দুধর্মের সহিত আপস-রফা করিয়া

লইয়াছেন। ভারতের বাহিরে এই মহাযান বৌদ্ধধর্মেরই প্রসার হইয়াছে। ভারতের ভিতরে বৌদ্ধধর্মের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিলেও, হিন্দুধর্মের মধ্যেই তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে। খাঁটি বৌদ্ধদের সংখ্যা এখন ভারতে বেশী নাই। কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র আজ অশোকস্তম্ভ প্রতীক-রূপে গ্রহণ করিয়াছে। বৌদ্ধদের শীল-সাধনা হইতে এশিয়ার প্রায় সকল রাষ্ট্র আজ ভারতের উদ্‌যোগে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তি ও মৈত্রীর জন্য, **পঞ্চশীল** নীতির সমর্থক। মনে হয় যেন পৃথিবীর হিংসা-দ্বেষ-জর্জর, যুদ্ধ-ক্লান্ত, শান্তি-কাতর মানুষ আবার ভারতের বৌদ্ধধর্মের আদর্শকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে। এই কথা মনে করিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত 'বুদ্ধজন্মোৎসব' কবিতায় লিখিয়াছিলেন:

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য



ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌর্য যুগ

মহাবীর ও বুদ্ধের ধর্ম প্রচারকালে পূর্বভারতে দুইটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল কোশল (উত্তরপ্রদেশের ফয়জাবাদ, গণ্ডা ও বরৈচ জেলায়) ও মগধ (দক্ষিণ-বিহার, পাটনা ও গয়া জেলা)। ক্রমে মগধের বিস্তার হইতে থাকে। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, শিশুনাগবংশ ও নন্দবংশের রাজত্বকালে মগধের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তখন অনেক ছোট ছোট জনপদ ছিল। প্রথমে পারস্যের রাজারা ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে, মহাবীর ও বুদ্ধের সময়ে, গান্ধার তক্ষশিলা এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পারসীক সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পরে অভিযান করেন গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার (৩২৭-৩২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। আলেকজাণ্ডার বিপাশার তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন, ইচ্ছা ছিল পূর্বভারতের রাজ্যও দখল করিবেন। কিন্তু উত্তরের ছোট ছোট রাজ্য জয় করিতেই তাঁহার সৈন্যদল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ভারত-জয়ের বাসনা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। ফিরিবার পথে বাবিলনে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যায়। ইরান, আফগানিস্থান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজা হন সেলুকস।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য

আলেকজাণ্ডার যখন পাঞ্জাবে ছিলেন তখন চন্দ্রগুপ্ত নামে এক যুবক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য তাঁহার শিবিরে আসিয়াছিলেন। কোন কারণে তাঁহার বিরাগভাজন হওয়ায় চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবির হইতে

পলায়ন করিয়া বিন্ধ্যপর্বতের জঙ্গলে চলিয়া যান। মগধের নন্দরাজারা তখন নানা কারণে প্রজাদের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। শোনা যায়, চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার এক কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণের পরামর্শে বিন্ধ্য অঞ্চলে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের উচ্ছেদের জন্য মগধ অভিযান করেন। তারপর মগধের রাজসিংহাসন দখল করিয়া তিনি প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজবংশ মৌর্যদের প্রতিষ্ঠা করেন।

কেহ কেহ বলেন চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের রানী বা দাসী মুরার গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। মনে হয় তিনি মোরীয় নামে এক ক্ষত্রিয়বংশের রাজা ছিলেন। বুদ্ধের সময় এই মোরীয়বংশ পিপ্পলীবন নামক রাজ্যে (সম্ভবতঃ নেপালী তরাই ও গোরক্ষপুর জেলার মধ্যখানে) রাজত্ব কবিতেন। নন্দবংশ উচ্ছেদ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন এবং ক্রমে উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহীশূরের সীমান্ত পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ সেলুকসের অধীনে ছিল। সেলুকসকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত বর্তমান আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের অধিকাংশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে (পাটনায়) এবং সেলুকসের গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস দীর্ঘকাল সেখানে বাস করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং মহীশূরের নিকট শ্রাবণ-বেলগোলা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সম্রাট অশোক

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বিন্দুসার, এবং বিন্দুসারের পরে অশোক মগধের রাজা হন। তাঁহাদের রাজত্বকালের সঠিক

সনতারিখ লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ থাকিলেও, তাহা মোটামুটি এই-ভাবে ধার্য করা যায় :

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য : ৩২৬।২৩—৩০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
বিন্দুসার : ৩০২—২৭৩।৭২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
অশোক : ২৬৯।৬৮—২৩৩।৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

পিতা বিন্দুসারের রাজত্বকালে অশোক তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনীর প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। তাহা লইয়া অন্যান্য ভাইদের সহিত হয়ত তাঁহার কলহ-বিবাদ হইয়াছিল। এইজন্য কেহ কেহ বলেন যে সিংহাসন লাভের চার বৎসর পরে তাঁহার অভিষেক হয়।

উৎকীর্ণ লিপিগুলি হইতে অশোকের সাম্রাজ্যের সীমা মোটামুটি অনুমান করা যায়। তাহাতে দেখা যায় যে অশোকের সাম্রাজ্যের পরিসর ছিল পশ্চিমে অ্যান্টিয়োকসের রাজ্যের সীমান্ত হইতে পূর্বে কলিঙ্গ পর্যন্ত, আর উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে চোল, চের, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের উত্তর সীমা পর্যন্ত। কলিঙ্গ অশোক নিজে জয় করিয়াছিলেন এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ পিতা ও পিতামহের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন।

অভিষেকের অষ্টম বর্ষে অশোক কলিঙ্গ জয় করেন। এই যুদ্ধই তাঁহার শেষ যুদ্ধ মনে হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তাঁহার জীবনের গতি ফিরিয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি তাঁহার পিতা ও পিতামহের মতো হিন্দুই ছিলেন, কিন্তু এইবার প্রকাশ্যে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া, অহিংসা শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইলেন। ‘বিহার-যাত্রা’র বিলাস ত্যাগ করিয়া তিনি ‘ধর্মযাত্রা’ আরম্ভ

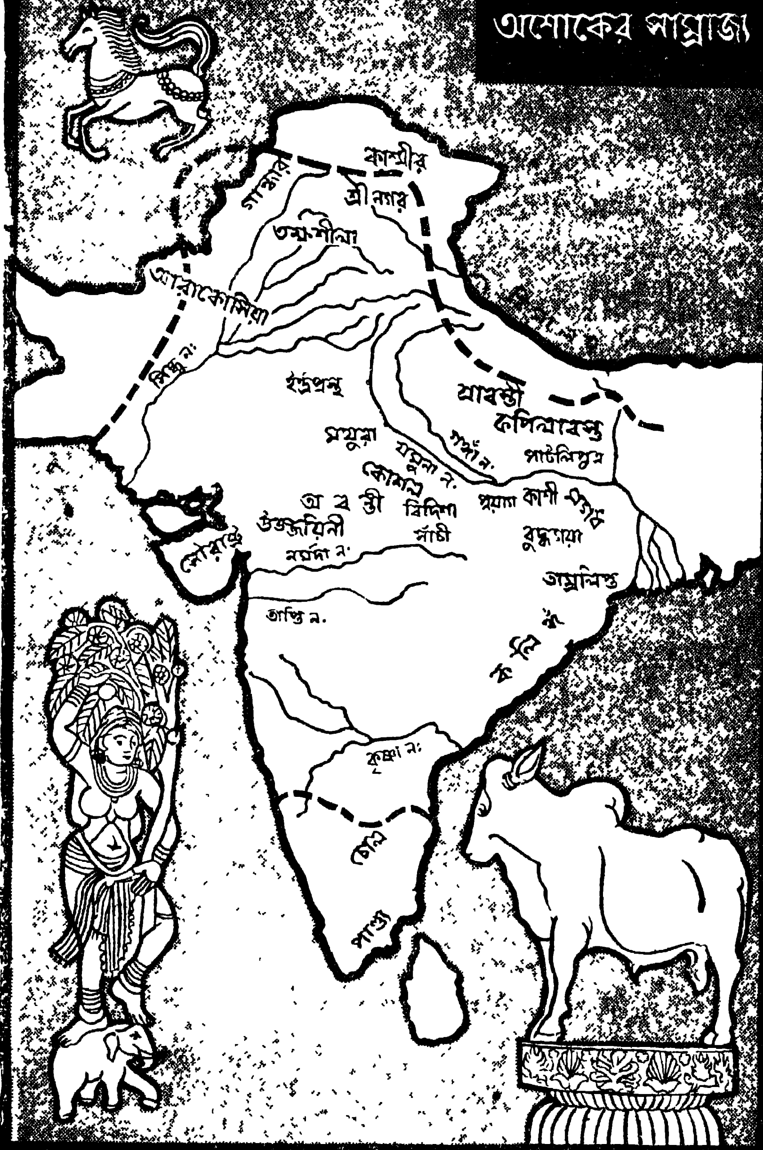
করিলেন। এই ধর্মনীতির জন্যই অশোক কেবল ভারতের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

অশোক-লিপি

রাজ্যের নানা স্থানে শিলাফলকে, গিরিস্তম্ভে ও গুহার গায়ে লিপি উৎকীর্ণ করিয়া অশোক ধর্ম ও নীতিকথা প্রচার করিয়াছেন। লিপিগুলিতে কোথাও অশোককে 'দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা', কোথাও শুধু 'দেবগণের প্রিয়' বা 'প্রিয়দর্শী রাজা' বলা হইয়াছে। কেবল মাস্কীর লিপিতে 'অশোক' নাম পাওয়া যায় এবং আর-একটিতে 'মাগধ' বা মগধের রাজা কথা ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। অশোক তাঁহার অনুশাসনে যে দ্বাদশটি গুণের অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন তাহা এই :

১। দয়া ২। দানশীলতা ৩। সত্যানুরাগ ৪। শুচিতা ৫। মৃদুতা ৬। সাধুতা ৭। অল্পব্যয় ও অল্পসঞ্চয়। ৮। সংযম। ৯। ভাবশুদ্ধি ১০। কৃতজ্ঞতা ১১। দৃঢ়ভক্তি ১২। ধর্মরতি

শরীরের বলবৃদ্ধির জন্য যেমন নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করিতে হয়, চিত্তশুদ্ধির জন্যও সেইরূপ কতকগুলি কর্মানুষ্ঠান আবশ্যক। সেবা-শুশ্রূষা, পিতামাতা গুরু ও বয়ঃজ্যেষ্ঠদের আদেশ পালন, শ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণ-শ্রমণ দীন-দুঃখী দাস-ভৃত্য ও মিত্র-পরিচিতজনকে দান এবং সংযম ও অহিংসা, এইগুলি নিয়মিত করিলে ধর্মভাব উদ্বুদ্ধ হয়। লিপিতে দেখা যায়, অভিষেকের ১০ম বর্ষে অশোক বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করেন এবং রাজকীয় বিহার-যাত্রা বন্ধ করেন ; ১০ম-১২শ বর্ষে যজ্ঞে পশুবলি নিষেধ করেন, রাজপুরুষদের ধর্মপ্রচারে বাহির হইবার ব্যবস্থা করেন, নিজে ধর্মপ্রচারের জন্য ধর্মযাত্রা করিতে থাকেন এবং ধর্মলিপি প্রকাশ



অশোকের সাম্রাজ্য
কাশ্মীর
গান্ধার
শ্রীনগর
তক্ষশীলা
আরাকোসিয়া
সিন্ধু ন.
ইন্দ্রপ্রস্থ
শ্রাবস্তী
কপিলাবস্তু
মথুরা
যমুনা ন.
কোশল
পাটলিপুত্র
অবন্তী
বিদিশা
প্রয়াগ
কাশী
উজ্জয়িনী
সাঁচী
বুদ্ধগয়া
সৌরাষ্ট্র
নর্মদা ন.
তাম্রলিপ্ত
তাপ্তি ন.
কলিঙ্গ
কৃষ্ণা ন.
পাণ্ড্য

আরম্ভ করেন ; ১৩শ বর্ষে ধর্ম-মহামাত্রদের নিয়োগ করেন এবং মুখে ধর্মঘোষণা করিতে বলেন ; ২৬শ বর্ষে প্রাণীবধ নিষেধ করেন।

মৌর্য ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি

মৌর্য যুগকে প্রাচীন ভারতের বৈদিক-বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের সন্ধি-কাল বলা হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের মতো সার্বভৌম প্রতিপত্তিশালী রাজা সেকালে আর কেহ ছিলেন না। সমাজ রাষ্ট্র অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, সর্বক্ষেত্রে তাঁহারা যে ব্যাপক সংস্কার, প্রসার ও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহাই ভারত-সমাজ ও ভারত-সংস্কৃতির ভিত্তি-স্তম্ভের মতো অটুট ছিল। মৌর্য যুগের এই সমাজ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য ও উপকরণ পাওয়া যায়। তাহার প্রধান আকর তিনটি : ক। মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ ; খ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ; গ। অশোক-লিপি।

মেগাস্থিনিস। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে সেলুকসের দূতরূপে মেগাস্থিনিস কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে *To Indika* নামে তিনি একখানি বই লেখেন। আসল বইখানি এখন পাওয়া যায় না, কিন্তু আরিয়ান, ষ্ট্র্যাবো, ডায়োডোরস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকরা সেই বই হইতে অনেক কথা তাঁহাদের নিজেদের বইতে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৪৬ সালে জার্মানির বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শোয়ানবেক বহু পরিশ্রম করিয়া এই-সব বিভিন্ন বই হইতে মেগাস্থিনিসের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া '*Megasthenis Indica* নামে একখানি বই রচনা করেন। এই বই হইতেই আমরা মেগাস্থিনিসের ভারত-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি।

মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন, 'ভারতবর্ষে বহু পর্বত আছে, সেগুলি

ফলবান গাছপালায় পূর্ণ। অসংখ্য নদীপ্লাবিত উর্বর সমতলভূমি আছে, তাহার অধিকাংশই জলপ্রণালী দ্বারা সিক্ত, সেইজন্য বৎসরে দুইবার ফসল ফলে। ভারতবাসীরা শিল্পকর্মে সুনিপুণ। ভারতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, খনিজ দ্রব্য প্রচুর মজুত আছে।

সেকালের ভারতীয় সমাজের গড়ন সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন, ভারতের অধিবাসীরা সাতটি জাতিতে বিভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইলেন **পণ্ডিতগণ**। পণ্ডিতেরা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের কোন রাজকার্য করিতে হয় না। তাঁহারা যাগযজ্ঞ, পূজা অনুষ্ঠান ইত্যাদি করিয়া থাকেন। জনসাধারণেরও যথেষ্ট উপকার তাঁহারা করেন। নূতন বৎসরে তাঁহারা সকলে একটি বড় সভায় সমবেত হইয়া, উপস্থিত জনমণ্ডলীকে অনাবৃষ্টি, বর্ষা, বাতাস, রোগ ব্যাধির সম্ভাবনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় গণনা করিয়া বলিয়া দেন। যে পণ্ডিত গণনায় ভুল করেন তাঁহাকে কোন দণ্ড ভোগ করিতে হয় না বটে, কিন্তু তিনি জনসমাজে নিন্দিত হন এবং বাকি জীবনের জন্য তাঁহাকে মৌনব্রত অবলম্বন করিতে হয়। ভারতের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতশ্রেণীর সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে গ্রীক দূতের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

ভারতের দ্বিতীয় জাতি **কৃষকগণ**। তাহারা যুদ্ধ বা রাজকার্য করে না, কেবল চাষবাস করে। সপরিবারে কৃষকরা গ্রামেই বাস করে, কখনও নগরে যায় না। তাহারা রাজাকে কর প্রদান করে, কারণ সমগ্র ভারতভূমি রাজার সম্পত্তি, প্রজাসাধারণের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই। কৃষকশ্রেণী ও ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের এই মন্তব্য লক্ষণীয়।

তৃতীয় জাতি **গোপাল**। গো-মেষপালক ও রাখালরা গ্রামে বা

নগরে বাস করে না। সারা জীবন তাহারা বাহিরের শিবিরে বাস করে। পশুপক্ষী ও জীবজন্তুও তাহারা শিকার করিয়া বেড়ায়।

চতুর্থ জাতি **কারুশিল্পী**। ইহারা কেহ কেহ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করে, কেহ বা কৃষকদের ও অন্যান্য লোকের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জিনিসপত্র তৈরী করে। ইহারা রাজকর প্রদান তো করেই না, বরং রাজকোষ হইতে ভরণপোষণের খরচ বা ভাতা পায়। ভারতের কারুশিল্পীদের সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের এই উক্তির বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারুশিল্পীরা সেকালে রাজপোষকতা ও অমাত্য-পোষকতার উপর নির্ভর করিত। প্রধানতঃ নগরবাসী কারুশিল্পীদের সম্বন্ধেই এই উক্তি সত্য, কিন্তু গ্রামের কারুশিল্পীরা গ্রাম্যসমাজের উপরেই বেশী নির্ভর করিত।

পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম জাতি **যোদ্ধা, অমাত্য** ও **মন্ত্রী**। যোদ্ধারা যুদ্ধ করে, অমাত্যরা রাজকার্য দেখাশুনা করেন, মন্ত্রীরা মন্ত্রণাসভায় মিলিত হইয়া রাজ্যকে রাজ্যশাসনে সাহায্য করেন।

মেগাস্থিনিস 'জাতি' বলিতে যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহার সহিত 'বর্ণ' (caste) ও 'শ্রেণী'র (class) মিশ্রণ আছে। কারণ তিনি এই 'জাতি'র কথা বলিয়া একথাও বলিয়াছেন যে এক জাতি অপর জাতিতে বিবাহ করিতে পারে না, অথবা অন্যের জাত-ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে না। যেমন যোদ্ধা কৃষিকাজ করিতে পারে না, অথবা কারু-শিল্পী ব্রাহ্মণের মতো জ্ঞানচর্চা করিতে পারে না। সমাজের বর্ণ-বৃত্তি-বন্ধন মৌর্য যুগে বেশ দৃঢ় ছিল দেখা যায়। বৈদিক যুগের শেষ পর্বের সামাজিক বন্ধন জৈন-বৌদ্ধ যুগের উদার ধর্মপ্রচারের ফলে মৌর্য আমলে বিশেষ শিথিল হয় নাই।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন পণ্ডিত

কৌটিল্য খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেন। এই রচনা-কাল লইয়া অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, মূল অর্থশাস্ত্র এই সময় রচিত হইলেও, তাহার অনেকাংশ প্রক্ষিপ্ত ও পরবর্তীকালে সংযোজিত। তাহা হইলেও প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ইতিহাসের একখানি মহামূল্যবান আকরগ্রন্থ যে 'অর্থশাস্ত্র' তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অর্থশাস্ত্রে গ্রাম ও গ্রাম্য সমাজ, জাতি-বর্ণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক বিবরণ আছে। এইসব বিষয় আমরা পূর্বে নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। এখানে কেবল অর্থশাস্ত্রে **নগর** ও **নগর-সন্নিবেশ** (town-planning) সম্পর্কে উল্লেখ করিব। রাজকার্য পরিচালনার জন্য শাসনকেন্দ্রে, বাণিজ্যের জন্য বন্দরে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে এবং ধর্মের জন্য তীর্থকেন্দ্রে, বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগেই নানাবিধ নগর ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিতেছিল। নগরগুলি সাধারণতঃ পরিখা, প্রাচীর ও প্রাকার বেষ্টিত হইত। অর্থশাস্ত্রে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। নগরের জন্য ভূমি নির্বাচনের পর তাহার চারিদিকে গভীর পরিখা খনন করিয়া, উহা হইতে 'বপ্র' (rampart) নির্মাণ করা হইত। তাহার উপর থাকিত উঁচু ইটের বা পাথরের প্রাচীর। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে লোকজনের নগরমধ্যে যাতায়াতের জন্য দরজা থাকিত। তাহার মধ্যে একটি থাকিত মহাদ্বার (main gate)। এই মহাদ্বারের পাশে একদিকে থাকিত মহাদ্বারাধিপ বা নগরপালের কর্মচারী ও রক্ষীদের আবাস, এবং অপর দিকে থাকিত শুল্কাধ্যক্ষের আপিস বা শুল্কশালা। নগরের ভিতরে ও বাহিরে যাইবার সময় দ্বারপাল প্রত্যেকের খোঁজখবর লইতেন। আগন্তুকদের 'মুদ্রা' বা পাসপোর্ট দেখাইতে হইত।

নগরের মধ্যে তিনটি পূর্ব-পশ্চিমে, আর তিনটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ রাজপথ থাকিত। বড় বড় পথ ছাড়াও, ছোট ছোট অনেক পথ থাকিত। নগরেব ভিতরে এক-এক ভাগে (sector) এক-এক জাতি ও বর্ণের লোক বাস করিত। গৃহস্থদের বাসস্থান ও দোকান-পাট ছাড়া একদিকে রাজকর্মচারীদের অধিকরণ বা আপিস থাকিত। ইহা ছাড়া ধর্মাধিকবণের বিচারালয় ও নগর-রক্ষকের আপিসও থাকিত। মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন পল্লীতে থাকিত হাটবাজার। ইচ্ছা মতো কেহ দোকান বা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিত না। পণ্যাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া করিতে হইত।

মধ্যযুগের নগরের (Mediaeval town) যতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, কৌটিল্যেব অর্থশাস্ত্রের এই বর্ণনার মধ্যে তাহার প্রায় সবগুলিই চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নগরের এই পরিকল্পনা পরবর্তীকালে বিশেষ বদলায় নাই, হিন্দুযুগে তো নয়ই, মুসলমান-যুগেও নয়। একেবারে আধুনিক যুগে নগরের এই রূপ বদলাইয়াছে। মধ্যযুগেব এই নগবের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, নগরবাসী কাহারও কোন স্বাধীনতা ছিল না, কাজকর্মের বা চলাফেরার কোন-কিছুরই না। একটি বৃহৎ জেলখানার মতো ছিল মধ্যযুগের নগর। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

অশোক-লিপি। অশোকের লিপিগুলি হইতে তখনকার রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। লিপিতে রাজ-কর্মচারীদের যেসব নাম পাওয়া যায় তাহা এই :

১। **কুমার, আর্যপুত্র :** প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বলা হইত।

২। **মহামাত্র :** মন্ত্রীর মতো, কুমারদের সাহায্য করিতেন। অনেক স্থানে মহামাত্ররাও প্রদেশ শাসন করিতেন।

৩। **রাজুক** : মনে হয়, রাজস্ববিভাগের কর্মচারী ছিলেন, জমির জরিপ ও বন্দোবস্ত করিতেন।

৪। **প্রাদেশিক** : ইঁহারা বোধ হয় ছোট ছোট বিভাগের শাসক ছিলেন।

৫। **যুত বা যুক্ত** : মহামাত্রদের দপ্তরে কাজ করিতেন।

৬। **পুরুষ** : গুপ্তচরের নামান্তর।

৭। **প্রতিবেদক** : রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সংবাদ সংগ্রহ করা ইঁহাদের কাজ ছিল। আহার বিহার ও বিশ্রামের সময়েও প্রতিবেদকরা বিনা বাধায় খবর লইয়া রাজার নিকটে যাইতে পারিতেন।

সকলের উপরে ছিলেন রাজা, এবং তিনিই ছিলেন প্রজাদের সুখদুঃখের ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অশোকের অনুশাসনে 'পরিসা' বা পরিষদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহাতে মনে হয়, কোন মন্ত্রী-পরিসদের পরামর্শ লইয়া রাজা কাজকর্ম করিতেন। মহামাত্রদের মধ্যে 'ধর্ম-মহামাত্ররা' ছিলেন। তাঁহারা প্রজাদের নৈতিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, কতকটা একালের সংস্কৃতি-সচিবদের মতো। ইহা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে মৌর্য রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র (Monarchy) প্রতিষ্ঠিত ছিল, গণতন্ত্র (Democracy) নহে। কারণ নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের লইয়া মৌর্য রাজারা রাজ্য চালাইতেন, এরকম কোন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। এই 'রাজতন্ত্র' অবশ্য উপরতলার ব্যাপার, সমাজের নীচের তলার গ্রাম্যসমাজের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে ইহা কোনদিন আঘাত করে নাই।



সপ্তম অধ্যায়

পারসীক ও গ্রীক সংস্পর্শ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ হইতে চতুর্থ শতকের মধ্যে পারসীক ও গ্রীকরা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হানা দিয়া তাহার অনেকটা অংশ দখল করে একথা আগে বলিয়াছি। সাইরাসের সময় (৫৫৮-৫৩০ খ্রীঃ পূঃ) পারসীক সাম্রাজ্যের যখন অভ্যুত্থান হয়, তখন প্রথমে সাইরাস এবং পরে ডেরিয়াস (৫২২-৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ) উত্তর-পশ্চিম ভারতের তক্ষশিলা, গান্ধার হইতে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭-৩২৫ অব্দে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার বিপাশার তীর পর্যন্ত দখল করিয়া ছোট ছোট খণ্ডরাজ্য স্থাপন করেন। এই সব রাজ্য শাসন করিতেন ছত্রপরা (Satraps), ভারতীয় ও বিদেশী দুইই।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সান্নিধ্য

মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকালে, অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য, বিদেশী শাসকরা ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যান। কিন্তু পারসীক ও গ্রীকদের এই অভিযানের ফলে, ভারতের সহিত পশ্চিমের, অর্থাৎ প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মেলামেশা ও আদান-প্রদানের পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়। সিন্ধু অঞ্চলের খণ্ডরাজ্যের পারসীক ও গ্রীক রাজকর্মচারীরা নানাদিকে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে থাকেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল, নূতন বর্ণমালা প্রবর্তন। 'আরামিক', 'খরোষ্ঠী' এবং পাণিনি কথিত 'যবনানী' বর্ণমালা মনে হয় এই বিদেশীদের প্রভাবেই সৃষ্টি

হইয়াছে। মৌর্যযুগের স্থাপত্য ও চিত্রকলাতেও পণ্ডিতেরা যথেষ্ট পারসীক প্রভাব আছে বলিয়া মনে করেন।

মৌর্য শিল্পকলায় পারসীক প্রভাব

পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন যে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রে যে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার সভাগৃহ পারসীক সম্রাটের শত-স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহের অনুকরণে তৈরী হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্ত বৎসরের মধ্যে একদিন আনুষ্ঠানিক সমারোহে 'কেশধৌত' করিতেন। অনেকে ইহাও পারস্য-সম্রাটের আচারের অনুকরণ মনে করেন। অশোকের যুগে কাঠের বদলে যে প্রস্তর-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিকাশ হয় ভারতবর্ষে, কলাবিদ্‌রা মনে করেন, তাহাতেও পারস্য ও পশ্চিম এশিয়ার প্রভাব আছে যথেষ্ট। মৌর্য সম্রাটরা এইসব দেশ হইতে কারুশিল্পীদের আনাইয়া রাজধানীতে রাখিতেন এবং তাহাদের স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও অন্যান্য কারুকর্মে নিযুক্ত করিতেন। ভারতীয় শিল্পীরাও মনে হয় পারস্যের রাজকীয় পোষকতা লাভে বঞ্চিত হইতেন না। মৌর্য সম্রাট ও পারসীক সম্রাট উভয়েরই তখন এশিয়ার এই অংশে অখণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহাদের মধ্যে এই ধরনের লেনদেন হওয়া বা সম্পর্ক থাকা আদৌ অসম্ভব নয়। অশোকের পূর্বে পাথরের গায়ে খোদাই করিয়া লিপি প্রকাশের রীতি ভারতে ছিল না বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহার কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পারসীক রাজা ডেরিয়াস (দারয়বউষ) ও তাঁহার বংশধররা পাথরের গায়ে লিপি খোদাই করিয়া প্রকাশ করিতেন। কলাবিদ্‌রা মনে করেন, অশোক তাঁহার শিলালিপি ও শিলানুশাসনের প্রচলন করিয়াছেন পারস্যের প্রভাবে।

ভারত-পারস্য সম্পর্কের প্রমাণরূপে ছোটখাট দুই-একটি নিদর্শনের কথা এখানে বলা যাইতে পারে। অশোক গিরনারের শাসনকর্তারূপে যে 'যবন রাজা'কে নিয়োগ করেন, তাঁহার নাম 'তুষাস্ফ'। ইহা পারসীক নাম মনে হয় (প্রাচীন পারসীক অসফ্ বা অস্প=সংস্কৃত অশ্ব)। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত আছে অশোকের লিপিতে। প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরের অশোক-লিপিতে যেখানে 'লিপি' শব্দ আছে, খরোষ্ঠী অক্ষরের লিপিতে সেখানে 'দিপি' শব্দ আছে। এই 'দিপি' শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন পারসীক শিলালেখেও দেখা যায়।

গ্রীস ও রোমের সান্নিধ্য

গ্রীস ও রোমের সহিতও মৌর্য যুগ হইতে ভারতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, বিশেষ করিয়া গ্রীসের সহিত। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক রাজবংশের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রও পিতার মতো গ্রীক দূতকে রাজদরবারে বরণ করিয়াছিলেন। অশোকের 'যবন' রাজকর্মচারী ছিলেন। পরবর্তীকালে বাহ্লীক (Bactria) গ্রীকরা যখন আবার ভারত-অভিযান করেন তখন ভারত-গ্রীক সম্পর্ক আরও গভীর হয়, উভয়ের মানসক্ষেত্রে পর্যন্ত তাহার প্রভাব পড়ে। এই সময় রোমের সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিতর দিয়া সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সে-বিষয়ে আলোচনা করিব।



অষ্টম অধ্যায়

যুগসন্ধি

এক যুগের অবসান এবং আর-এক নূতন যুগের অভ্যুদয়েব মধ্যের কালকে যুগসন্ধি (Age of Transition) বলে। প্রাচীন ভারতে মৌর্য-যুগের অবসান ও গুপ্ত-যুগের অভ্যুদয়ের মধ্যবর্তী কাল হইল এই যুগসন্ধিকাল। এই সন্ধিকাল প্রায় ৫০০-৫৫০ বৎসর ব্যাপী বিস্তৃত, অশোকের মৃত্যুর (২৩৭-৩৬ খ্রীঃ পূঃ) পর হইতে গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের (৩২০ খ্রীষ্টাব্দ) অভ্যুদয় পর্যন্ত। এই সময় ভারতের রাষ্ট্রিক সংহতি (political unity), যাহা মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত-বিন্দুসার-অশোকের আমলে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। মগধের রাজসিংহাসন লইয়া কলহ-বিবাদ তো হয়ই, পূর্বে কলিঙ্গদেশে এবং দক্ষিণে অন্ধ্রদেশে ক্ষমতাশালী রাজারাও সদম্ভে মাথা তুলিয়া দাঁড়ান। ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। সেই সুযোগে গ্রীক, শক, পার্থিয়ান ও কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির ভারত অভিযানও আরম্ভ হয়। ভারতের অতীত ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, যখনই তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তি ও সংহতি দুর্বল হইয়াছে, তখনই বিদেশীরা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের জন্য অভিযান করিয়াছে এবং সে-অভিযান তাহাদের সফলও হইয়াছে। ভারত-ইতিহাসের এই শিক্ষা আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে।

মৌর্যোত্তর রাজনৈতিক ইতিহাস

অশোকের মৃত্যুর পর মনে হয় তাঁহার পুত্র কুনাল রাজা হইয়াছিলেন। কুনালের পরে 'বন্ধুপালিত' ও 'সম্প্রতি', এই দুইজনের নাম

জানা যায়, কিন্তু 'সম্প্রতি' মনে হয় না কুনালের পুত্র, কারণ এই দুই-জনের মধ্যে, পুরাণকারদের মতে, অনেকে রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দশরথ প্রধান। দশরথের পর আরও কয়েকজন রাজত্ব করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে মৌর্যবংশের শেষ রাজা বলিয়া পরিচিত যিনি তাঁহার নাম বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথকে তাঁহার ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র হত্যা করেন। এই পুষ্যমিত্র সুঙ্গ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৭-১৫১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। সুঙ্গ বংশের শেষ রাজা আবার তাঁহার মন্ত্রী বাসুদেব কর্তৃক নিহত হন (৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। বাসুদেব কাণ্ব-রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সুঙ্গ ও কাণ্ব, উভয় রাজবংশের রাজারা দক্ষিণের এক রাজার দ্বারা বিতাড়িত হন। দক্ষিণে অন্ধ্র অঞ্চলে শক্তিশালী সাতবাহন সাম্রাজ্য মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এবং দক্ষিণ-পূবে কলিঙ্গদেশে খারবেল মগধের অধীনতা ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন। বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি ও সংহতি এইভাবে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়।

এদিকে বিদেশীদের অভিযানও আরম্ভ হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অপর পারেই ছিল সিরিয়া ও বাহ্লীকের গ্রীক রাজ্য। বাহ্লীকের গ্রীকরা এই সুযোগে পাঞ্জাব সিন্ধু প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিয়া, পূর্বে পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ক্যাস্পিয়ানের নিকট পার্থিয়া হইতে পহ্লবরা আসিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের খানিকটা অংশ দখল করিয়া বসে। শকরাও এই সময় অভিযান করে এবং উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে রাজ্য স্থাপন করে। শক রাজাদের 'ক্ষত্রপ' ও 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ছিল। তক্ষশিলা কপিশা অঞ্চলে শকদের এক শাখা রাজত্ব করিতেন, অন্য শাখা পশ্চিমে ও দক্ষিণে রাজত্ব করিতেন। শকবংশ প্রায় ৩০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই বংশের একজন বিখ্যাত রাজার নাম রুদ্রদামন (১৩০-১৫০ খ্রীষ্টাব্দ)।

অবশেষে আসিল উত্তর-পশ্চিম চীনের ইউ-চি জাতির এক শাখা কুষাণরা। প্রথম ও দ্বিতীয় কদফিসের (Kadphises), পরে এই জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হইলেন **কনিষ্ক**। কনিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুরে (পেশোয়ার)। তাঁহার রাজত্ব আফগানিস্থান হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি কাশ্মীরও জয় করিয়াছিলেন। কনিষ্ক ভারতের মাটি, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আপন করিয়া লইয়া ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। অনেকে বলেন, ভারতে **শকাব্দ** গণনা কনিষ্কই প্রবর্তন করিয়াছেন। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়া তিনি প্রায় ১২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টাব্দের ৭৮ বৎসর হইতে তাই শকাব্দ গণনা করা হয়। কনিষ্কের পরে চারজন রাজা হন, তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব উল্লেখযোগ্য।

বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক যোগ

এই সময় রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং রোমান সাম্রাজ্যের নানা স্থানে, পশ্চিম এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ভারতের পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ বাড়িয়া যায়। মিশর রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর, লোহিত সাগরের পথে রোমান ও ভারতীয় বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত। একজন গ্রীক নাবিক তাঁহার 'পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে এই পথের উপর ভারতীয় গঞ্জ ও বন্দরের বিবরণ দিয়াছেন, এবং বাণিজ্যের নানারকম সামগ্রীর বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ভারত হইতে সূক্ষ্ম মসলিন, সাধারণ সূতির কাপড়, রেশম, হাতির দাঁতের জিনিস, মসলাপাতি ও অন্যান্য বহু রকমের দ্রব্য রপ্তানী হইত। বাহির হইতে ভারতে যেসব জিনিস আমদানি হইত, তাহার মধ্যে তামা টিন রূপা প্রবাল ও

কাচের জিনিসপত্র প্রধান। ভারতে প্রস্তুত সৌখিন জিনিসের চাহিদা রোমে যথেষ্ট ছিল।

ভারতের সহিত রোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল (প্রাচীন বন্দরের কাছাকাছি) হইতে বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-ভারতের নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত প্রচুর রোমান মুদ্রার নিদর্শন হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। পণ্ডিচেরীর কাছে একটি প্রাচীন রোমান বাণিজ্য-কুঠির ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গিয়াছে। এই বাণিজ্যের ফলে বাহির হইতে যে প্রচুর ধনদৌলত আসিয়া ভারতে জমা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণিজ্যের আদান-প্রদানে এবং ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এই সময় এত রোমান স্বর্ণ ভারতের ভাণ্ডারে আসিয়া জমা হয় যে প্লিনির মতো বিখ্যাত রোমান পণ্ডিতও তাহার জন্য প্রকাশ্যে আক্ষেপ করিয়াছেন।

ভারত-সংস্কৃতির আত্মীকরণ-শক্তি

ভারতের রাজসিংহাসনের চারিদিকে যখনই আত্মঘাতী হানাহানি ও চক্রান্ত দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে এবং রাজনৈতিক অবনতি ও দুর্বলতা হইতে যখন মনে হইয়াছে যে মুক্তির কোন উপায় নাই, তখনই ভারতের উদার ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতকে রক্ষা করিয়াছে। বিদেশীদের আপন-জনের মতো আত্মসাৎ করিয়া এদেশী-বিদেশী সকলকেই ভারত আবার আত্মস্থ হইবার পথ দেখাইয়াছে। ভারত-সংস্কৃতির এই আত্মীকরণ-শক্তি (power of assimilation) ইতিহাসের এক বিস্ময়কর বিষয় বলিয়া মনে হয়।

গ্রীক শক পহ্লব কুষাণ, কেহই বিদেশ হইতে ভারতে রাজ্যলোভে আসিয়া, আবার ঠিক বিদেশীর মতো নির্লিপ্তভাবে ফিরিয়া যাইতে,

কণিষ্কের সময়


কাশগড়
ইয়ারখন্দ
ব্যাকট্রিয়া
খোটান
কাশ্মীর
গান্ধার
পুরুষপুর
হিমালয়
সিন্ধু নঃ
মথুরা
কান্যকুব্জ
পাটলিপুত্র
যমুনা নঃ
গঙ্গা নঃ
কাশী
মালব
উজ্জয়িনী
মগধ
বুদ্ধগয়া
সৌরাষ্ট্র
তাম্রলিপ্ত
কলিঙ্গ
প্রতিষ্ঠান
কৃষ্ণা নঃ
চোল
পাণ্ড্য

অথবা এখানে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। যাঁহারা তরবারি দিয়া ভারতকে আঘাত করিয়াছেন, ভারত তাহার নিজের উদার ভক্তি-প্রীতির মানবধর্ম ও সংস্কৃতি দিয়া তাহাদের প্রতিঘাত করিয়াছে। ভারত আঘাত সহ্য করিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু বিদেশীরা প্রতিঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, গ্রীক শক পহ্লব কুষাণ যেই হউন, শেষ পর্যন্ত সকলে 'ভারতীয়' হইয়া গিয়াছেন। ভারতও বিদেশী সংস্কৃতির ভাবগত সম্পদ আত্মসাৎ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে।

গ্রীক রাজা মিনাণ্ডারেব রাজধানী ছিল শাকলে (বর্তমান শিয়ালকোট)। গান্ধার হইতে মথুরা এবং সিন্ধু হইতে ভৃগুকচ্ছ (ভরোচ) পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এত বড় বিদেশী রাজা শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের ভক্ত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত পালি গ্রন্থ 'মিলিন্দ পহ্‌হো'র মিলিন্দ হইলেন মিনাণ্ডার। বৌদ্ধ সাধু নাগসেনের সহিত প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। সীমান্ত প্রদেশে গ্রীক শিল্পী ও ভাস্কররা বুদ্ধমূর্তি গড়িলেন। গ্রীক-ভারতীয় রীতির মিলনে শিল্পকলায় নূতন গান্ধার-রীতির প্রবর্তন হইল। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে এই গান্ধার-রীতির গুরুত্ব কলাবিদ্‌রা সকলেই স্বীকার করেন। অনেক গ্রীক রাজা 'ধার্মিক' উপাধি লইলেন এবং হেলিওডোরস নামে একজন গ্রীক দূত পরম বিষ্ণুভক্ত হইয়া এক গরুড়স্তম্ভ স্থাপন করিলেন। বিদিশা বা বেসনগরে এই স্তম্ভ এখনও আছে। কালক্রমে শকেবাও বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। রুদ্রদামন নাম শক-দেশীয় নয়। কুষাণরা কেডফাইসাস বা কদফিসের আমলে শিবভক্ত ছিলেন বুঝা যায়, কারণ তাঁহাদের মুদ্রায় শিবমূর্তি আছে। কনিষ্ক কুষাণ হইলেও, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সম্রাট অশোকের পরে তাঁহারই নাম করিতে হয়। কনিষ্ক নিজে

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং পেশোয়ারের নিকট একটি বিরাট চৈত্য নির্মাণ করান। বৌদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনার জন্য তিনি কাশ্মীরে একটি সভা আহ্বান করেন। শোনা যায়, এই সভায় ৫০০ বৌদ্ধ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। কনিষ্কের সময় হইতেই বুদ্ধমূর্তি পূজা আরম্ভ হয়। গ্রীক শিল্পীরা বুদ্ধমূর্তি গড়িয়া তাহার সূচনা করিয়াছিলেন। কনিষ্ক তাহা প্রবর্তন করিলেন। বুদ্ধ নিজে মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। সম্রাট অশোকও মূর্তিপূজার কথা বৌদ্ধদের বলেন নাই। কনিষ্কের আহ্বানে বৌদ্ধদের যে সভা হয়, তাহাতে এই মূর্তিপূজার পক্ষে মত প্রাধান্য পায়। এই জনপ্রিয় বৌদ্ধধর্মই 'মহাযান' ধর্ম নামে পবিচিত। পুরাতন বৌদ্ধধর্ম 'হীনযান' নামে খ্যাত। মহাযান-ধর্মই দেশে-বিদেশে দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের যে ব্যবধান ছিল তাহা ক্রমে এইভাবে ভাঙিয়া যায়। হিন্দুধর্মের ভক্তি প্রেম ও বহু দেবদেবীর মতো বৌদ্ধধর্মেও ভক্তি প্রেম ও বহু দেবদেবীর আবির্ভাব হয়। ভারতের জনমানসে দুই ধর্মের ব্যবধান আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়, কে বৌদ্ধ কে হিন্দু, কোন ভেদ থাকে না। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের এই মিলন-মিশ্রণের পথ একজন বিদেশী রাজা নিজে বৌদ্ধ হইয়া এবং ধর্মের পোষকতা করিয়া, পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। এ-কথা ভাবিলে আরও বিস্মিত হইতে হয়।



নবম অধ্যায়

গুপ্ত-যুগ

একজন প্রাচীন ভারতীয় কবি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে শক পহ্লব কুষাণ ও অন্যান্য ম্লেচ্ছরা দেশ-শাসনকালে ক্রমে ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত হইবে এবং ভারতের ভাগ্যাকাশে তখন দুর্দিন দেখা দিবে। সোনার দেশ তখন মরুভূমির মতো ধূ ধূ করিবে। ইহাতে দেশপ্রেমিক কবির কল্পনার রঙ একটু বেশী থাকিলেও, কথাটা একেবারে মিথ্যা নহে। দেখিতে দেখিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজারা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজবংশের রাজারা উত্তর-ভারতের বিদেশী রাজাদের কবল হইতে ভারতকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহারা কিছুটা সফল হইলেও, সম্পূর্ণ সফল হন নাই। অবশেষে ভারতের এক নূতন রাজবংশে আর-এক নূতন চন্দ্রগুপ্তের উদয় হইল। তাঁহার আগে, পারসীক গ্রীক প্রভৃতি বিদেশীদের অভিযানকালে একজন চন্দ্রগুপ্ত ভারতকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি 'মৌর্য-চন্দ্রগুপ্ত'। এইবার যে-চন্দ্রগুপ্ত নূতন গুপ্ত-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া আবার খণ্ড-ছিন্ন ভারতকে এক-রাজ্যের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, তিনি 'গুপ্ত চন্দ্রগুপ্ত'। মগধের উত্থান ও পতনের পর আবার মগধের পুনরভ্যুত্থান হইল।

গুপ্ত-রাজবংশ

৩২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসিয়া গুপ্ত-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং পাটলিপুত্রে আবার ভারতের রাজধানী স্থাপিত হয়। লিচ্ছবি-বংশের আঞ্চলিক রাজাদের তখন বিহার ও নেপাল

অঞ্চলে বেশ প্রতিপত্তি ছিল মনে হয়। বিবাহের দ্বারা তখন এক রাজবংশ অন্য রাজবংশের সহিত বন্ধুত্ব করিতেন। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি-কন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া তাহাই করিলেন। তাঁহাদের পুত্র হইলেন সমুদ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্ত এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া পরিচিত।

দিগ্বীজয়ী সম্রাট ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ান' বলিয়াছেন। এলাহাবাদে যে প্রস্তর-স্তম্ভে সম্রাট অশোকের ধর্মলিপি আছে, সেই স্তম্ভেরই গায়ে পবে সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিসেন রাজকীর্তির কথা লিখিয়া গিয়াছেন। উত্তর-ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া, মধ্যপ্রদেশের ও মাদ্রাজের উপকূল পর্যন্ত বহু রাজ্য জয় কবিয়া সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার দিগ্বিজয় শেষ করেন। সমস্ত বিজিত রাজ্য, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-ভারতের অনেক রাজ্য, তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নাই। ইহা তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা বলিতে হইবে। যাহা রক্ষা করা যাইবে না, এবং যাহার জন্য রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ দেখা দিতে পারে, তাহা তিনি তাঁহার রাজ্যভুক্ত করেন নাই। যমুনা ও চম্বল হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এবং হিমালয় হইতে নর্মদা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। দিগ্বিজয়ের শেষে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং এই অশ্বমেধের ঘোড়া তাঁহার মুদ্রায় খোদিত আছে। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক বৎসর পরে তিনি রাজত্বলাভ করেন, এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীর বেশী কাল রাজ্য শাসন করিবার পর ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের কিছুদিন আগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

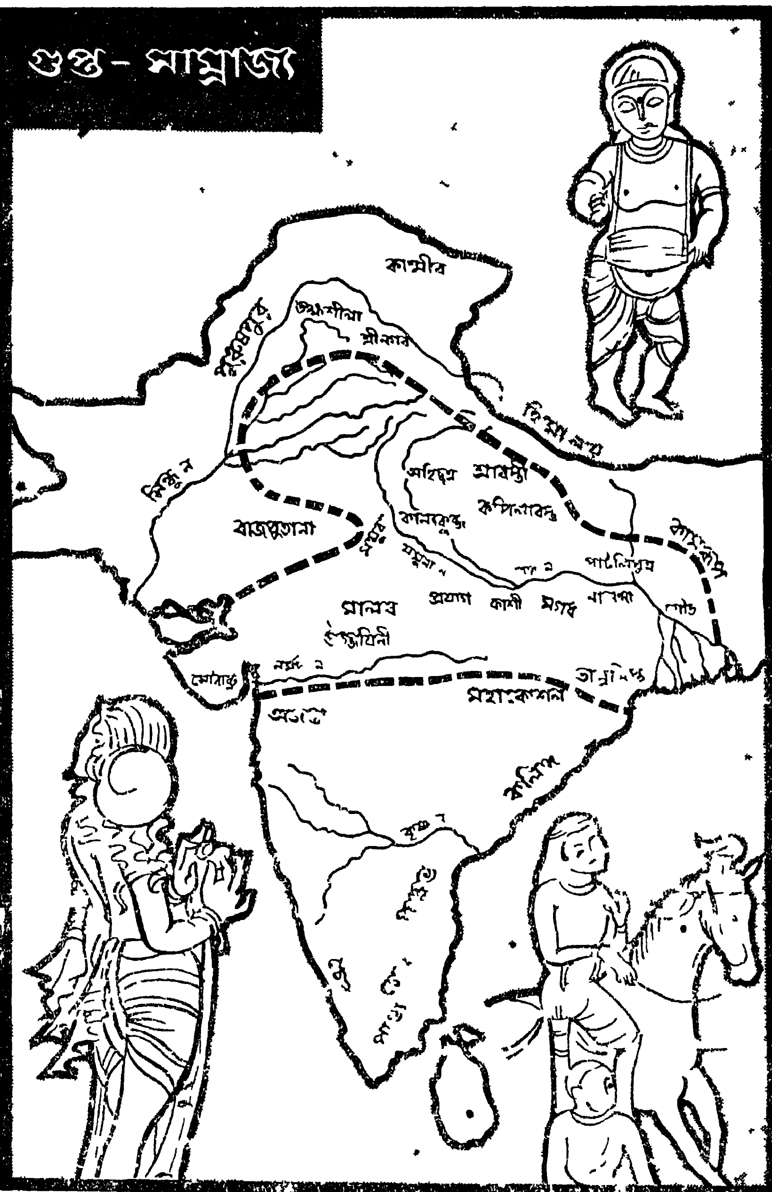
সমুদ্রগুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র 'দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত' রাজা হন। আনুমানিক ৩৮০-৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল। পশ্চিম

মালব ও সৌরাষ্ট্র জয় করিয়া তিনি গুপ্তসাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। সৌরাষ্ট্রের শক ক্ষত্রপদের পরাজিত করিয়া তিনি 'শকারি' (শকদের অরি বা শত্রু) উপাধি গ্রহণ করেন। আমাদের দেশের প্রচলিত কাহিনীতে উজ্জয়িনীর রাজা যে বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার নবরত্ন-সভার কথা শোনা যায়, ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সেই বিক্রমাদিত্য হইতে পারেন।

বিক্রমাদিত্যের পর 'প্রথম কুমারগুপ্ত' ও স্কন্দগুপ্ত রাজত্ব করেন, ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। স্কন্দগুপ্তের আমলে দুর্ধর্ষ হূনদের আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বিপর্যয় দেখা দেয়। তাহার পরেও অবশ্য গুপ্তবংশ প্রায় শতাধিক বৎসর নানা স্থানে রাজত্ব করেন। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ (কান্যকুব্জ) ও বাংলা-দেশের গৌড়ের রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠেন, রাজশক্তির লড়াই চলিতে থাকে এবং মগধের রাজ-গৌরব আবার ম্লান হইয়া যায়। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধন হূনদের জয় করিয়া শক্তিশালী হন। তাঁহারই পুত্র বিখ্যাত হর্ষবর্ধন, সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে রাজা হন। পূর্ব-ভারতে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক। বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন রাজা গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর-ভারতের রাজমঞ্চের নায়ক দুইজন, হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্ক। এই সময় বাংলার রাজা শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের অভিযান প্রতিরোধ করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। সে-কথা আমরা পরে বলিব।

চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ

ফা-হিয়েন। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে তীর্থভ্রমণে আসিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার



গুপ্ত-সাম্রাজ্য
কাশ্মীর
তক্ষশীলা
পুরুষপুর
শ্রীনগর
হিমালয়
সিন্ধু নদ
অহিছত্র
শ্রাবস্তী
কপিলাবস্তু
কান্যকুব্জ
রাজপুতানা
মথুরা
যমুনা নদী
পাটলিপুত্র
কামরূপ
মালব
প্রয়াগ
কাশী
মগধ
গৌড়
উজ্জয়িনী
সৌরাষ্ট্র
নর্মদা নদী
তাম্রলিপ্ত
মহাকোশল
কলিঙ্গ
কৃষ্ণা নদী

বহু দুস্তর গিরি ও মরু অতিক্রম করিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুর্গম সীমান্ত-পথে তিনি এদেশে আসেন। তখন কপিলাবস্তু শ্রাবস্তী রাজগৃহ বৈশালী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান প্রায় জনমানবশূন্য ছিল বলা চলে। কেবল বৌদ্ধ বিহারগুলিতে কয়েকজন করিয়া শ্রমণ বাস-করিতেন। পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট অশোকের বিশাল রাজপ্রাসাদ দেখিয়া ফা-হিয়েন হতবাক হইয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে এত বড় প্রাসাদ নির্মাণ করা মানুষের অসাধ্য। এইখানে থাকিয়া তিন বৎসর তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তাঁহার ভারত-ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, 'বিনয়পিটক' নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠ সংকলন করা। পাটলিপুত্রে থাকিবার সময় তিনি অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ নকল করিয়া লইয়াছিলেন এবং দেশে ফিরিয়া গিয়া পরে তাঁহার কতকগুলি সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তখনকার রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থারও তিনি বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে তখন ভারতের অবস্থা বেশ ভালই ছিল, রাজস্বের হার বেশ অল্পই ছিল, দণ্ডনীতিও তেমন কঠোর ছিল না। চুরিডাকাতি বা রাজ-বিদ্রোহ করিলে অপরাধীর হাত-পা কাটিয়া দেওয়া হইত, প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত না। রাজপথে চোরডাকাতের তেমন উপদ্রবও ছিল না। অন্যান্য অপরাধের জন্য শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড। প্রজাদের সুখসুবিধার দিকে রাজার সজাগ দৃষ্টি থাকিত। রাজকর্মচারীরা নির্দিষ্ট বেতন পাইতেন। পাটলিপুত্র নগরে বহু ধনী শ্রেষ্ঠী ও বণিকের বাস ছিল। প্রজাদের জন্য নগরে নগরে ধর্মশালা ও দানশালা ছিল। ধনিক বণিকেরা এগুলির ব্যয় নির্বাহ করিতেন। বিশেষ করিয়া নগরের হাসপাতালের ব্যয়। খাদ্য ও পণ্যদ্রব্য বেশ সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত এবং প্রজারা নিশ্চিন্তে সুখে দিন কাটাইত।

দেশের নানা স্থানে ছিল বৌদ্ধ মঠ ও অন্যান্য দেবমন্দির। রাজধানীর উৎসবের মধ্যে ফা-হিয়েন রথযাত্রার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পশুহত্যা কেবল চণ্ডাল-জাতির লোকেরাই করিত, তাহারা নগরের সীমানার বাহিরে থাকিত, ভিতরে প্রবেশ করিত না। নগরে প্রবেশ করিবার সময় তাহারা কাঠি বাজাইয়া শব্দ করিত, যাহাতে লোকে সরিয়া যায়। ভারতের লোকজন তখন জাহাজে করিয়া সমুদ্রপথে বহু দূর দেশে যাতায়াত করিত। বাংলাদেশের বিখ্যাত বন্দর ছিল তখন তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুরের তমলুক)। এখান হইতে বণিকেরা সিংহল ব্রহ্মদেশ মালয় কম্বোজ প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। ভারতে তখন হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ছিল বেশী, রাজারা অনেকে নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, গুপ্তবংশের রাজারা তো ছিলেনই। কিন্তু তাঁহারা অন্যান্য ধর্মের প্রতি কোন উপেক্ষা বা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতেন না। হিন্দু রাজারা খুবই ধর্মসহিষ্ণু ও উদার ছিলেন। তাই হিন্দু ধর্মের পাশে বৌদ্ধ জৈন ও অন্যান্য ধর্মও বিরাজ করিত। হিন্দু ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ শ্রমণ, সকলে পাশাপাশি বাস করিতেন। রাজাদের মতো, ভারতের সাধারণ মানুষও ভদ্র, সহিষ্ণু, সদাচারী, শান্ত ও অহিংস ভাবাপন্ন। ভারতের রাজা ও প্রজা উভয়ের সম্বন্ধে ফা-হিয়েনের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

ভারতের সকল স্থানে ইচ্ছা মতো ঘোরাফেরা করা যাইত, কোন ছাড়পত্রের কড়াকড়ি ছিল না। ভারতের উত্তরে গান্ধার তক্ষশিলা পুরুষপুর মথুরা কান্যকুব্জ কোশল শ্রাবস্তী কপিলাবস্তু বৈশালী পাটলিপুত্র রাজগৃহ ও তাম্রলিপ্তে ঘুরিয়া ফা-হিয়েন প্রায় পনের বৎসর কাটাইয়া দেন। ইহার মধ্যে তিনি পাটলিপুত্রে তিন বছর এবং

বাংলার তাম্রলিপ্ত শহরে দুই বছর বাস করেন। তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে হিন্দু নাবিকদের জাহাজে চড়িয়া, সমুদ্রপথে সিংহল ও জাভা ঘুরিয়া তিনি চীনে ফিরিয়া যান।

হিউয়েন সাঙ। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে আসেন। কনৌজেশ্বর ও গৌড়েশ্বর তখন ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত। ফা-হিয়েনের মতো হিউয়েন সাঙও সুপণ্ডিত ও ধর্মানুরাগী। ভারতের নানা অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া তিনি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের ভারতীয় সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে-সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ঐতিহাসিকের কাছে তাহা মূল্যবান সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। ফা-হিয়েনের মতো তিনিও প্রায় চৌদ্দ বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন এবং প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার জন্যই তিনি ভারতে আসেন।

ফা-হিয়েনের প্রায় দুই শত বৎসর পরে তিনি ভারতে আসিলেও এবং ইহার মধ্যে গুপ্তসম্রাটদের ভাগ্য-রবি অস্তাচলে গেলেও, দুই পবিব্রাজকের বিবরণের মধ্যে অনেক বিষয় মিল আছে দেখা যায়। ভাবতের রাজা, প্রজা, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে উভয়ের মন্তব্য প্রায় একরকম। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের কথা হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন বিদ্বেষের ভাব নাই, একথা বলিতে তিনিও ভোলেন নাই। বৌদ্ধ ধর্মের তখন সুদিন ছিল না। বৌদ্ধ নগরগুলিও তখন প্রায় জনহীন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সমৃদ্ধি, অথবা বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির চর্চা বা অনুশীলন তখনও যথেষ্ট ছিল। হিন্দু রাজারা তাহাকে উচ্ছেদ করেন নাই। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তখনও প্রায় ৫০০০ বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং তাহাতে প্রায় দুই লক্ষেরও

অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিত বাস করিয়া জ্ঞানবিদ্যার তপস্যা করিতেন। বিদ্বৎ-সমাজে দেবভাষা সংস্কৃত চর্চা বেশী হইত, এবং কেবল ব্রাহ্মণরা নহেন, বৌদ্ধ পণ্ডিতেরাও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। বিহারে **নালন্দা** মঠে একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বৌদ্ধ আচার্য ও পণ্ডিতগণ ছাত্রদের পড়াইতেন। তাঁহাদের অধ্যাপনার সুনাম দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিক্ষালাভের জন্য চীন, তাতার, পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বহু দূর দেশ হইতে ছাত্ররা আসিত। হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন, নালন্দায় প্রায় ১০,০০০ ছাত্র ছিল। ছাত্রদের লেখা-পড়ার ও থাকা-খাওয়ার ব্যয়-ভার দেশের রাজারা ও ধনী ব্যক্তিরা বহন করিতেন। কঠিন সংযম ও শৃঙ্খলার মধ্যে ছাত্রদের জীবন কাটাইতে হইত। ছাত্রদের বসিবার হলঘর, পাঠাগারের জন্য কক্ষ এবং ছাত্রনিবাসের (হোস্টেল) উপযোগী দালান-ঘরের সুব্যবস্থা ছিল। তখনকার বিখ্যাত পণ্ডিতেরা এই বিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। প্রধান আচার্য শীলভদ্র বাঙালী ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। মাটি খুঁড়িয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা নালন্দা অঞ্চল হইতে প্রচুর মূর্তি স্তূপ ইত্যাদি বাহির করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের প্রাচীন ঘরবাড়ীর নিদর্শনও অনেক পাওয়া গিয়াছে। শোনা যায়, একটি ছয়তলা বাড়ীতে নাকি মঠ ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহার তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়িগুলি এখনও রহিয়াছে।

দেশের কৃষি, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ প্রায় এক কথাই বলিয়াছেন। দেশের চাষবাস ভাল, গ্রামের লোকবসতিও বেশ ঘন। পথঘাটে চোরডাকাতের উপদ্রব কিছুটা হিউয়েন সাঙকে সহ্য করিতে হইয়াছিল বুঝা যায়, কিন্তু খুব বেশী নহে। ভারতবাসীরা এমনিতে খুবই শান্তিপ্রিয়, সৎ, ধর্মভাবাপন্ন,

অহিংস ও পরোপকারী। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধিও তখন যথেষ্ট ছিল। সমুদ্রপথে বিদেশের নানা স্থানের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

ভারত-সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ

বৌদ্ধধর্ম যখন রাজধর্ম ছিল, তখনও বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির পাশাপাশি হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির স্বচ্ছন্দ বিকাশ ব্যাহত হয় নাই। প্রত্যক্ষ রাজপোষকতা না পাইলেও, প্রাচীন ভারতের রাজারা কোন ধর্মাচরণে বাধা দেন নাই কখনও। বৌদ্ধ-প্রভাবের যুগে যাহা সত্য ছিল, হিন্দু প্রাধান্যের যুগেও তাহা মিথ্যা হয় নাই। গুপ্ত-যুগ ভারতে হিন্দু-প্রাধান্যের ও অভ্যুত্থানের যুগ। কিন্তু গুপ্ত-যুগেও যে বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির অনুশীলন কতখানি হইত, প্রত্যক্ষদর্শী চীনা পরিব্রাজকদের বৃত্তান্ত হইতে তাহা জানা যায়। তবু গুপ্তযুগে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্যময় বিকাশ ও সমৃদ্ধি সর্বক্ষেত্রে দেখা যায়, তাহার তুলনা নাই। সেইজন্য গুপ্ত-যুগকে ভারত-সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলেন ঐতিহাসিকেরা। কেন এই স্বর্ণযুগের উদয় হইল ?

বৈদিক যুগে আর্য-অনার্যের বিরোধ ও সংঘাত, মৌর্য বৌদ্ধ-জৈন যুগের মধ্য দিয়া মিলনের পথে অগ্রসর হইতেছিল। সুবিস্তৃত সমন্বয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল জৈন-বৌদ্ধ যুগে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে বৈদিক ও হিন্দু যুগের মধ্যে জৈন-বৌদ্ধ যুগ সেতুবন্ধনের কাজ করিয়াছে। ঐতিহাসিকদেরও এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। এই সমন্বয়ের প্রস্তুতির সুদীর্ঘ পর্ব শেষ হইবার পরে গুপ্ত-যুগের অভ্যুদয় হয়। তাহার আগেই বৌদ্ধধর্ম মহাযান-রূপে হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতির সহিত তাহার মৌলিক ব্যবধান ভাঙিয়া, দেবদেবী,

পূজা-অনুষ্ঠান ও শাস্ত্ররচনার মধ্য দিয়া, মিলনের পথে আগাইয়া গিয়াছিল। গুপ্ত-যুগে যখন হিন্দু প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল, স্বভাবতঃই তখন তাই যেন হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির নবজাগরণের সূচনা হইল। ধর্ম সাহিত্য শিক্ষা শিল্পকলা বিজ্ঞান সমাজ রাষ্ট্র, সর্বক্ষেত্রে নব-নব প্রতিভার উন্মেষ হইতে লাগিল। সৃষ্টির বন্যা আসিল। ভারত-সংস্কৃতির ভাণ্ডার ঐশ্বর্যে ভরিয়া গেল।

রাষ্ট্র ও সমাজ। মৌর্য যুগের মতো গুপ্ত-যুগেও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র (Hereditary Monarchy) প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসন-ব্যবস্থারও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নাই। কারণ বৃহত্তর জনসমাজে এমন নূতন কোন সমস্যা দেখা দেয় নাই, যাহার জন্য নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে দেখা যায়, সভ্যবৃন্দ সমুদ্রগুপ্তের অভিষেককালে উপস্থিত ছিলেন। সভ্যবৃন্দ বলিতে মন্ত্রিপরিষদ অথবা রাজ-দরবারের সভাসদদেরও বুঝাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের মধ্যে 'অক্ষপটলাধিকৃত' (Minister in charge of Records), 'মহাদণ্ডনায়ক' ও 'মহাবলাধিকৃত' (বিচারপতি ও সেনাপতি), 'কুমারামাত্য' ও 'অমাত্য' (Provincial and District Officers) প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে 'সন্ধিবিগ্রহিকের' (Minister in charge of Peace and War) প্রাধান্য ছিল বেশী মনে হয়। শক্তিশালী রাজ্যে এই পদের গুরুত্ব থাকাই স্বাভাবিক। সবার উপরে ছিলেন রাজা এবং তাঁহাকে দেবতুল্য মনে করা হইত। এলাহাবাদ লিপিতে সমুদ্রগুপ্তকে কুবের, বরুণ, ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সমকালীন কবি (যেমন 'বাণ') ও পণ্ডিতেরা অনেকে রাজার উপর এই দেবত্ব আরোপের বিরোধী ছিলেন।

রাজ্য বিভক্ত ছিল ভুক্তি-দেশ-রাষ্ট্র-মণ্ডল ইত্যাদি ভাগে। 'ভুক্তি' বলিতে প্রাদেশিক বিভাগ বুঝাইত, তাহার শাসনকর্তা ছিলেন 'উপরিক'। ভুক্তি ছিল 'বিষয়' ও 'মণ্ডলে' বিভক্ত। বিষয়পতি বা মণ্ডলপতি (District Officer) তাহার শাসক ছিলেন। ক্ষুদ্রতম বিভাগ ছিল 'গ্রাম' এবং 'গ্রামিক' তাহার কর্তা ছিলেন। গ্রাম, গ্রাম-কর্মচারী বা গ্রাম্যসমাজের কোন পরিবর্তন হয় নাই। সেখানে স্বায়ত্তশাসন বজায় ছিল। উপরের শাসক ও রাজকর্মচারীরা কোনদিন তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, করিবার দরকারও হয় নাই। গ্রাম্য-সমাজেব অর্থনৈতিক স্বয়ংপূর্ণতা ভারতে দীর্ঘকাল বজায় ছিল, প্রায় ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত, একথা আগে আলোচনা করা হইয়াছে। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের উক্তি হইতে বুঝা যায়, গুপ্ত আমলে ভারতের সাধারণ গ্রামবাসীরা কতখানি নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে, মোটামুটি পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করিত। রাষ্ট্রের উপরতলার রাজা-বদলের জন্য কোনদিন ভারতের গ্রাম্য সমাজ-জীবনের এই নিশ্চিন্ততা বিপর্যস্ত হয় নাই।

সাহিত্য-বিজ্ঞান। গুপ্তযুগে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি বিস্ময়কর। সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে কবি-সম্রাট বা কবি-রাজ (King of Poets) বলিয়া আনন্দ পাইতেন। তাঁহার রাজসভায় বিখ্যাত কবি ছিলেন হরিসেন। ইনিই এলাহাবাদ স্তম্ভের প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। আরও অনেক কবি-সাহিত্যিক নিশ্চয় তাঁহার পোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার কথা গল্পের মতো সকলে জানেন। বীরসেন নামে একজন কবি তাঁহার মন্ত্রিপরিষদের সভ্য ছিলেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার রত্নসভার শ্রেষ্ঠ কবি। মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ প্রভৃতি কালি-

দাসের প্রসিদ্ধ রচনা। ভারবীও গুপ্তযুগের কবি এবং তাঁহার 'কিরাতার্জুনীয়' বোধ হয় ঐ সময়ের রচনা। 'মৃচ্ছকটিক' ও 'মুদ্রা-রাক্ষস' নাটকও গুপ্তযুগে রচিত হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। অধিকাংশ 'পুরাণ' গুপ্তযুগে রচিত ও সংকলিত হয় এবং পণ্ডিতদের ধারণা, 'মহাভারত'ও এইসময় পূর্ণাকারে রূপায়িত হয়। বিখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থ 'নারদস্মৃতি' ও 'বৃহস্পতিস্মৃতি' এই সময়ের রচনা। কাব্য-সাহিত্য নাট্য-সাহিত্য, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ, স্মৃতিগ্রন্থ ইত্যাদি রচনা-সম্ভারে গুপ্তযুগের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট ও বরাহমিহির গুপ্ত-যুগেই তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করেন। আর্যভট্ট কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জানিতেন যে পৃথিবী একটি গোলকের মতো এবং নিজের কক্ষে ইহার আবর্তন হইতেছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সময় রাহু সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে। চন্দ্রের ও পৃথিবীর ছায়া পড়িয়া যে গ্রহণ হয়, একথা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর্যভট্ট দুইখানি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একখানি পাওয়া যায়। ভারতে বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষের আরম্ভ আর্যভট্ট হইতে। আর্যভট্টের পরে বরাহমিহির 'বৃহৎ সংহিতা' ও 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন। এই সময় ভারতীয় আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রেরও বিশেষ চর্চা হয় এবং শারীরবিদ্যা (Anatomy) ও চিকিৎসাবিদ্যায় যে সেকালের হিন্দুরা কতখানি পারদর্শী, কৌতূহলী ও অনুসন্ধানী ছিলেন, তাহা চরক (গুপ্তযুগের অনেক আগের), সুশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায়। প্রাচীন হিন্দুদের রসায়নবিদ্যার (Chemistry) জ্ঞানও যে বেশ উন্নত ছিল তাহা আয়ুর্বেদশাস্ত্র অনুশীলন করিলে জানা যায়।

ইহা ছাড়া, ধাতুবিজ্ঞানেও (Metallurgy) গুপ্তযুগ উন্নত ছিল মনে হয়। কারণ দিল্লীর লৌহস্তম্ভে (গুপ্তযুগের) গত ১৫০০ বৎসরেও মরিচা ধরে নাই। তখনকার কালে আর কোন দেশে এরকম নিষ্কলঙ্ক লৌহ প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। গুপ্তযুগের তামা ও ব্রোঞ্জের ধাতু-নির্মিত দেবমূর্তি দেখিয়াও ধাতুবিজ্ঞানের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল বুঝিতে পারা যায়।

শিল্পকলা। গুপ্তযুগে উত্তর-ভারতে শিল্পকলারও চরম উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ের বহু মন্দির, প্রাসাদ, ধাতু ও পাথরের মূর্তি, স্তম্ভ ও খোদিত চিত্র (bas-relief) আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিদর্শনগুলি বেশী পাওয়া গিয়াছে মথুরায় ও বারাণসীতে। বাংলায় ও মগধে আবিষ্কৃত নিদর্শনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও, দেবদেবীর মূর্তি-গুলির কলানৈপুণ্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কলাবিদ্‌রা বলেন, গুপ্তযুগে বৌদ্ধ ও হিন্দু ভাস্কর্য, দুইই ভাবগাম্ভীর্যে ও অঙ্গবিন্যাসের সামঞ্জস্যে অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। মথুরা ও কুষাণরীতির ভাস্কর্যের মধ্যে রূঢ়তা ছিল এবং গান্ধার-রীতির মধ্যে যে গ্রীক প্রভাব ছিল, তাহা এই সময় স্নিগ্ধ সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। ভারতীয় 'ভাস্কর্যের নিজস্ব ক্ল্যাসিকাল রীতির ভিত্তি এই সময় রচিত হয়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে গুপ্তযুগের এই শিল্পকলারীতি ও ভাস্কর্যই বৃহত্তর ভারতে, অর্থাৎ সিংহলে, শ্যামে, জাভায়, ব্রহ্মদেশে, সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কেবল পাথরের নহে, ধাতু-মূর্তি নির্মাণ-রীতিরও এই সময় যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল মনে হয়। হিউয়েন সাঙ নালন্দায় একটি ৮০ ফুট উঁচু তামার বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছিলেন। সুলতানগঞ্জের সাড়ে-সাত ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তিও এই সময়কার ভাস্কর্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে অজন্তা গুহার চিত্রাবলী এই সময়কার চিত্র-কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অজন্তার ২৯টি গুহা বৌদ্ধ মঠ-রূপে ব্যবহার করা হইত। কোন কোন গুহাতে বড় বুদ্ধমূর্তি আছে। অজন্তার দেয়ালচিত্র বা ফ্রেস্কোই বিখ্যাত। এই চিত্রগুলি বৌদ্ধ জাতক ও ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত। ইহার মধ্যে তখনকার সমাজের চিত্রও অনেক পাওয়া যায়, যেমন বাণিজ্য-যাত্রা, উপনিবেশ-যাত্রা, গার্হস্থ্য জীবন ইত্যাদি। পৃথিবীর শিল্পবিদ্‌দের কাছে অজন্তার গুহাচিত্র বিস্ময়ের বস্তু।

ধর্ম ও সংস্কৃতি। গুপ্তযুগকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থানের যুগ বলা হয়। কথাটা অনেকখানি সত্য হইলেও, একমাত্র সত্য নহে। কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম এই সময় প্রধানতঃ রাজ-পোষকতা পাইলেও অন্যান্য ধর্মের অনুশীলনে কোন বাধা ছিল না। বাণেব 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে তখনকার বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের যে তালিকা আছে তাহাতে দেখা যায় যে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈন, বৌদ্ধ, ভাগবত ও পঞ্চরাত্র বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। গুপ্ত-যুগে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক বিখ্যাত আচার্য ও দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইলেন অসঙ্গ, বসুবন্ধু, কুমারজীব ও দিগ্‌নাগ। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মই অবশ্য গুপ্ত-যুগে প্রাধান্য লাভ করে। এই সময় ধর্মানুশীলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয় ভক্তি। এই **ভক্তিবাদ** গুপ্ত-যুগের বিশেষ দান। ভক্তিবাদ ধর্মকে মানবীয় ও উদার করিয়া তোলে। তাই গুপ্ত-যুগের লিপি-মুদ্রা ও অন্যান্য সাহিত্যিক নিদর্শনে দেখা যায় যে বৈষ্ণব রাজারা শৈব ও বৌদ্ধ রাজকর্মচারীদের নিয়োগ করিতেছেন, জৈনরা ব্রাহ্মণদের এবং ব্রাহ্মণরা জৈন তীর্থংকরদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইতেছেন। কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করেন না। এই ভক্তি ও

উদারতার ভিত্তির উপরেই গুপ্ত-যুগের সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাই আজ পর্যন্ত ভারত-সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।



দশম অধ্যায়

প্রাচীন যুগের বাংলাদেশ

গুপ্তযুগেব আগে প্রাচীন বাংলার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতীয় ও বিদেশী সাহিত্যে বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে-সব বিক্ষিপ্ত উক্তি আছে, কেবল তাহার সাহায্যে কোন কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনা করা কঠিন। গ্রীকগণ **গঙ্গারিডই** বা গঙ্গারিডি নামে যে এক প্রবল জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা বাংলাদেশবাসী ছিলেন মনে হয়। 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে ও টলেমির বিবরণ হইতে জানা যায় যে প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেও বাংলাব স্বাধীন গঙ্গারিডই রাজ্য বেশ প্রবল ছিল এবং গঙ্গার তীরবর্তী **গঙ্গে** নামক নগর তাহার রাজধানী ছিল। ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ বলেন যে বর্তমান গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের কাছে কোথাও এই 'গঙ্গে' বন্দর-নগর ছিল। বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় এখান হইতে সুদূর পশ্চিমে রপ্তানি হইত। কেবল এই সংবাদটুকু ছাড়া খ্রীষ্টজন্মের পরে তিনশত বৎসর পর্যন্ত, বাংলার সঠিক কোন ইতিহাস বিশেষ জানা এখনও সম্ভব হয় নাই।

গুপ্ত-যুগের বাংলা

চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের আমলে বাংলাদেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে-সব রাজাকে পরাজিত করিয়া আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, চন্দ্রবর্মা তাঁহাদের একজন। বাঁকুড়ার সুসুনিয়া পাহাড়ে খোদিত একটি লিপিতে 'পুষ্করণের' অধিপতি সিংহ-বর্মা ও চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে। সুসুনিয়ার ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বে পোখর্না নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে অনেক প্রাচীন মূর্তি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাই চন্দ্রবর্মার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। ফরিদপুর জেলায় কোটলিপাড়ায় চন্দ্রবর্মকোট নামে একটি দুর্গ ছিল। ষষ্ঠ শতকের শিলালিপিতে তাহার উল্লেখ আছে। ইহাতে অনুমান করা যায়, পশ্চিমে বাঁকুড়া হইতে পূর্বে ফরিদপুর পর্যন্ত চন্দ্রবর্মার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বাংলার পূর্বভাগ (সমতট) সমুদ্রগুপ্তের অধীন করদ রাজ্য ছিল। উত্তর-বঙ্গও (পুণ্ড্রবর্ধন) গুপ্ত-রাজাদের অধীন ছিল। সুতরাং সমস্ত বাংলাদেশই পঞ্চম শতকে গুপ্ত-রাজাদের অধীন ছিল বুঝা যায়।

স্বাধীন বঙ্গরাজ্য

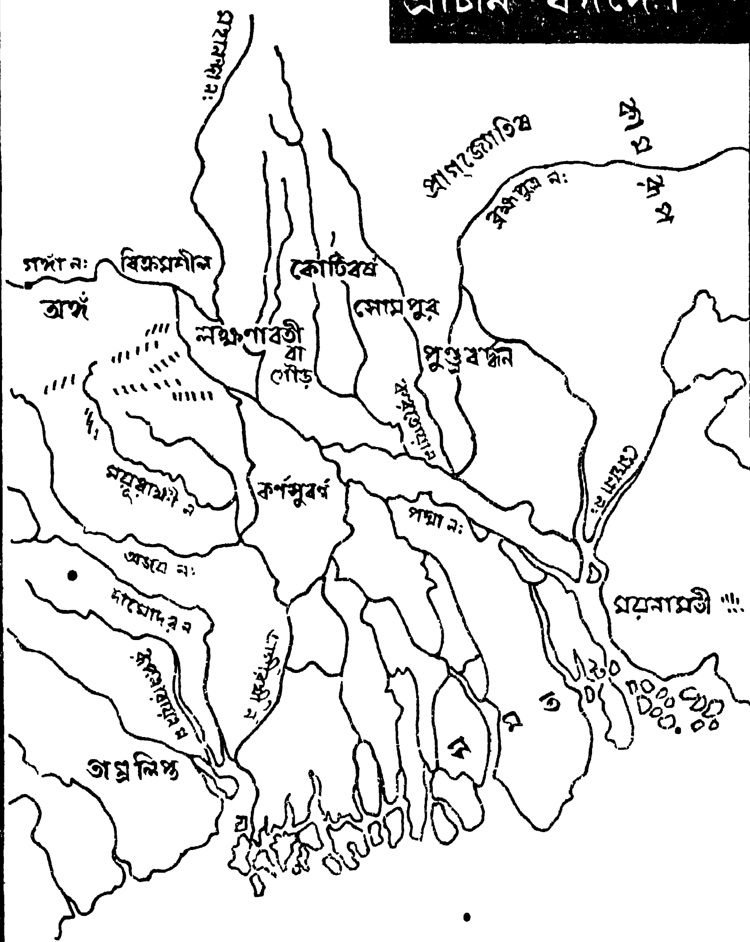
হূনদের অভিযান ও দেশের মধ্যে আঞ্চলিক রাজাদের বিদ্রোহের ফলে ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে গুপ্ত-রাজারা দুর্বল হইয়া পড়েন। এই সময় মনে হয় দক্ষিণ-বঙ্গ ও পূর্ব-বঙ্গ গুপ্ত-রাজাদের অধীনতা ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হয়। কোটালিপাড়ায় পাঁচখানি এবং বর্ধমান জেলায় মল্লসারুলে একখানি তাম্রশাসনে, **গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য** ও **সমাচারদেব** এই তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহারা যে বেশ

শক্তিশালী স্বাধীন রাজা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সমগ্র দক্ষিণ-বঙ্গ এবং পশ্চিম-বঙ্গের কতকাংশ পর্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ পূর্ব-বঙ্গেও তাঁহারা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে ও কি-ভাবে তাঁহাদের রাজত্বের অবসান হয় তাহা সঠিক জানা যায় না। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মণ ষষ্ঠ শতকের শেষ পাদে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ও মগধ জয় করেন। এই সময় স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের পতন হইতে পারে।

গৌড়ের শশাঙ্ক

প্রধান গুপ্তরাজ্যের পতনের পর 'পরবর্তী গুপ্তবংশ' (Later Guptas) বলিয়া পরিচিত আর-এক বংশের গুপ্ত-রাজারা সাম্রাজ্যের একাংশ দখল করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে উত্তর-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের কতকাংশ তাঁহাদের অধীন ছিল। এই সময় বাংলা-দেশের এই অঞ্চল **গৌড়** নামে প্রসিদ্ধ হয়। বর্তমান উত্তর-প্রদেশের মৌখরিবংশের রাজা ঈশানবর্মা গৌড়গণকে পরাজিত করিয়া সমুদ্রতীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন, একথা তাঁহার একখানি শিলালিপিতে লেখা আছে। মৌখরি ও গুপ্তবংশের, রাজাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিতে থাকে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া এই বিবাদ ও সংঘর্ষের ফলে, এবং উত্তর হইতে তিব্বতীয় ও দক্ষিণ হইতে চালুক্য-রাজার আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া গুপ্ত-রাজারা হীনবল হইয়া পড়েন। এই সময় গৌড়দেশে **শশাঙ্ক** এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

শশাঙ্কের বংশ ও বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শিলালিপি ও অন্যান্য প্রমাণাদি হইতে মনে হয়, তিনি পরবর্তী গুপ্ত-রাজাদের অধীনে একজন 'মহাসামন্ত' ছিলেন। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগেই



হিমালয় পর্বতমালা
প্রাচীন বঙ্গদেশ
প্রাগজ্যোতিষ
ব্রহ্মপুত্র নঃ
গঙ্গা নঃ
বিক্রমশীল
অঙ্গ
কোটিবর্ষ
সোমপুর
লক্ষ্মণাবতী
বা
গৌড়
পুণ্ড্রবর্দ্ধন
কর্ণসুবর্ণ
ময়ূরাক্ষী নঃ
পদ্মা নঃ
অজয় নঃ
দামোদর নঃ
ময়নামতী
তাম্রলিপ্ত

তিনি গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙালী রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম রাজা। তাঁহার রাজধানী 'কর্ণসুবর্ণ' মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্গামাটি নামক স্থানে ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। দক্ষিণে দন্ত-ভুক্তি (দাঁতন, মেদিনীপুর জেলা), উৎকল ও গঞ্জাম জেলার কঙ্গোদ রাজ্য শশাঙ্ক জয় করেন। পশ্চিমে মগধ রাজ্যও তিনি জয় করেন। গৌড়ের চিরশত্রু মৌখরিদের দমন করিতে তিনি কৃতসংকল্প হন। হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করা এবং বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শশাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রচলিত আছে। প্রধানতঃ বাণ-ভট্টের 'হর্ষচরিত', হিউয়েন সাঙের বিবরণ ও হর্ষের শিলালিপি, এই কাহিনীর উৎস। কিন্তু ইহা বিদ্বেষপ্রসূত মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। হিউয়েন সাঙের পরস্পর-বিরোধী উক্তির মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হর্ষবর্ধনের পরম বন্ধু হিউয়েন সাঙ খানিকটা সজ্ঞানেই শশাঙ্ক-বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন। তিনি শশাঙ্ককে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ও অত্যাচারী বলিয়াছেন, অথচ শশাঙ্কেরই রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ও রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে তিনি বৌদ্ধ স্তূপ-বিহার ও শ্রমণ যথেষ্ট দেখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অপবাদগুলি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার বিদ্বেষ-জাত অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

সুখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন : "বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনিই প্রথম আর্য্যাবর্ত্তে বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন এবং আংশিকভাবে কার্য্যে পরিণত করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল মৌখরি রাজশক্তি তাঁহার কূটনীতি ও বাহুবলে সমূলে ধ্বংস হয়। সমগ্র উত্তরাপথের অধীশ্বর

প্রবল শক্তিশালী হর্ষবর্দ্ধনের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিলেন। বাণভট্টের মত চরিত-লেখক অথবা হুয়েন সাংয়ের মত সুহৃৎ থাকিলে হর্ষবর্দ্ধনের মতই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইত। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ বিড়ম্বনায় তিনি স্বদেশে অখ্যাত ও অজ্ঞাত ; এবং শত্রুর কলঙ্ক কালিমাই তাঁহাকে জগতে পরিচিত করিয়াছে।"

পাল রাজবংশ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে প্রায় একশত বৎসর পর্যন্ত বাংলাদেশে ঘোর অরাজকতা চলিতে থাকে। সংস্কৃতে এইরূপ অরাজকতাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলে। পুকুরে যেমন বড় মাছ ছোট মাছ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, দেশে অরাজকতার সময় সেই রকম প্রবলেরা দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। এইজন্যই ইহাকে বলে 'মাৎস্যন্যায়'। এই সময় দেশের নেতারা ও প্রজারা স্থির করেন যে সকলে মিলিয়া তাঁহারা একজন রাজা নির্বাচন করিয়া তাঁহাকে মানিয়া চলিবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে **গোপাল** নামে একজন ব্যক্তি রাজা হইলেন, আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে। এই গোপালই বাংলার বিখ্যাত পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

গোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **ধর্মপাল** রাজা হন এবং প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন (আ ৭৭০-৮১০ খ্রী)। মগধ বারাণসী প্রয়াগ ও মধ্যদেশ জয় করিয়া ধর্মপাল প্রায় সমগ্র আর্যাবর্তে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করেন এবং সার্বভৌম সম্রাট বলিয়া গণ্য হন। 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' তাঁহার উপাধি হয়। ধর্মপালের রাজত্বকালকে বাঙালীর গৌরবময় জাতীয় জীবনের প্রভাত-কাল

বলা যায়। ধর্মপালেব মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **দেবপাল** (আ ৮১০-৮৫০ খ্রী) রাজা হন। অনেক যুদ্ধ ও রাজ্য জয় করিয়া দেবপাল পিতৃগৌরব অক্ষুন্ন রাখেন। প্রায় ৩৫-৪০ বৎসর তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাঙালী সৈন্য ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধু নদের তীর এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণ-ভারতের প্রান্ত পর্যন্ত বিজয় অভিযান করিয়াছিল। সমগ্র আর্যাবর্ত তাঁহাকে অধীশ্বর বলিয়া মানিত। ভারতের বাহিরে জাভা, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের রাজা তাঁহাব নিকট দূত প্রেরণ করেন। দেবপালের মৃত্যুর পর **বিগ্রহপাল** রাজা হন (আ ৮৫০-৮৫৪ খ্রী) এবং তাঁহার পর **নারায়ণপাল** (আ ৮৫৪-৯০৮ খ্রী)। ধর্মপাল-দেবপাল যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা বিগ্রহপাল-নাবায়ণপালের রাজত্বকালে বাহির প্রদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের আক্রমণে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়। নাবায়ণপালের পরে **রাজ্যপাল** (আ ৯০৮-৯৪০ খ্রী), **দ্বিতীয় গোপাল** (আ ৯৪০-৯৬০ খ্রী) ও **দ্বিতীয় বিগ্রহপাল** (আ ৯৮০-৯৮৮ খ্রী) রাজত্ব করেন। এই সময় বাহিরের আক্রমণে পাল রাজবংশের অবস্থা দুর্দশাব চরম সীমায় পৌছায়।

ইহার পর **মহীপাল** (আ ৯৮৮-১০৩৮ খ্রী) রাজা হইয়া রাজবংশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধাবের চেষ্টা করেন। আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া তিনি পালসাম্রাজ্য বাবাণসী ও মিথিলা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠ করেন।' ভারতেব দুই প্রবল পরাক্রান্ত রাজা, কলচুরি-রাজ গাঙ্গেয়দেব এবং দক্ষিণ-ভারতেয় চোল-রাজ রাজেন্দ্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াও তিনি পালরাজ্যের অধিকাংশ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহীপালের কথা বাঙালী ভুলিয়া যায় নাই। তাঁহার নামে অনেক স্থানের নাম ও দীঘির নাম আছে, 'মহীপালের গীত'ও আছে। মহীপালের পর **নয়পাল**

(আ ১০৩৮-১০৫৫ খ্রী) ও **তৃতীয় বিগ্রহপাল** (আ ১০৫৫-১০৭০ খ্রী) রাজত্ব করেন। কলচুরি-রাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ এই সময় বাংলাদেশে অভিযান করেন। বীরভূম জেলার পাইকোড় গ্রামে কর্ণের একটি লিপি-উৎকীর্ণ শিলাস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মনে হয় তিনি পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে কর্ণাটের চালুক্য-রাজারাও বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। পালরাজ্য এইসব আক্রমণের ফলে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, রাজ্যের অধীন সামন্তরাও বিদ্রোহ করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের পর **দ্বিতীয় মহীপাল** রাজা হন। বরেন্দ্রভূমির সামন্তবর্গ তখন প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতিহাসে ইহাই 'কৈবর্ত-বিদ্রোহ' বলিয়া খ্যাত। দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করিয়া কৈবর্ত-নায়ক দিব্য বা দিব্বোক রাজা হন। দিব্বোকের ভাই ভীমও কিছুকাল রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় মহীপালের ভাই **রামপাল** (আ ১০৭৭-১১২০ খ্রী) সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করিয়া বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহীদের উৎখাত করিবার চেষ্টা করেন। রামপালের পর তাঁহার পুত্র **কুমারপাল** (আ ১১২০-১১২৫ খ্রী) ও কুমারপালের পুত্র **তৃতীয় গোপাল** (আ ১১২৫-১১৪০ খ্রী) রাজা হন, কিন্তু তখন অন্তর্বিদ্রোহে ও বাহিরের আক্রমণে দেশের চরম দুরবস্থা। চারিদিকে তখন সামন্তরা সুযোগ পাইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং অনেকেই স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বাংলাদেশে এই সময় কর্ণাটদেশীয় সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

সেন-রাজবংশ

সেন-রাজাদের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। কেহ বলেন কর্ণাটের চালুক্য রাজাদের বাংলা-

দেশ অভিযানের সময় তাঁহারা সঙ্গে আসেন। কেহ বলেন চোল-রাজ রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে তাঁহারা আসেন। কি উপায়ে তাঁহারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাও সঠিক জানা যায় নাই। মনে হয়, তাঁহারা বাংলাদেশে আসিয়া পাল-রাজাদের অধীনে সেনাধ্যক্ষ বা সামন্ত অথবা কোন রাজকার্যে নিযুক্ত হন এবং পরে পাল-রাজাদের দুর্বলতা ও ঘরোয়া বিশৃঙ্খলার সুযোগে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সামন্তসেনের পূর্বে সেন-বংশের কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। বৃদ্ধ বয়সে কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়া **সামন্তসেন** রাঢ়দেশে (পশ্চিম-বঙ্গে) গঙ্গাতীরে বাস করিতে থাকেন, এইটুকু শুধু জানা যায়। তিনি কোন স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় না। বিজয়সেনের লিপি হইতে জানা যায় যে তাহার পিতা **হেমন্তসেন** 'মহারাজাধিরাজ' এবং এই বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা ছিলেন। ইহা ছাড়া হেমন্তসেন সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই। হেমন্ত-সেনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র **বিজয়সেন** রাজা হন (আ ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দে)। পাল-রাজাদের শেষ পর্বের অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার পর, বিজয়সেন আবার প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে এক অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। তাহার ফলে বাংলাদেশে আবার সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসে। বিজয়সেনের মৃত্যুর পর (আ ১১৫৮ খ্রী) **বল্লালসেন** রাজা হন এবং সেন-বংশের রাজ্যগৌরব অক্ষুন্ন রাখেন। বাংলাদেশে সমাজ-সংস্কার, কৌলীন্য-প্রথা প্রচলন, শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদি কাযের জন্য বল্লালসেনের কথা বাঙালী ভুলিয়া যায় নাই। ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে **লক্ষ্মণসেন** রাজা হন। লক্ষ্মণসেন যখন রাজা হন তখনই তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তাহার রাজত্বকালে বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশ আক্রমণ করেন (আ ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে)। ১২০৫ অব্দে

অথবা তাহার দুই এক বৎসরের মধ্যে লক্ষ্মণসেন ও বখতিয়ার উভয়েরই মৃত্যু হয়। লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন তাহার পর কিছুদিন রাজত্ব করেন। কিন্তু ইতিহাসের চাকা তখন ঘুরিয়া গিয়াছে এবং আর-এক নূতন পথের বাঁকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেন-রাজবংশের পতন হইতে তাহার সূচনা।

পাল-সেন যুগের বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি

বাংলার পাল-রাজারা সুদীর্ঘ ৪০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেন-রাজাদের রাজত্বকাল তাহার অর্ধেকেরও কম, ১৫০ বৎসরের বেশী নহে। পাল ও সেন, দুই রাজবংশ প্রায় ৫৫০ বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছেন। এই সময়ে বাঙালী জাতি, রাষ্ট্র সমাজ শিক্ষা অর্থনীতি সংস্কৃতি, সর্বক্ষেত্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা চলে। বাঙালীর জীবনে এত দীর্ঘ গৌরবময় যুগ, পূর্বে বা পরে, আর কখনও আসে নাই। কিছুটা মোগল আমলে, শ্রীচৈতন্যের যুগে এবং ব্রিটিশ আমলে উনিশ শতকের নবজাগরণকালে, বাঙালীর জীবনে আবার গৌরবের দিন আসিয়াছিল। কিন্তু পাল ও সেন-যুগের সাংস্কৃতিক গৌরব, পরবর্তীকালের বহু কীর্তির মধ্যে, আজও উজ্জ্বল রহিয়াছে।

সমাজ ও অর্থনীতি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাদেশও কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। উর্বর পলিমাটির দেশ বলিয়া শস্যের প্রাচুর্য ছিল এবং কৃষকেরা মোটামুটি সুখে-স্বচ্ছন্দে তাহাদের গ্রাম্য-সমাজে বসবাস করিত। কিন্তু দেশের সকল লোকেই যে সুখে-শান্তিতে বাস করিত তাহা নহে। সেকালের 'চর্যাপদ'-গুলির মধ্যে সাধারণ ও দরিদ্র জীবনের যে-সব খণ্ডচিত্র পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র বিশেষ পাওয়া যায় না। তখনও দেখা যায়, দরিদ্র গৃহস্থের 'হাড়িত

ভাত নাহি', অর্থাৎ হাড়িতে ভাত নাই। বিবাহের জন্য যৌতুকও তখন যথেষ্ট দিতে হইত এবং বাজনা-বাদ্য সহযোগে বর বিবাহ করিতে যাইত। দারিদ্র্য, অন্নাভাব, যৌতুকের পীড়ন, এসব সেকালেও ছিল দেখা যায়। তবে মানুষের জীবনযাত্রা তখন সরল ছিল বলিয়া তাহা সমাজ-জীবনকে আজিকার মতো বিষাইয়া তোলে নাই।

কৃষিছাড়া, শিল্প-বাণিজ্যেও পাল-সেন যুগ খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। নানা স্থানে হাট গঞ্জ ও বাণিজ্য-বন্দর-নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থলপথে যাতায়াতের বড় বড় রাস্তা ছিল। জলপথে জাহাজ-নৌকার অভাব ছিল না। যুদ্ধযাত্রার জন্য ধর্মপাল বহু নৌকা প্রস্তুত রাখিতেন, একথা তাঁহার তাম্রশাসনে লেখা আছে। রামপাল নৌকাব সেতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিক প্রভৃতি কর্মচারীদের নাম হইতে বুঝা যায়, ঘরে ও বাহিরে বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের রীতিমত প্রতিপত্তি ছিল। তাম্রলিপ্ত, গঙ্গে প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর ছিল। সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়, মুক্তা ও নানা-প্রকারের গাছ-গাছড়া বাংলাদেশ হইতে বাহিবে চালান যাইত। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য এত সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে পাল ও সেন আমলের মুদ্রা (Coin) পাওয়া যায় নাই বলিলেই হয়। ইহা অনেকের কাছে বিস্ময়ের কারণ হইয়া আছে। পাল-রাজারা ৪০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের শিল্পকলা-সাহিত্য ইত্যাদির নিদর্শন প্রচুর পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পাহাড়পুর হইতে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে মাত্র তিন-চারিটি, তাহাও আবার তাম্রমুদ্রা। এই মুদ্রার একদিকে বৃষ, অপরদিকে তিনটি মাছ উৎকীর্ণ। 'শ্রীবিগ্র' নামে কয়েকটি তামার ও রূপার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, কেহ কেহ বলেন এগুলি বিগ্রহপালের মুদ্রা। হইতে পারে, কিন্তু এত অল্প মুদ্রার

নিদর্শন হইতে পালযুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন ধারণা করা কঠিন। সেন-আমলেরও মুদ্রা পাওয়া যায় নাই, কেবল লিপিতে 'পুরাণ' ও 'কপর্দকপুরাণ' নামে মুদ্রার উল্লেখ আছে। কপর্দকপুরাণ কড়ি-জাতীয় কিছু বলিয়া মনে হয়। তখন কড়ির ব্যবহারই বেশী হইত বাংলাদেশে, তাই মুদ্রা পাওয়া যায় না। মুদ্রার স্বল্পতা হইতে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হইয়া উঠে। গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজের বাহিরে সাধারণ লোকের অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ যোগ ছিল না। গ্রাম্য-সমাজেব মধ্যেই তাহাদের সব চাহিদা মিটিয়া যাইত, বাহিরে লেনদেনেব দরকার হইত না। হাট-বাজারে, গঞ্জে ও বন্দরে যেটুকু দবকার হইত, তাহাও হয় দ্রব্যের বদলে দ্রব্য আদান-প্রদান করিয়া, অথবা কড়ি দিয়া মেটানো হইত। অর্থাৎ মুদ্রা-বিনিময়-প্রধান বাণিজ্যেব বদলে পণ্য-বিনিময়-প্রধান (barter) বাণিজ্যই তখন বেশী হইত বুঝা যায়।

গুপ্তযুগেব মতো পালযুগেও ভুক্তি-মণ্ডল-বিষয়ে দেশ বিভাগ করিয়া রাজ্যশাসন করা হইত। প্রধান মন্ত্রী এবং আরও অন্যান্য মন্ত্রী ও অমাত্যের সাহায্যে রাজা কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা করিতেন। 'মহাসন্ধিবিগ্রহিক' একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলা যায় তাঁহাকে। তাঁহার সহিত 'দূত' থাকিতেন। 'রাজস্থানীয়' ও 'অঙ্গরক্ষ' নামে দুইজন অমাত্যের নাম পাওয়া যায়, একজন মনে হয় রাজ-প্রতিনিধি, আব-একজন রাজার দেহরক্ষীদলের নায়ক। রাজস্ব-বিভাগের ভাব ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীর উপর। উৎপন্ন শস্যের উপর নানাবিধ কর ধার্য ছিল, যথা—ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য, উপরিকর ইত্যাদি। মনে হয়, গ্রামপতি ও বিষয়পতিরাই ইহা সংগ্রহ করিতেন। 'ষষ্ঠাধিকৃত' নামে একজন কর্মচারী ছিলেন,

সম্ভবতঃ রাজার প্রাপ্য দ্রব্যের ষষ্ঠভাগ কর ইনি আদায় করিতেন। 'চৌরোদ্ধরণিক', 'শৌল্কিক', 'দাশাপরাধিক' ও 'তরিক' যথাক্রমে চোর-ডাকাতের ভয় হইতে রক্ষার জন্য দেয় কর, বাণিজ্যদ্রব্যের শুল্ক, চুরি-ডাকাতি অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড ও খেয়াঘাটের মাশুল আদায় করিতেন। ইহা ছাড়া, 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' হিসাব ও দলিল বিভাগের কর্মচারী, 'ক্ষেত্রপ' জরীপ বিভাগের কর্মচারী, 'মহাদণ্ডনায়ক' বিচার বিভাগের কর্তা, 'মহাপ্রতীহার' 'দাণ্ডিক' প্রভৃতি পুলিশ বিভাগের কর্মচারী, 'মহাসেনাপতি' সেনাবিভাগের নায়ক এবং আরও অনেক কর্মচারী ছিলেন।

সেন আমলে ইহার সামান্য কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। সেনযুগে পাটক, চতুরক, আবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকটি নূতন শাসনকেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজকর্মচারীদের মধ্যেও 'মহামুদ্রাধিকৃত' 'মহাসবাধিকৃত' প্রভৃতি নূতন কয়েকটি উচ্চপদস্থ অমাত্যের নাম পাওয়া যায়।

পাল-সেন আমলে বাংলার সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্তযুগেও ব্রাহ্মণদের বাস ছিল, কিন্তু শাসনকার্যে তাঁহাদের তেমন হাত ছিল না। পাল-রাজারা বুদ্ধের উপাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মন্ত্রীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণু-উপাসক। রাজবংশের মতো মন্ত্রীবংশও ছিল পালযুগে। গর্গদেব-দর্ভপাণি-সোমেশ্বর-কেদার মিশ্র-গুরব মিশ্র বংশানুক্রমে ও যথাক্রমে ধর্মপাল-দেবপাল-বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন। সেন আমলের অমাত্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিও ছিল। পালযুগে সমাজের গড়ন চতুর্বর্ণ-প্রধানই ছিল এবং বর্ণগুলি বৃত্তিগতভাবে বিভক্ত ছিল। সেনযুগে বল্লালসেনের আমল হইতে কৌলীন্যপ্রথার প্রচলন হয় এবং তাহার

ফলে সমাজে ধীরে ধীরে বর্ণবৈষম্য আরও বাড়িতে থাকে। কৌলীন্য প্রথার মূলে যে সাধু উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাহা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় নাই। জাতিভেদ ও বর্ণভেদ তাহার ফলে ক্রমেই আরও গভীর ও ব্যাপক হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের ঐক্যের ভিত ক্রমেই শিথিল হইয়া গিয়াছে। সমাজ-জীবনের সচলতা ও প্রাণশক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।

শিল্পকলা-সাহিত্য। পাল-সেনযুগের শিল্পকলার নিদর্শন শত শত জৈন বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, বাংলা বিহার ও অন্যান্য স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। এইসব পাথরের ও ব্রোঞ্জের দেব-দেবীর মূর্তিই এই সময়কার শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নমুনা। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মিউজিয়ামে পাল-সেনযুগের দেবদেবীর অনেক মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছে।

পালযুগের সাহিত্যের মধ্যে বিখ্যাত হইল 'চর্যাপদ' ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্য। বাংলা ভাষা ও পদাবলী সাহিত্যের আদি উৎস চর্যাপদগুলি। রামচরিত কাব্যের প্রতি শ্লোক এমন কৌশলে রচিত যে পৃথকভাবে পদবিন্যাস ও শব্দযোজনা করিলে ইহা একদিকে রামায়ণের রামচন্দ্রের, অন্যদিকে পালরাজা রামপালের পক্ষে প্রযোজ্য হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই সময় একজন বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বিখ্যাত 'ন্যায়কন্দলী' প্রণেতা শ্রীধর ভট্ট। শ্রীধর দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠিবাসী (হাওড়া-হুগলির সীমান্তের ভুরশুট গ্রাম) ছিলেন। এ-যুগের বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে বিখ্যাত হইলেন শীলভদ্র (পাল-যুগের পরে), শান্তিরক্ষিত, শান্তিদেব, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রী মিত্র, অভয়াকর গুপ্ত

প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে অনেকে তিব্বতে, সিংহলে, ভারতের বাহিরে জাভা শ্যাম প্রভৃতি দেশে গিয়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেন।

সেন আমলে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চার যথেষ্ট উন্নতি হয়। বল্লালসেন নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বেদস্মৃতিপুরাণাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। লক্ষ্মণসেনের সভাসদ-মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত কবি—উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, জয়দেব মিশ্র, শরণ এবং ধোয়ী। কবি উমাপতি ধর বল্লালসেনেরও মন্ত্রী ছিলেন। কবি-সাহিত্যিকরা যে যোগ্য সমাদর ও শ্রদ্ধা পাইতেন, তাহা তাঁহাদের মন্ত্রিত্বের পদে নিয়োগ হইতে বুঝা যায়। ধোয়ী রচিত দূত-কাব্য (মেঘদূতের মতো) 'পবনদূত' এবং জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' প্রাচীন সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ।

জীবনযাত্রা। বাংলার অধিবাসীরা তখন অধিকাংশই গ্রামে বাস করিত। কিন্তু সমৃদ্ধ নগরেরও তখন অভাব ছিল না। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে পাল রাজধানী 'রমাবতী' নগরের মনোরম বর্ণনা আছে। ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যে সেন রাজধানী 'বিজয়পুরে'র বর্ণনা পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন যে সেকালের সমাজে সজ্জন ও ব্যভিচারী উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল এবং গ্রামের তুলনায় নগরে বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বেশী পরিমাণে ছিল। পাহাড়পুরের (রাজশাহীর অন্তর্গত) মূর্তিগুলি দেখিলে সেকালের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয়। পাথর ও পোড়ামাটির ফলকগুলিতে দেখা যায়, মেয়েরা নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে, শিশুকে কোলে লইয়া জননী কূপ হইতে জল তুলিতেছেন, জলের কলসী লইয়া মেয়েরা গৃহে ফিরিতেছে, কৃষক লাঙ্গল কাঁধে করিয়া



ধ্যানীবুদ্ধ, নবম শতাব্দী



সরস্বতী, একাদশ শতাব্দী

পালযুগের ভাস্কর্য



বিষ্ণু, দশম শতাব্দী



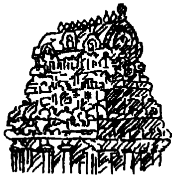
সূর্য, দ্বাদশ শতাব্দী



হিউয়েন সাঙ (প্রাচীন চিত্র)

মাঠে যাইতেছে, বাজিকর বাজি দেখাইতেছে, শীর্ণকায় সাধু কাঁধের উপর লাঠিতে তৈজসপত্র বহন করিয়া ন্যুব্জদেহে চলিয়াছে, পুরুষ ও মেয়েরা নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছে, ব্রাহ্মণ পূজা করিতেছেন, পুরুষ ও নারী উভয়েই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, ধনুর্বাণধারী রথারোহী যোদ্ধা,—এই রকম অসংখ্য দৃশ্যের মধ্যে সেকালের সমাজ জীবনের চিত্র সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধর্ম-সংস্কৃতি। পাল-রাজারা বুদ্ধ-উপাসক এবং সেন-রাজারা শিব ও বিষ্ণু-উপাসক হইলেও, তাঁহাদের রাজ্যে যে ধর্মের কোন গোঁড়ামি ছিল না, তাহা সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অবস্থান হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। এই যুগের জৈন ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি যেমন বহু পাওয়া গিয়াছে, সেইরূপ বিষ্ণু শিব সূর্য গণেশ ও শাক্ত দেবীর মূর্তিও প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। রাজারা বিশেষ কোন ধর্মের অনুগত ছিলেন বলিয়া, রাষ্ট্রের তরফ হইতে কোন ধর্মেরই পোষকতা তাঁহারা করিতেন না। ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের এই উদার নিরপেক্ষতার জন্য, ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে, সেকালের ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতিরও মানবিক প্রশস্ততা ছিল।



একাদশ অধ্যায়

দক্ষিণ-ভারত

এই পর্যন্ত আমরা প্রধানতঃ উত্তর-ভারতের কথা বলিয়াছি। তাহার কারণ, সেই আর্য ও মৌর্য যুগ হইতে গুপ্ত-যুগ পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতেই বড় বড় রাজবংশের ও রাজ্যের উত্থান-পতন হইয়াছে। ইতিহাসের চাকা উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে তখন যে কিছুই ছিল না বা হয় নাই, তাহা নহে। দাক্ষিণাত্যে ও দ্রাবিড়দেশে অন্ধ্র, চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি জনদের মধ্যে শক্তিমান রাজারা ছিলেন, অন্ধ্রের সাতবাহন-বংশের রাজারা উত্তরে অনেক অঞ্চল জুড়িয়া তাঁহাদের রাজ্যও বিস্তার করিয়াছিলেন। আগে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু উত্তর-ভারতের রাজাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তির জন্য তাঁহারা যেন অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া ছিলেন। আরও একটি কারণে তাহাদের মধ্যে একচ্ছত্র অধিপতি কেহ হইতে পারেন নাই। রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রিক ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। পরবর্তীকালেও অবশ্য তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই কারণে, পল্লব, চালুক্য ও চোল নামে যে তিনটি প্রধান রাজবংশ দক্ষিণ-ভারতে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে প্রায় দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। তাহা না হইলেও, ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসে দক্ষিণ-ভারতের এইসব রাজবংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সময় যাহা দান করিয়াছেন—ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পকলায়—তাহা যুগান্তকারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পল্লব রাজবংশ। অন্ধ্রের সাতবাহন-বংশের পতনের পর বেরার প্রদেশে 'বাকাটক-বংশ' রাজত্ব করেন। বাকাটকদের দক্ষিণে কাঞ্চীপুরমের (মাদ্রাজের নিকট আধুনিক কঞ্জিবেরম্) পল্লব রাজবংশ শক্তিশালী হইয়া উঠেন। ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রাজা সিংহবিষ্ণুর রাজত্বকাল হইতে এই বংশের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সূচনা হয়। সিংহবিষ্ণু দক্ষিণের চোল ও অন্যান্য রাজাদের, এমন কি সিংহলের রাজাকে পর্যন্ত পরাজিত করিয়া বিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহবিষ্ণুর পুত্র প্রথম-মহেন্দ্রবর্মণ এবং তাঁহার পুত্র প্রথম-নরসিংহ-বর্মণ এই বংশের বিখ্যাত রাজা। পল্লবদের চিরদিনের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কর্ণাটের চালুক্য রাজারা। দক্ষিণের চোলদেরও তাঁহাদের রাজ্যের উপর লোভ ছিল। কর্ণাটের চালুক্য ও দক্ষিণের পাণ্ড্য ও চোল রাজাদের ক্রমাগত আক্রমণে শেষ পর্যন্ত পল্লবরা হীনবল হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের ভাগ্যরবি অস্ত যায়।

চালুক্য রাজবংশ। ষষ্ঠ শতকে কর্ণাট প্রদেশে, পল্লব রাজাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী চালুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, বাতাপীতে (বিজাপুর জেলায়, বর্তমানের বাদামী) তাঁহারা রাজধানী স্থাপন করেন। রাজা প্রথম-পুলকেশীকেই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে। তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয়-পুলকেশী (৬০৯-৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ) এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি কেবল মহারাষ্ট্রে নয়, নর্মদা হইতে কাবেরীর পরপারে পর্যন্ত প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এক বিশাল রাজ্য স্থাপন করেন। শোনা যায় তাঁহার সেনাবাহিনী যখন পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চীপুরমে অভিযান করিয়াছিল, তখন তাঁহাদের পায়ের ধূলায় কাঞ্চী-নগর নাকি অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। উত্তরের কনৌজ-রাজ হর্ষবর্ধনের দর্পও তিনি চূর্ণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁহার

রাজ্যে পদার্পণ করিয়া, রাজা ও প্রজা উভয়েরই অদম্য সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়-পুলকেশীর শেষজীবন অবশ্য সুখে কাটে নাই। পল্লব-রাজ প্রথম-নরসিংহবর্মণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ ও রাজধানী দখল করিয়া কিছুদিনের জন্য পিতৃ-রাজ্যগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়-পুলকেশীর পুত্র প্রথম-বিক্রমাদিত্য কিছুটা তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার প্রপৌত্র দ্বিতীয়-বিক্রমাদিত্য পল্লবদেব শক্তি খব করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনিও হীনবল হইয়া পড়েন। এই সময়, অষ্ট শতকের মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূট-জনের একজন দলপতি দন্তিদুর্গ কর্ণাট-মহারাষ্ট্র অঞ্চলের পরবর্তী বিখ্যাত **রাষ্ট্রকূট-রাজবংশ** প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ২২৫ বৎসর (৭৫২-৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) এই রাষ্ট্রকূট-বংশ রাজত্ব করেন। তাহার পর আবার এই অঞ্চলে পরবর্তী চালুক্যবংশ কল্যানে (নিজাম-রাজ্যে) রাজধানী স্থাপন করিয়া কিছুকাল রাজত্ব করিতে থাকেন। তখন দক্ষিণের চোল-রাজাদের অখণ্ড প্রতাপ। পরবর্তী-চালুক্যদের মধ্যে বিখ্যাত রাজা ষষ্ঠ 'বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১২৭ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার সভাকবি বিহ্লন 'বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত' গ্রন্থে রাজার বিজয়-কাহিনীর প্রশস্তি গাহিয়াছেন। দক্ষিণের চোলদের সমিত ক্রমাগত সংঘর্ষে কল্যান-চালুক্যদের পতন হয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বাদশ শতকের শেষের কথা। তখন ভারতে মুসলমান-যুগের সূচনা হইয়াছে বলা চলে।

চোল-রাজবংশ। দক্ষিণ-ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, দাক্ষিণাত্য ও দ্রাবিড়দেশ বা তামিলভূমি। দাক্ষিণাত্যের রাজবংশের কথা বলা হইল। দ্রাবিড়দেশে এই সময় **পাণ্ড্য** ও **চোল,** এই দুই রাজবংশ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন চোল-রাজবংশ।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালেই তাঁহারা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন এবং সিংহল তাঁহাদের রাজ্যভূক্ত ছিল। নবম শতকে পল্লব-রাজারা দুর্বল হইয়া পড়িলে, চোলদের প্রতিপত্তি দ্রুত বাড়িতে থাকে। চোল রাজা রাজরাজ (৯৮৫-১০১৪ খ্রীষ্টাব্দ) কেরল, পাণ্ড্য এবং সিংহল ও মহীশূরের কতকাংশ দখল করিয়া বিস্তৃত রাজ্য গড়িয়া তোলেন। ভারতের সুদূর দক্ষিণের এই চোল রাজারা চিরকালই নৌবলে বলীয়ান ছিলেন এবং এই নৌবলের জোবে রাজরাজ ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত অধিকার করেন। তাঁহাব পুত্র প্রথম-রাজেন্দ্রচোল (১০১৪-১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) এই বংশেব শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি পাণ্ড্য কেরল ও সিংহল রাজ্য সম্পূর্ণ নিজের অধীনে আনেন এবং মহীশূরের গঙ্গবংশ ধ্বংস করিয়া, পালবাজা মহীপালের সময় বাংলা-দেশ পর্যন্ত অভিযান করেন। তাহাতেও তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার প্রবল পরাক্রান্ত নৌবাহিনী আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের পেগু, এবং সুমাত্রা ও মালয়েব কতকাংশ পযন্ত দখল করিয়া রাজ্য বিস্তার করে। ভারতের আর কোন বাজা বহির্ভারতে সমুদ্রপথে এতদূর আধিপত্য বিস্তাব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় নাই। রাজেন্দ্রচোলের পর আরও প্রায় একশত বৎসর তাঁহার বংশধবেরা রাজত্ব করেন। দক্ষিণের অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে অতঃপর তাঁহাদের কলহ-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে থাকে। অবশেষে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই মুসলমানবা কুমারিকা পর্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

সমাজ ও রাষ্ট্র। অনেকে বলিয়া থাকেন, ভারতীয় সমাজে গণতন্ত্র (Democracy) ছিল না, রাজতন্ত্র (Monarchy) ছিল। তাঁহাদের এই ধারণার অনেকটাই সত্য নহে। উত্তর-ভারতের মৌর্য

গুপ্ত প্রভৃতি বড় বড় রাজবংশের রাজত্বকালেও আমরা দেখিয়াছি, উপরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, সমাজের সাধারণ স্তরে, অর্থাৎ জনসমাজে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সব সময় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রাম্য-সমাজের এই স্বায়ত্তশাসনে (Local Rural Self-Government) কোন দোর্দণ্ড-প্রতাপ রাজাও কোনদিন হস্তক্ষেপ করেন নাই, করিবার প্রয়োজনও হয় নাই। দক্ষিণ-ভারতেও সমাজের এই গড়ন অক্ষুণ্ণ ছিল দেখা যায়। পল্লব-চালুক্য-চোল কোন রাজবংশের আমলে তাহাতে ভাঙন ধরে নাই। উপরের রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, রাজ-বংশের বদল হইয়াছে, কিন্তু নীচের গ্রাম্যসমাজের ভিত্তিতে তাহার জন্য কোন ফাটল ধরে নাই। বরং চোল-রাজাদের বিস্তৃত আধিপত্য-কালে একাদশ-দ্বাদশ শতকেও দেখা যায়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বেশ পাকাপোক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এইভাবে :

কোট্টমসমষ্টি (মণ্ডলম্)



গ্রাম→গ্রাম সমষ্টি (কুরম)→কুরম-সমষ্টি (কোট্টম বা বলনাড়ু)

গ্রাম ও গ্রাম-সমষ্টিই এই সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি। সব ব্যাপারেই তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকিত। রাজপুরুষরা তাহা রক্ষণা-বেক্ষণ করিতেন, কখনও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। গ্রাম, গ্রাম-সমষ্টি ও কুরম-সমষ্টি বা নাড়ু নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধিদের 'সভা' দ্বারা শাসিত হইত :

গ্রাম-সভা—উরর—সভা

নাড়ু-সভা—নাট্টর—মহাসভা

গ্রামের সভাকে কেবল 'সভা' এবং বহু গ্রামের সমষ্টি নাড়ুর সভাকে 'মহাসভা' বলা হইত। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে **ব্রাহ্মণসভা** থাকিত।

এই গ্রামগুলি ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং ইহাদের বলা হইত **অগ্রহার গ্রাম**।

নির্বাচন-বিধিও (election) উল্লেখযোগ্য। ৩৫ হইতে ৭০ বৎসর বয়স যাঁহাদের এবং অন্ততঃ দুই একর জমির কর (tax) দেন, তাঁহারা নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারিতেন, অর্থাৎ জন-প্রতিনিধি হইবার যোগ্য বিবেচিত হইতেন। আরও একটি গুণ থাকিলে তাঁহারা যোগ্যতা লাভ করিতেন। যাঁহারা বিদ্বৎ-জন বা পণ্ডিত, এবং অন্ততঃ একটি মন্ত্র-ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে ও তাহার ভাষ্য সম্বন্ধে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাও প্রতিনিধিরূপে নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারিতেন। যাঁহারা 'পঞ্চ-মহাপাতক', অর্থাৎ সামাজিক অপরাধ করিতেন, তাঁহাদের তিন বৎসরের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াইতে দেওয়া হইত না। সভার অধীনে বিভিন্ন 'কমিটি' বা সমিতি থাকিত। এই সমিতির সদস্যদের মধ্যে মেয়েদেরও নাম পাওয়া যায়। এই সমিতি পথঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, রাজস্ব-কর আদায় করা, জমি মাপজোখ করা, অপরাধের বিচার করা এবং দেব-দেবালয় পরিদর্শন করা ইত্যাদি জনকল্যাণকর কাজকর্ম (Public Works) করিতেন। সমাজবিরোধী কাজের জন্য যাঁহারা অপরাধী বিবেচিত হইতেন, তাঁহাদের ভোটের ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইত। এত বিস্তারিত গণতান্ত্রিক বিধি-বিধানের উপর যে-দেশের শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার উপরের রাজতান্ত্রিক রূপ দেখিয়া বিরূপ মন্তব্য করা সমীচীন নয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য। বহু প্রাচীন কাল হইতেই তামিলভূমির রাজ্যগুলি নৌবলে বলীয়ান ছিল, সেকথা আগে বলিয়াছি। বিদেশের বণিকেরা দক্ষিণ-ভারতের বন্দরগুলিতে দীর্ঘকাল হইতে যাতায়াত

করিতেন। নানা রকমের মণিমুক্তা, পাথর, মসলাপাতি ইত্যাদি এই-সব বন্দর হইতে বিদেশে চালান যাইত এবং তাহার বদলে সোনা রূপা ও সৌখিন দ্রব্য আমদানি হইত। দক্ষিণ-ভারতের সহিত রোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের কথা আগেই বলিয়াছি (অষ্টম অধ্যায়)। পল্লব চালুক্য ও চোল রাজবংশের সমৃদ্ধিকালে এই বাণিজ্যের আরও প্রসার হইয়াছিল। সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে আরবদেশের ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ-ভারতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। ইসলাম-ধর্মের অভ্যুদয়ের পরেই প্রথমেই তাহাব সহিত এইভাবে দক্ষিণ-ভারতের সান্নিধ্য ঘটে। ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ বলেন যে দক্ষিণ-ভারতেব ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন, বিশেষ করিয়া শঙ্করাচার্যেব একেশ্বরবাদ, ইসলামধর্মেব সান্নিধ্যের ফলে ঘটে। ইসলামেব একেশ্বরবাদকে শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের একেশ্বববাদ দিয়া প্রতিরোধ কবিতে চাহিয়াছিলেন। ধর্ম-সংস্কারের ইতিহাসে ঠিক একই ধরনের কাজ পরবর্তীকালে উনিশ শতকে, বাংলাদেশে রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা কবিয়া করিয়াছিলেন। তখন অবশ্য ইসলাম নহে, খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবকে প্রতিরোধ করাই রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল।

ধর্মের নবরূপ। ভৌগোলিক বাধা থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ-ভারতের সহিত উত্তর-ভারতের যোগ দীর্ঘকাল হইতেই ছিল। উত্তরের আর্য, জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধারা বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণের সহিত মিশিয়াছে। পঞ্চম শতাব্দে গুপ্ত-রাজাদেব অভ্যুদয়ের পর হইতে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারাও দক্ষিণে পৌছিয়াছে। সপ্তম শতাব্দে হিউয়েনসাঙ দেখিয়াছিলেন, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের পাশে দক্ষিণে শৈবধর্ম বেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। তখন পল্লব রাজবংশ শৈবধর্মের শ্রেষ্ঠ পোষক ছিলেন। চালুক্য রাজা দ্বিতীয়-পুলকেশী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া

ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের জয় ঘোষণা করেন। পল্লব রাজধানী কাঞ্চীপুরম্ ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির মহাকেন্দ্র হইয়া উঠে। পল্লব ও চালুক্য রাজারা পরস্পর হানাহানি করিয়া নিজেদের পতনের পথ পরিষ্কার করেন বটে, কিন্তু উভয় রাজবংশের পোষকতায় দাক্ষিণাত্যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রবল অভ্যুত্থান হয়। চোল রাজারাও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানে সহায় হন। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মেব সামাজিক প্রাধান্য এই সময় হইতে দ্রুত কমিতে থাকে।

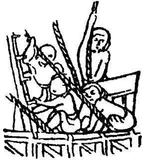
অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দ পর্যন্ত, প্রায় পাঁচ-ছয় শত বৎসর ধরিয়া, সারা ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দক্ষিণ-ভারতেব ধর্ম-প্রবর্ত্তকরা প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। উত্তর-ভারতের এতকালের প্রভাব-প্রতিপত্তি এই সময় দক্ষিণ-ভারত যেন কাড়িয়া নেয়। বিখ্যাত সব ধর্ম-প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হয় দক্ষিণ-ভারতে। তাহাদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইলেন—শঙ্করাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক ও আনন্দ-তীর্থ বা মধ্ব। **শঙ্করাচার্য** ছিলেন নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ, মালাবার উপকূলের এক গ্রামে অষ্টম শতকের শেষ পাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সেই তিনি সংসার মিথ্যা মনে করিয়া ধর্মচিন্তায় মগ্ন হন এবং গুরু গোবিন্দ যোগীর কাছে শিক্ষা পাইয়া ‘পরমহংস’ উপাধি পান। তারপর সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া তিনি তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন এবং ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতাদের নানা স্থানে তর্কে পরাজিত করেন। রাজার রাজ্য জয় না হইলেও, ইহাকেই শঙ্করের ‘দিগ্বিজয়’ বলে। শঙ্করের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, উপনিষদের ‘একমেবাদ্বিতীয়মে’র নবপ্রবর্তক তিনি। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম যখন বহু দেবদেবীর সাধনায় নিমগ্ন, তখন শঙ্করের এক-ব্রহ্ম ধর্মপ্রচারকে ধর্মের সংস্কার-সাধনের চেষ্টা বলা যায়। ভারতের নানা স্থানে **মঠ** প্রতিষ্ঠা

করিয়া, শঙ্কর তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভারতের হিন্দুধর্মের ইতিহাসে শঙ্করাচার্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবর্তক বলা হয়। **রামানুজ** জন্মগ্রহণ করেন ১০১৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের কাছে তিরুপটি বা পেরুম্বুর গ্রামে। তিনিও ব্রাহ্মণ-সন্তান। শঙ্করের নীরস জ্ঞানপ্রধান ধর্মমতের সহিত কিছুটা শ্রদ্ধার ভাব মিশাইয়া, তিনি জনগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারই সমকালীন হইলেন **নিম্বার্ক** বা নিম্বাদিত্য। নিম্বার্ক ধর্মের ভক্তিভাবের উপর জোর দেন। **মধ্ব** (১১৯৯-১২৭৮) পরে রামানুজ ও নিম্বার্ক উভয়েরই মতের সংস্কার করেন। ক্রমে দক্ষিণ-ভারতের শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তি ও প্রীতির বন্যায় সমগ্র ভারত ভাসিয়া যায় বলিলেও ভুল হয় না। বৈষ্ণবধর্মের এই প্রীতির ধারাটিকেই বাংলাদেশে **শ্রীচৈতন্য** পরবর্তী-কালে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে, নূতন রূপ দান করেন।

শিল্প-কলা ও শিক্ষা-সংস্কৃতি। পল্লব, চালুক্য ও চোল রাজারা সকলেই পৌরাণিক হিন্দুধর্মের, বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেবালয়-স্থাপত্যে কাঞ্চীর পল্লব রাজারা দক্ষিণ-ভারতে এক বিস্ময়কর যুগের প্রবর্তন করেন। রাজা নরসিংহবর্মণ মহামল্ল তাঁহারই নামের বন্দর মহামল্লপুরমে (মামল্লপুরম্ বা মহাবলীপুরম্) পাহাড়ের বোল্ডার কাটিয়া সাতটি যে মন্দির ('রথ' বলা হয়) নির্মাণ করেন, কলাবিদ্‌রা তাহাকে ভারতের দেবালয়-মিউজিয়ম বলেন। কারণ এই মন্দিরগুলির গড়ন ও রূপ ভারতের নানা রকমের মন্দিরের মতো, এক ধরনের নহে। ইহার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দুইয়েরই বৈচিত্র্য আছে। কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির, বাদামীর শিবালয় মন্দির, পল্লব চালুক্যদের স্মরণীয় কীর্তি। চোল রাজা রাজরাজ বিশাল সাম্রাজ্য জয়ের পর তাঁহার পূজ্য দেবতা

শিবের নামে তাঞ্জোরে বিরাট রাজরাজেশ্বর মন্দির নির্মাণ করান। এত বড় মন্দির দক্ষিণ-ভারতে অল্পই আছে। দক্ষিণ মাদ্রাজে চিদাম্বরমের শিব নটেশ্বরের মন্দির পাণ্ড্য রাজাদের কীর্তি। সমগ্র দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন নগর, রাজধানী ও বন্দরে এইরকম সব দেবালয় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দেখিলে মনে হয় যেন কেবল স্থাপত্যে নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও তাহাদের অখণ্ড প্রতাপ।

দক্ষিণ-ভারতের দেবালয়গুলিই শিক্ষা-সংস্কৃতিব মহাকেন্দ্র। উত্তর-ভারতে শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহ ছিল, আশ্রম তপোবন ছিল, বৌদ্ধ যুগের বিহার ও মহাবিদ্যালয় ছিল (নালন্দা, বিক্রমশীল ইত্যাদি), কিন্তু শিক্ষা-সংস্কৃতির সম্পূর্ণ ক্ষেত্র জুড়িয়া এইরকম বিশাল দেবালয় সেখানে গড়িয়া উঠে নাই। কেবল শিক্ষার নহে, দক্ষিণ-ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র এই দেবালয়গুলি। বড় বড় উৎসব-পার্বণ, অনুষ্ঠান সবই এই দেবালয় কেন্দ্র করিয়া হইয়া থাকে। সমগ্র জনসমাজেব এত বড় মিলন মন্দির ভারতেব আর কোথাও গড়িয়া উঠে নাই।



দ্বাদশ অধ্যায়

উপনিবেশ ও বাহির বিশ্ব

এইবার ভারতের সহিত বহির্বিশ্বের যোগাযোগ এবং ভারতেব উপনিবেশ স্থাপনের কথা বলিয়া, প্রাচীন যুগের কথা শেষ করিব। আমরা প্রায় মুসলমান-যুগের সূচনাকালে আসিয়া পড়িয়াছি। সুতরাং

প্রাচীন-কালের ভারতের কথা এইখানেই শেষ করিতে হইবে। শেষ হইয়াও গিয়াছে। ইহার পর, মুসলমান-যুগের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত 'মধ্যযুগ' এবং তাহার পরে ব্রিটিশ-যুগ ও স্বাধীন ভারতের যুগকে আমরা 'আধুনিক যুগ' বলিতে পারি।

বাণিজ্য ও সংস্কৃতি। সেই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার যুগ হইতে ভারতের সহিত স্থলপথে ও জলপথে বাহির বিশ্বের যোগ রহিয়াছে, বাণিজ্যের যোগ এবং সংস্কৃতির যোগ, দুইই। পারসীকদের সহিত, গ্রীক ও রোমানদের সহিত খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেই ভারতের যোগ ছিল। সে-কথা আগে আমরা আলোচনা করিয়াছি। খ্রীষ্টজন্মের পরে এই যোগ আরও গভীর ও বিস্তৃত হয়। ইংরেজীতে 'Culture follows commerce', কথায় বলা হয়। সংস্কৃতি বাণিজ্যের অনুগামী। সভ্যতার ঊষাকাল হইতে এইভাবে সংস্কৃতির বিস্তার হইয়াছে দেশ-দেশান্তরে। ভারতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ইয়োরোপ হইতে সুদূর প্রাচ্য পর্যন্ত বাণিজ্যের পথেই ভারত-সংস্কৃতি বাহিরে বিস্তারলাভ করিয়াছে। সম্রাট অশোক পশ্চিম-এশিয়ায়, উত্তর-আফ্রিকায় ও দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে বৌদ্ধ প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের উপর প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের (Philosophy) গভীর প্রভাবের কথা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। ম্যাকডোনেল, কোলব্রুক, উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন যে গ্রীক-দর্শন অপেক্ষা ভারতীয় দর্শন অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বাহিরে। গ্রীক-রোমানদের জ্যোতিষবিদ্যা, মুদ্রা প্রচলন ইত্যাদি ভারতকে উপকৃত করিয়াছে। আরবরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, ভারতীয় আয়ুর্বেদ ও গণিতবিদ্যার অনেক উপাদান বাহিরে বহন করিয়া লইয়া গিয়া, বাণিজ্যের পথেই তাহা ইয়োরোপে পৌঁছাইয়া

দিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের মানবিক আবেদন এবং কুষাণ-রাজাদের প্রভাবে ক্যাস্পিয়ান সাগর হইতে চীন পর্যন্ত মধ্য-এশিয়ার বিস্তৃত দুর্গম অঞ্চলে ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্য-এশিয়া হইতে চীনে, চীন হইতে কোরিয়ায়, কোরিয়া হইতে জাপানে ভারতের বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হইয়াছে। বাংলার পাল-রাজাদের আমলে বৌদ্ধ বিহারে (নালন্দা, বিক্রমশীলা . তব্বতীরা বৌদ্ধধর্ম-দর্শন শিক্ষা করিতে আসিতেন এবং পূর্ববঙ্গবাসী অতীশ দীপঙ্কর একাদশ শতকে তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা কবেন। দক্ষিণ-পূব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সহিতও সমুদ্রপথে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আমাদের 'জাতক' 'কথাসরিৎসাগর' প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা যে সুবর্ণভূমির সহিত বাণিজ্যের বর্ণনা দেখিতে পাই, এই দ্বীপপুঞ্জই সেই সুবর্ণভূমি। বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠতার ফলেই ক্রমে এইসব দ্বীপে নানা স্থানে ভারতীয় উপনিবেশও গড়িয়া উঠে। পাশ্চাত্ত্য ও অন্যান্য জাতি বাহিরের দেশ জোর করিয়া দখল করিয়া, নিজেদের রাজত্ব কায়েম করিয়া, যেভাবে উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহা করে নাই। দক্ষিণের চোল-রাজারা কিছুদিন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণতঃ ভাবতবর্ষ অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণ করে নাই। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ হইতে এইসব অঞ্চলে ভারতীয় নামের রাজা, ভারতীয় আচার ধর্ম সংস্কৃতি বর্ণমালা ইত্যাদির প্রচলন হইয়াছে দেখিতে পাই। সেইজন্যই ইহাকে আমরা 'ভারতীয় উপনিবেশ' বলিয়া থাকি, অন্য কোন কারণে নহে। অর্থাৎ রাজ্য জয় করিয়া ভারতবর্ষ উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। এই উপনিবেশ মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, আনাম, সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ, বোর্নিও অঞ্চলে গড়িয়া উঠে।

সুবর্ণভূমি। ভারতের প্রাচীন কাব্য ও কাহিনীতে যে-সুবর্ণভূমির কথা আছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দ্বীপপুঞ্জই সেই সুবর্ণভূমি। এইখানেই প্রাচীন **চম্পা, কম্বুজ** ও **শৈলেন্দ্র রাজ্য** স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় শতাব্দে চম্পা রাজ্য (আনাম দেশের কতকাংশে) গড়িয়া উঠে। রাজা ও রাজ্যের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। রাজকার্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। রাজধানীতে ও নগরে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরও ছিল অনেক। মঙ্গোলদের আক্রমণে পঞ্চদশ শতক হইতে চম্পা হীনবল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় শতকেই আধুনিক কম্বোডিয়ার দক্ষিণ অংশে হিন্দু কম্বুজ রাজ্য স্থাপিত হয়। কম্বুজে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম দুইয়েরই প্রচলন ছিল এবং ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা হইত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু শিলালিপিতে তাঁহাদের কীর্তিকাহিনীর বিবরণ আছে। কম্বুজের রাজা দ্বাদশ শতকে কাম্বোডিয়ায় 'আঙ্কোর-ভাট' নামক বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন। ইহা এক বিস্ময়কর শিল্পকীর্তি। শ্যাম ও আনাম দেশের শত্রুতার ফলে চতুর্দশ শতকে কম্বুজের পতন আরম্ভ হয়। অষ্টম শতকে শৈলেন্দ্রবংশের রাজারা মালয় সুমাত্রা যবদ্বীপ বলিদ্বীপ ও বোর্নিও জুড়িয়া বিশাল এক রাজ্য স্থাপন করেন। শৈলেন্দ্র-রাজারা বৌদ্ধধর্মী ছিলেন। বাংলার বৌদ্ধ পাল-রাজাদের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব ছিল। নবম শতকে তাঁহারা নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণ করিয়া দেন। অষ্টম শতকের শেষে কুমারঘোষ নামে একজন বাঙালী পণ্ডিত শৈলেন্দ্র-রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন।

যবদ্বীপের (জাভা) বিখ্যাত **বরোবুদর মন্দির** শৈলেন্দ্র-রাজারা পাহাড়ের উপর নির্মাণ করান। কেবল এশিয়ার নহে, সারা পৃথিবীর মধ্যে ইহা একটি বিস্ময়কর শিল্পকীর্তি বলিয়া শিল্পবিদ্‌রা স্বীকার



ভারতীয়দের বিদেশ যাত্রার দৃশ্য : জাভার বরোবদর মন্দিরের ভাস্কর্য



অজন্তার গুহাচিত্র,
সুপুর বা সোপার
বন্দরের দৃশ্য
(বোম্বাইয়ের উত্তরে)

করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে এই মন্দির দেখিয়া 'বোরোবুদুর' কবিতা লিখিয়াছিলেন। জাভার এই বরোবুদুর মন্দির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন : "জাভাদ্বীপে বরোবুদরে দেখে এলুম সুবৃহৎ স্তূপ পরিবেষ্টন ক'রে শত শত মূর্তি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতককথার বর্ণনায়; তার প্রত্যেকটিতেই আছে কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ, কোথাও লেশমাত্র আলস্য নেই, অনবধান নেই; এ'কে বলে শিল্পের তপস্যা…।"

বাহিরের উপনিবেশগুলিকে ভারতবর্ষ এই শিল্পকলার ও সংস্কৃতির তপস্যা করিতে শিখাইয়াছে, কি করিয়া পরের দেশ দখল করিয়া রাজত্ব করিতে হয়, তাহা শিখায় নাই।

সংযোজন

পরিশিষ্ট

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও শিল্পের পরিসংখ্যান

(*Statistical Digest, West Bengal, July 1957* হইতে সংকলিত)

ধানচাল ও পাট :	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭
আমন ক্ষেত (একর)	৮৫,৪৪,২০০	৮৮,১৬,৬০০	৮৭,৫০,৭০০
আমন চাল (টন)	৩৩,৪১,৬০০	৩৭,১৮,৮০০	৩৯,৪১,৫০০
আউশ ক্ষেত	১২,৪৬,৮০০	১২,৯৬,০০০	১২,৬৮,১০০
আউশ চাল	৩,৯৮,১০০	৪,০৯,৩০০	৩,৭৫,৪০০
বোরো ক্ষেত	৪১,৭০০	৪১,৪০০	৪৪,৪০০
বোরো চাল	১৫,৯০০	১৭,৬০০	১৯,৮০০
পাট ক্ষেত (একর)	৫,৫০,৬০০	৭,৭৯,৫০০	৬,৭১,৭০০
পাট (গাঁট = ৪০০ পাউণ্ড)	১৪,৯৬,৪০০ গাঁট	১৯,৫৭,৮০০	১৩,৪৪,৭০০

কয়লা ও পাটশিল্পের উৎপাদন

কয়লা		পাটশিল্প (চট, ছালা ইত্যাদি)	
১৯৫৬ সালে মাসিক গড় উৎপাদন	৯,৪১,০০০ টন	১৯৫৬ সালে মাসিক গড় উৎপাদন	৮১,১০০ টন
১৯৫৭ জানুয়ারী	১১,৩০,০০০ টন	১৯৫৭ জানুয়ারী	৮৮,৮০০ টন
১৯৫৭ এপ্রিল	১২,১১,০০০ টন	১৯৫৭ এপ্রিল	৮৬,৮০০ টন
১৯৫৭ মে	১২,০০,০০০ টন	১৯৫৭ মে	৮৭,৩০০ টন

কলকারখানার সংখ্যা

১৯৫৫ ডিসেম্বর	৩,০৮০
১৯৫৬ ডিসেম্বর	৩,১৯৯
১৯৫৭ মার্চ	৩,২২৫
১৯৫৭ জুন	৩,২৬২

চা উৎপাদন

(মাসিক গড় হিসাব)

১,৬৮,১১,০০০ পাঃ	১৯৫৫ সাল
১,৪৫,৮৮,০০০ পাঃ	১৯৫৬ সাল
২,৩৬,৩৫,০০০ পাঃ	১৯৫৭ জুন

লোহা-ইস্পাতের উৎপাদন

(মাসিক গড় উৎপাদন)

	ঢালা লোহা ইত্যাদি	ইস্পাত
১৯৫৫ সাল	৫৭,৩০৪ টন	৩০,৯৯০ টন (Finished Steel)
১৯৫৬	৫৮,০০৩ টন	৩৩,৯৫০ টন
১৯৫৭ মার্চ	৬৪,৩৩৩ টন	৩৮,৪৬৯ টন

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ও লোকসংখ্যা

আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা (১৯৫১ সেন্সাস)
৩০,৬৫৪ (১৯৫৬, অক্টোবর)	২,৪৮,১০,৩০৮
৩৩,৮২৩ (১৯৫৬, ১ নভেম্বর হইতে রাজ্য-পুনর্গঠনের পর)	২,৪৮,১০,৩০৮+১৪,৪৬,৩৮৫ (বিহার হইতে সংযুক্ত) +৪৯,৯০৯ (চন্দননগর) =২,৬৩,০৬,৬০২

পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও নগর-শহর সংখ্যা

(১৯৫১ সেন্সাস)

গ্রাম : ৩৫,০৬৩ নগর-শহর : ১১৪

১৯৫৬, ১ নভেম্বর হইতে রাজ্য-পুনর্গঠনের ফলে এই সংখ্যা সামান্য বাড়িয়াছে।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা

(রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রকাশিত World Facts and Figures, 1957 হইতে সংগৃহীত)

১৯২০	**১৯৩০**	**১৯৪০**	**১৯৫৫**
১৮১ কোটি	২০১ কোটি ৩০ লক্ষ	২২৪ কোটি ৬০ লক্ষ	২৬৯ কোটি ১০ লক্ষ

পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার

প্রতি ঘণ্টায়	:	৫০০০
প্রতি দিনে	:	৫০০০×২৪=১,২০,০০০

দ্রষ্টব্য : এই বইয়ের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'গ্রাম ও নগর' সম্পর্কে আলোচনায় বলা হইয়াছে যে ৫,০০০ লোকসংখ্যা হইলে 'নগর' (town) এবং ১,০০,০০০ লোকসংখ্যা হইলে মহানগর বা শহর (city) হইবে। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখিয়া বলা যায়, প্রতি ঘণ্টায় একটি ছোট নগরে এবং প্রতি দিনে একটি শহরে বাসোপযোগী লোক বাড়িতেছে। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় নবজাত লোক দিয়া একটি নগর, এবং প্রতি দিনের নবজাত লোক দিয়া একটি শহর পত্তন করা যায়।

সংবাদপত্রের পাঠক, প্রতি হাজারে

১৯৫৩-৫৫

ইংল্যাণ্ড	:	৫৭০ জন
সুইডেন	:	৪৫৯ জন
নরওয়ে	:	৮৩৫ জন
জাপান	:	৩৯৭ জন
অষ্ট্রেলিয়া	:	৩৯৬ জন
ডেনমার্ক	:	৩৭৮ জন
আমেরিকা	:	৩৩৯ জন
সুইজারল্যাণ্ড	:	৩৩৮ জন
ফ্রান্স	:	২৪৬ জন
ভারতবর্ষ	:	৭ জন

অনুশীলনী

প্রথম ভাগ ॥ সমাজ-জীবন

[অনুশীলনীর প্রশ্নগুলি এমনভাবে করা হইয়াছে যাহাতে প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর বিশদ চিত্র ফুটিয়া উঠে এবং শিক্ষকরা এক-একটি অধ্যায়ের পাঠ শেষ হইবার পর, ক্লাসে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে ছাত্রদের বিষয়-জ্ঞান যাচাই করিতে পারেন।]

আন্দামানীদের সমাজ

১। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন কি প্রকার? তাহার সহিত আন্দামানীদের জীবনযাত্রার সম্পর্ক কি? ২। আন্দামানীদের সহিত বাহিরের সমাজের কতটুকু যোগ ঘটিয়াছে? কি-ভাবে ঘটিয়াছে? ৩। আন্দামানী সমাজের গড়ন কি রকম? ৪। আন্দামানীদের গৃহ ও বসতি কি ধরনের? ৫। তাহাদের আসবাব, পোশাক ও হাতিয়ারের বর্ণনা দাও। ৬। আন্দামানীদের ব্যক্তিগত স্বত্ববোধ আছে কি? থাকিলে, কতটুকু আছে এবং তাহার কারণ কি? ৭। আন্দামানীদের জীবনযাত্রার বর্ণনা দাও; ৮। আন্দামানীদের ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কি? ৯। আন্দামানীরা খাদ্য উৎপাদন করে কি? তাহাদের জীবন-ধারণের পদ্ধতির সহিত সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধ কি বুঝাইয়া দাও।

আলমোড়াবাসীদের জীবন

১। খাদ্য-সংগ্রহ যাহারা করে এবং খাদ্য-উৎপাদন যাহারা করে, তাহাদের সমাজ-জীবনের পার্থক্য কি? ২। আলমোড়ার ভৌগোলিক রূপ বর্ণনা কর; ৩। ভোটিরা কি-ভাবে জীবন-ধারণ করে এবং কেন? ৪। আলমোড়াবাসীদের গ্রীষ্মকালীন গোষ্ঠযাত্রার বিবরণ দাও; ৫। শীত-কালে আলমোড়ার কোন্ অঞ্চলের লোকদের উপর হইতে নীচে নামিয়া

আসিতে হয় এবং কেন হয়? ৬। 'খড়ক' কি? কি-ভাবে তাহা তৈরী করা হয়? কতরকমের খড়ক আছে? ৭। পাহাড়ের গায়ে কি-ভাবে চাষ করা হয়? ৮। আলমোড়া অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে যাহারা উপরদিকে যাত্রা করে এবং শীতকালে যাহারা নীচে নামিয়া আসে, তাহাদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? ৯। আলমোড়া অঞ্চলে গ্রাম্য মেলার গুরুত্ব কি ও কেন? ১০। আলমোড়াবাসীর দেবদেবী ও উৎসব-পার্বণের বর্ণনা দাও।

কৃষিপ্রধান গ্রাম্য-সমাজ

১। কৃষিনির্ভর গ্রাম্য-সমাজের সহিত খাদ্য-সংগ্রাহক ও পশুপালক সমাজের পার্থক্য কি? ২। স্থানীয় জলবায়ুভেদে কৃষি ও শস্যের রকমভেদ হইতে পারে কি? তাহাতে স্থানীয় সমাজের উপর কোন প্রভাব পড়ে? ৩। ঋতুভেদে বাংলাদেশের প্রধান শস্য কয় প্রকার? ৪। পশ্চিমবঙ্গে কতরকমের ধানচাষ হয়? কোন্ সময় ও কি-ভাবে তাহা চাষ করা হয়? ৫। কোন্ ধানের চাষ সর্বাপেক্ষা বেশী হয় এবং তাহা কখন চাষ করা হয়? কোন্ জেলায় কি ধানের চাষ বেশী হয়? ৬। বাংলাদেশের প্রধান অর্থকর শস্য কি? পশ্চিমবঙ্গে এখন কি-ভাবে পাটচাষ বাড়ানো হইয়াছে? জেলা হিসাবে উত্তর দাও। ৭। কতরকমের পাট আছে? নাম কি? কোন্ অঞ্চলে কি রকমের পাট বেশী উৎপন্ন হয়?

কি-ভাবে পাটচাষ করা হয় এবং সম্প্রতি কি উপায়ে পাটচাষের উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে? ৮। পাটজাত শিল্প কি কি? পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের প্রধান কেন্দ্র কোথায়? কেন পাটশিল্প এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 'ম্যাপ' আঁকিয়া, যুক্তি দিয়া তাহা বুঝাইয়া দাও। ৯। পাটশিল্প অঞ্চলে কি প্রকারের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে? ১০। চা কোন্ অঞ্চলে ভাল হয় এবং কেন? পশ্চিমবঙ্গের কোথায় চা-বাগান আছে? সেখানে কি উপায়ে চা'য়ের বাগান রচনা করা হয়? বাগানের চা-পাতা হইতে শুকনো চা কি-ভাবে তৈরী করা হয়? ১১। পশ্চিমবঙ্গের বনজ

সম্পদ্ কোথায় আছে? বনজের মধ্যে 'কাঠ' প্রধান কেন? কাঠ কি কি কাজে লাগে? ১২। গ্রামের ফসল ধান-পাট কি-ভাবে বাহিরে চালান দেওয়া হয়? ১৩। চা-বাগান হইতে চা কি-ভাবে বাহিরে চালান যায়? ১৪। বনের কাঠ দূরে পাঠাইবার উপায় কি? ১৫। স্থায়ী বসতি ও গ্রাম্য-সমাজ কোথায় গড়িয়া উঠিতে পারে? তাহার বৈশিষ্ট্য কি, বুঝাইয়া দাও; ১৬। গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা দাও; ১৭। চা-বাগান অঞ্চলের কর্মীদের জীবনের সহিত তাহার পার্থক্য কি, ব্যাখ্যা কর।

শিল্পাঞ্চলের সমাজ

১। কোন দেশের বিশেষ একটি অঞ্চলে শিল্প-কারখানার প্রতিষ্ঠা কি কারণে হইতে পারে? এই দিক হইতে লোহা-কয়লা কেন্দ্রের গুরুত্ব কি? ২। কি কি কারণে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল-রানীগঞ্জ এলাকা প্রধান শিল্পাঞ্চলরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, বুঝাইয়া দাও; ৩। বাংলাদেশে কয়লাখনির ইতিহাস কি? কোন্ শ্রেণীর কয়লা পশ্চিমবঙ্গে বেশী পাওয়া যায়? তাহার গুণ কি? ৪। কয়লাখনির কাজকর্মের বর্ণনা দাও; ৫। কয়লাখনি অঞ্চলের জীবনযাত্রা কি রকমের? ৬। বার্নপুর-হীরাপুর-কুলটি অঞ্চলের প্রধান শিল্পকারখানা কি কি? সেখানে কি-ভাবে কাজ-কর্ম হয়? চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওআর্কসের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির বিবরণ দাও, ৭। শিল্প-নগর কাহাকে বলে? কি-ভাবে তাহা গড়িয়া উঠে? হাওড়া অঞ্চলের পুরাতন শিল্পনগরের সহিত আসানসোল-চিত্তরঞ্জনের নূতন শিল্পনগরের পার্থক্য কি বুঝাইয়া দাও; ৮। হাওড়া শহরের বৈশিষ্ট্য কি? ছোট ছোট উপশিল্পের প্রাধান্য কেন হাওড়া শহরে? ৯। হাওড়া ও কলিকাতা শহরের বস্তিতে কি-ভাবে লোকে বসবাস করে?

গ্রাম ও নগর

১। 'গ্রাম' কতকালের প্রাচীন? ২। গ্রাম্য-বসতির বিন্যাস অনুযায়ী কতরকমের গ্রাম আছে? কেন এরকম বসতি-বিন্যাস হইয়াছে? বাংলা-

দেশের কোন্ অঞ্চলে কি রকম বসতি? ৩। গ্রাম মাত্রই কি কৃষকবহুল? বৃত্তি-বর্ণভেদে কতরকমের গ্রাম গড়িয়া উঠিতে পারে, বুঝাইয়া দাও; ৪। গ্রামের ঘরবাড়ী কি দিয়া তৈরী করা হয়? শহরের মতো বড় বড় পাকা বাড়ী গ্রামে দেখা যায় না কেন? ৫। আঞ্চলিক জলবায়ুভেদে গ্রাম্য গৃহের গড়ন কতরকমের হইতে পারে? ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গৃহের বর্ণনা দিয়া তাহা বুঝাইয়া দাও; ৬। সেকালের গ্রাম্য-সমাজ স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল বলা হয়; কেন বলা হয় বুঝাইয়া দাও; ৭। গ্রামে গ্রামে মেলা বসে কেন? মেলার উপযোগিতা কি? মেলার বর্ণনা দাও; এবং কি কারণে মেলার প্রচলন কমিয়া যাইতেছে বল; ৮। 'নগর' কাহাকে বলে? কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিলে কোন স্থানকে নগর বলা যাইবে? 'মহানগর' বা 'শহর' কাহাকে বলে? ৯। কত প্রকারের নগর আছে এবং কি কারণে তাহা গড়িয়া উঠে? ১০। ধীরে ধীরে একটি স্থানে নগরের বিকাশ হয় কি-ভাবে? তাহার বিকাশের ক্রম ও পর্ব কি? বিভিন্ন পর্বের বৈশিষ্ট্য কি? ১১। কলিকাতা শহরের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর এবং কি-ভাবে কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি ধীরে ধীরে আধুনিক শহরে পরিণত হইয়াছে বুঝাইয়া দাও; ১২। শহরে সমাজের বৈশিষ্ট্য কি, এবং গ্রাম্য-সমাজের সহিত তাহার পার্থক্য কোথায়?

বিদেশী জনগোষ্ঠী

১। সাইবেরিয়া অঞ্চলের অধিবাসীরা কি-ভাবে জীবন-যাপন করে? প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত তাহাদের জীবনযাত্রার সম্বন্ধ কতটুকু? ২। উত্তর-চীন ও দক্ষিণ-চীনের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য কি? তাহার জন্য জীবনযাত্রার কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে? উত্তর-চীনের কৃষি ও শিল্পের বিবরণ দাও; ৩। মালয় উপদ্বীপের প্রাকৃতিক বিবরণ দাও; মালয়ের শস্য ও শিল্প-বাণিজ্য কি? বন্দর কি কি? তাহাদের গুরুত্ব কি? মালয়ের অনেক স্থানে বিদেশীদের সংখ্যা বেশী কেন? প্রধানতঃ

মালয়ের কোন্ অঞ্চলে বিদেশীরা বাস করে ? ডাচদের দেশকে নেদারল্যাণ্ড বলে কেন ? ডাচদের প্রধান জীবিকা কি ? প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন কতখানি তাহাদের জীবনযাত্রায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ? ৫। রাইনল্যাণ্ডে কি কারণে বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে বুঝাইয়া দাও। ৬। আমেরিকার 'প্রেয়ারি' অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কি ? প্রেয়ারি অঞ্চলে কি-ভাবে, কি-শস্য চাষ করা হয় এবং কি-উপায়ে তাহা ক্ষেত হইতে বাহিরে চালান দেওয়া হয় ? ৭। সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের জনপদের বর্ণনা দাও ; ৮। পশ্চিম-অস্ট্রেলিয়ার ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কি ? খনিজ কি কি পাওয়া যায় ? খনি-অঞ্চলে কোথায় সমৃদ্ধ নগর ও জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে ?

দ্বিতীয় ভাগ ॥ ইতিহাসের ধারা

প্রাচীন যুগের ভারত

ইতিহাসের প্রকৃতি

সমাজবিদ্যার সহিত ইতিহাস-পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি ? ২। ভূগোলের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক কতটুকু ? ৩। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিভাগগুলির বৈশিষ্ট্য-সহ বিবরণ দাও।

ভারতীয় ইতিহাসের আকর ও উপাদান

১। ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান কি কি আকর হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে ? ২। প্রত্নতাত্ত্বিক আকরের গুরুত্ব কি ? ৩। প্রাচীন শাস্ত্র, সাহিত্য-গ্রন্থ ইত্যাদি হইতে আমরা ইতিহাসের কি উপাদান পাইতে পারি ?

৪। সমকালীন ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে কতটুকু মূল্যবান ?

প্রাগৈতিহাসিক ভারত

১। প্রস্তর-যুগের ভারতের ইতিহাস আমরা কতটুকু জানিতে পারিয়াছি ? তাহার বৈশিষ্ট্য কি সিন্ধু-সভ্যতার নগর-পরিকল্পনার বর্ণনা দাও ; তখনকার সমাজের গঠন ও জীবনযাত্রা কিরকম ছিল বল

বৈদিক সমাজ ও সভ্যতা

আর্য' কাহাদের বলা হয় ? তাঁহারা ভারতবর্ষে কোথা হইতে, কোন্ সময় আসেন ? প্রমাণ দিয়া উত্তর দাও ; ২। বৈদিক যুগ কোন সময়কে বলা যায় ? ৩। বৈদিক যুগে সমাজের গঠন কি রকম ছিল ? ৪। আর্যরা কোন্ দেবতার পূজা করিতেন ? অনার্যদের সহিত সান্নিধ্যের ফলে তাঁহাদের দেবপূজার কি পরিবর্তন হয় ? ৫। 'রামায়ণ' মহাকাব্যে আমরা সেকালের ভারতের কি সমাজচিত্র পাই। ৬। মহাভারতের মধ্যে সমাজের কি ধরনের রূপের পরিচয় পাওয়া যায় ? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

১। জৈন ও বৌদ্ধ যুগের তাৎপর্য কি ? ২। জৈনধর্মের সারকথা কি বল ; ৩। বৌদ্ধধর্মের সারকথা কি বুঝাইয়া দাও ; ৪। বহির্ভারতে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার হয় কি-ভাবে ও কেন ? ৫। আধুনিক কালে আমাদের জীবনে বৌদ্ধধর্মের কোন প্রভাব কোথাও আছে কি ?

মৌর্য যুগ

১। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত কি-ভাবে মগধের রাজা হন ? তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি ? ২। সম্রাট অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব কি কারণে স্বীকৃত হয় ? তাঁহার ধর্ম

জীবন ও নীতি সম্বন্ধে কি জানা যায়, প্রমাণ-সহ লিখ; ৩। মৌর্য যুগের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহার বিবরণ দাও; ৪। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' হইতে সেকালের গ্রাম ও নগর সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা বর্ণনা কর; ৫। অশোক-লিপি কত রকমের আছে? তাহা হইতে তখনকার রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে আমরা কি জানিতে পারি?

পারসীক ও গ্রীক সংস্পর্শ

১। মৌর্য যুগে বহির্জগতের সহিত আমাদের কি-ভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হয়? ২। মৌর্য শিল্পকলায় পারসীক প্রভাব আছে, কেন বলা হয়?

যুগসন্ধি

১। মৌর্যদের পরবর্তী কোন্ কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করেন? ২। এই সময় কোন্ কোন্ বিদেশী জাতি ভারত অভিযান করে? ৩। কনিষ্ক কে? শকাব্দ কি? ৪। ভারত-রোমান বাণিজ্যের বিবরণ দাও; ৫। গ্রীক শক পহ্লব কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির সহিত ভারতের সান্নিধ্যের সাংস্কৃতিক ফলাফল কি হইয়াছে?

গুপ্তযুগ

১। গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? কি-ভাবে তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন? ২। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতের কথা কি লিখিয়া গিয়াছেন? ৩। হিউয়েন সাঙ কোন্ সময় ভারতে আসেন, এবং ভারত সম্বন্ধে কি বিবরণ দিয়া গিয়াছেন? ৪। গুপ্ত-যুগকে ভারত-সংস্কৃতির স্বর্ণ-যুগ বলা হয় কেন? ৫। গুপ্ত-যুগের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে কি জানা যায়? ৬। গুপ্ত-যুগে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কি উন্নতি হইয়াছিল? ৭। গুপ্ত-যুগের শিল্পকলা ও ধর্ম সম্বন্ধে কিছু লেখ।

প্রাচীন যুগের বাংলাদেশ

১। গুপ্ত-যুগে বাংলার কি অবস্থা ছিল? ২। সেকালের স্বাধীন 'বঙ্গরাজ্য' সম্বন্ধে কি জানা যায়? ৩। শশাঙ্ক কে ছিলেন? গৌড়ে কোন্ সময়, কি-ভাবে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন? ৪। শশাঙ্ককে হিউয়েন সাঙ কেন বৌদ্ধবিদ্বেষী বলিয়াছেন? তুমি কি ইহা সমর্থন কর? যুক্তি দিয়া উত্তর দাও; ৫। পাল-রাজবংশের কি-ভাবে ও কোন্ সময় প্রতিষ্ঠা হয়? ৬। বাহিরের আক্রমণে ও ঘরোয়া বিদ্রোহে কি-ভাবে পাল-রাজাদের পতন হয়, তাহার বিবরণ দাও; ৭। সেন-রাজাদের বংশ-পরিচয় কি? কি-ভাবে তাঁহারা রাজা হন? ৮। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও; ৯। পাল-সেন যুগে বাংলার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা কি রকম ছিল? সংক্ষেপে বর্ণনা কর; ১০। পাল-সেন যুগের বাংলার শিল্পকলা ও সাহিত্যের বিবরণ দাও; ১১। পাল-সেন যুগের বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচয় দাও।

দক্ষিণ-ভারত

১। দক্ষিণ-ভারতের পল্লব ও চালুক্য রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও; ২। চোল রাজাদের রাজত্বকালে সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা কি রকম ছিল, তাহার বর্ণনা দাও; ৩। দক্ষিণ-ভারতের নূতন ধর্মান্দোলন কাহারা করেন, তাহার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব কি? ৪। শিল্প-কলায় দক্ষিণ-ভারতের দান কি?

উপনিবেশ ও বাহির বিশ্ব

১। ভারতের সহিত বাহির বিশ্বের যোগাযোগের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর; ২। চম্পা, কম্বুজ ও শৈলেন্দ্র রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও; ৩। এইসব স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতির কি নিদর্শন আছে?